বিজ্ঞান-নীতি-প্রসূন

নীতির প্রভাব।

সত্য চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বশক্তির মূলাধার পরমাত্মার সত্ত্ব হইতে পঞ্চভূত আবির্ভূত হইয়া এই ভূতাবাস জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ও যথানিয়মে চলিতেছে। সেই ভূতভাবন ভগবানের অচিন্তনীয় সৃষ্টিকৌশল প্রভাবে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি আপনাপন কার্য্য যথানিয়মে সমাধা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নীরদেরা যথাসময়ে অমৃততুল্য নীরবর্ষণে ভূতধাত্রী ধরিত্রীর উর্ব্বরতা শক্তির পোষকতা করিতেছে। এই ধরিত্রীগর্ভ হইতে দেশভেদে কালভেদে নানাবিধ শস্য ও ফল মূল উৎপন্ন হইয়া জগতীস্থ প্রাণিপুঞ্জের জীবন রক্ষা করিতেছে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। বায়ু প্রবাহিত হইয়া জগতের জীবন রক্ষা করত, 'জগজ্জীবন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ বৃক্ষে পরিণত হইতেছে। কালে সেই সকল বৃক্ষ ফলপুষ্প-সুশোভিত হইয়া ধরণীর অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। পঞ্চভূত দ্বারা দেশভেদে কালভেদে মনুষ্যদেহের সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্পাদন

এবং ক্ষেত্রভেদে বৃদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির সঞ্চার হইতেছে। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া প্রত্যেক মানব ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেছেন ও তদনুযায়ী ফলভোগও করিতেছেন। স্বয়ং কর্ম্মবিশেষের ফলভোগ করিয়া এবং অপরকে স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগী হইতে দেখিয়া ও শুনিয়া মনুষ্যের মনে সদসৎ বিবেচনাশক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মগণ যিনি যাহা কিছু জানিয়াছিলেন, তিনি প্রায়ই অন্যান্য মনুজগণের শিক্ষার জন্য তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া, সংসারের অসীম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা যে জগতের অসীম উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় কি?

"নীতি" শব্দের অর্থ নিয়ম। ইহসংসারে নিয়মবদ্ধ কার্য্য না করিলে মনুষ্যগণকে পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না। এমন কি, যেমন জলবায়ুর অভাবে প্রাণিমাত্রেরই প্রাণ রক্ষা হয় না, সেইরূপ সুনীতির অভাবে মনুষ্যসমাজ কোনমতেই সুচারুরূপে চলিতে পারে না। সময়ে সময়ে সংসারে যখন ঘোর ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়, অধার্ম্মিক লোকের আধিক্য হওয়ায়, ধর্ম্ম প্রায় লোপ প্রাপ্ত হয়, প্রায় সকলেই পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, সেই সময় করুণাময় ঈশ্বর মনুজকুলের প্রতি কৃপালু হইয়া এক এক জন মহানুভব মনুষ্যকে মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই ঈশ্বরপ্রেরিত মনুজগণ ঈশ্বরের অসামান্য কৃপাবলে ইহ সংসারে পুনর্ব্বার ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি এবং

সমাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া, বিশৃঙ্খল
সংসারকে পুনর্ব্বার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া থাকেন। সংসারে কত
দূর নীতির প্রয়োজন এবং নীতিমান্ লোকেরাই বা কতদূর
সংসারে পূজ্য হইয়া থাকেন, নিম্নে গল্পচ্ছলে তাহারই প্রথম
উদাহরণ বিবৃত করা যাইতেছে।

কোন ক্ষুদ্রগ্রামে একজন চিকিৎসক বাস করিতেন। সেই
গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ
করিত। কতকগুলি বলবান্ চণ্ডালজাতীয় লোক সম্মিলিত
হইয়া একটি ডাকাইতের দল করিয়াছিল। তাহারা দূরদেশে
যাইয়া মধ্যে মধ্যে ডাকাইতি করিত। গ্রামের অনেক লোক
বিপদের সময় তাহাদিগের সহায়তা করিত। যদি ঐ সকল
দস্যু কোন সূত্রে জানিতে পারিত যে, নিজগ্রামের কিম্বা
নিকটস্থ অন্য কোন গ্রামের কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ সঙ্গতিপন্ন
হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে, তাহারা যে কোন প্রকারে
হউক, ঐ সঙ্গতিপন্ন লোকের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিত।
কেবল চিকিৎসাব্যবসায়ী বলিয়া, কবিরাজ মহাশয়ের প্রতি
কেহ কখন অত্যাচার করিত না। যে গ্রামে ঐ দস্যুদল
বাস করিত, সেই গ্রামের একজন কায়স্থ দূরদেশে বিষয়
কার্য্য করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিয়াছিলেন। তিনি তিন
চারি বৎসরের পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। গ্রামের
লোকের ব্যবহার পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন, এই জন্য
যে টাকাগুলি সমভিব্যাহারে লইয়া বাটী আসিয়াছিলেন,
তাহা কোথায় রাখিবেন, কি প্রকারেই বা সেই অর্থ নির
দ্বেগে ভোগ করিবেন, এই চিন্তায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হইলেন।

তিনি কত টাকা লইয়া বাটী আসিয়াছেন, তাহা আপনার সহধর্ম্মিণীকেও বলেন নাই। পাছে তাঁহাকে কেহ সঙ্গতি-শালী বলিয়া ভাবে, এই জন্য, ক্ষমতাসত্ত্বেও নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায়, দিনযাপন করিতে লাগিলেন। পাছে দস্যুরা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়, এই জন্য তিনি সমূহ সতর্কতার সহিত কালযাপন করিতেন, তথাচ দুই সহস্র মুদ্রা ঘরে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া রজনীতে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। এক দিবস মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, টাকাগুলি কোন ক্রমেই গৃহে রাখা কর্ত্তব্য নহে, যদি দস্যুরা ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারে, তাহা হইলে, সেই টাকার সঙ্গে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত যাইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের গ্রামের মধ্যে এক কবিরাজ মহাশয়কেই অনেকাংশে বিশ্বাস করিতে পারা যায়। তাহার নিকট যদি আমি আমার মনের কথা ব্যক্ত করি, তাহা হইলে, হঠাৎ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। তিনি যে অতি সজ্জন, পূর্ব্বে ইহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ, চিকিৎসক বলিয়া যখন দস্যুরা কবিরাজ মহাশয়কে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তখন তিনি ব্যতিরেকে আমার ঐ টাকাগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আর কেহই পারিবেন না। এইরূপ নানা চিন্তার পর কায়স্থ-পুত্র অনেক বলিয়া কহিয়া, কবিরাজ মহাশয়ের নিকট সেই দুই সহস্র মুদ্রা রাখিয়া আসিলেন; আবশ্যক হইলে সেই টাকা হইতে কিছু কিছু আনিয়া খরচ পত্র করিতেন।

এক সময়ে ঐ দস্যুদল অতি দূরদেশে কোন সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে ডাকাইতি করিতে গিয়াছিল। গৃহস্বামী

পূর্ব্ব হইতে তাহার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, আপনার ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য, বিবিধ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে দিবস ডাকাইতেরা তাঁহার বাটী আক্রমণ করিবে, সেই দিবস ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির ছাদের উপর বিশ ত্রিশ জন তীরেন্দাজ ছিল। ডাকাইতেরা দরজা ভাঙ্গিয়া সদর বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্রই, তীরেন্দাজেরা ছাদের উপর হইতে ক্রমাগত তীর ছুড়িতে লাগিল। দস্যুরা সেই তীরে বিদ্ধ হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। বাবুদিগের বাটীতে ডাকাইত পড়িয়াছে এই সংবাদ চারিদিকে অল্পকালমধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ায়, পুলীসের দারোগা, বহুসংখ্যক চৌকীদার সমভিব্যাহারে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলেন। গ্রামস্থ বলবান্ যুবকেরা, কেহবা তরবারি, কেহবা বন্দুক, কেহবা তীর ধনু লইয়া বাটীর বাহির হইল। ডাকাইতেরা যখন তীরে বিদ্ধ হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল, তাহাদিগকে আহত ও ভয়ার্ত্ত দেখিয়া অস্ত্রধারী লোকমাত্রই সাহস করিয়া দস্যুদলকে ধৃত করিবার জন্য তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। যে সকল ডাকাইতের শরীরে দুই তিনটি তীর বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা আর অধিক দূর দৌড়িতে না পারিয়া রক্তাক্ত কলেবরে মৃতবৎ পড়িয়া গেল; সুতরাং পুলীসপ্রহরীরা অনায়াসে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় পাঠাইতে লাগিল। এইরূপে দশ পনর জন ডাকাইত ধৃত হইল; অবশিষ্ট দস্যুরা কেহবা নিকটস্থ বনের ভিতর, কেহবা বৃক্ষে উঠিয়া, আত্মগোপন করিতে লাগিল। কয়েকজন ডাকাইতকে ধৃত করিয়া দারোগা আহ্লাদে উন্মত্ত হইলেন ও হুকুম

জারি করিলেন যে, আহত দস্যুরা কেহই পলাইতে পারে নাই, এই গ্রামের মধ্যেই বনমধ্যে আশ্রয় লইয়া আছে। তোমরা মশাল জ্বালিয়া গ্রামের চারিদিক ঘেরাও করিয়া থাক, তাহা হইলেই সমস্ত ডাকাইত ধৃত হইবে; বস্তুতঃ তাহাই হইল। পর দিবস প্রাতে অপরিচিত লোক দেখিবা-মাত্রই পুলীসপ্রহরীরা ধৃত করিতে লাগিল। চোর বা সাধু চিনিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না; কারণ যে সকল দস্যু অন্ধকার রজনীতে বনমধ্যে লুকাইয়া ছিল, তাহাদিগের পরিধান কৌপীন, সর্ব্বাঙ্গে তেল কালী মাখা ও তাহাদিগের মধ্যে অনেকের গাত্রেই তীরের চিহ্ন ছিল; সুতরাং দুই চারি জন ভিন্ন প্রায় সমস্ত দস্যুই ধৃত হইল। যাহারা প্রাণ লইয়া নিজ গ্রামে পলায়ন করিয়াছিল, দারোগা স্বদলে সেই গ্রামে আসিয়া অবশিষ্ট দস্যুগণকে ধৃত করি-লেন ও তাহাদিগের ঘর দ্বার লুণ্ঠন করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ডাকা-ইতির অনেক দ্রব্য সামগ্রী বাহির করিলেন। সেই ডাকা-ইতি মোকদ্দমাসূত্রে গ্রামের প্রায় সমস্ত দুষ্ট লোক ধৃত ও বিচারে উচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইল। অধর্ম্মে অর্জ্জিত অর্থ কখনই সঞ্চিত থাকেনা। যদিও ঐ দস্যুদল সময়ে সময়ে বহুসংখ্যক ধনাঢ্য লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু যে সময় তাহারা কারারুদ্ধ হইল, সে সময় তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র-গণ উদরান্নের জন্য কি করিবে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। গ্রামের মধ্যে এক মাত্র কবিরাজ মহাশয়ই ধনে মানে বড় লোক ছিলেন। দস্যুপত্নীরা উদরান্নের অন্য উপায় না দেখিয়া সেই কবিরাজ মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল।

সদাশয় কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "আমি তোমাদিগের সকলকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবার ক্ষমতা রাখি না, দুই এক জন হইলেও দুই এক মাসের জন্য তাহাদিগের উদরান্ন দিতে পারিতাম, তবে তোমাদিগের রক্ষার জন্য আমার যতদূর ক্ষমতা আছে, তাহা আমি অবশ্য করিব। দেখ, আমার দেবী মণ্ডপের সম্মুখস্থ মরাই দুটিতে ধান্য আছে, ঐ ধান্য হইতে তোমাদিগকে এক মাসের উদরান্নের মত ধান্য দিব, তোমরা সকলে কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিতে আরম্ভ কর, তোমাদিগের পূর্ণবয়স্ক বালকগণকে মজুরি করিতে পরামর্শ দাও। আমি জানি তোমাদিগের মধ্যে অনেকেরই গৃহে এক একটি দুগ্ধবতী গাভী আছে, কল্য অবধি সে দুগ্ধ বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ কর, তাহাতেই তোমাদিগের তৈল লবণাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। এ বৎসর বৈশাখ মাস হইতে সকলেই দুই চারি বিঘা ভূমি লইয়া তাহাতে ধান্যরোপণ করিবার চেষ্টা দেখ, যদি ঈশ্বরানুকম্পায় উত্তমরূপ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আর তোমাদিগের অন্নকষ্ট থাকিবে না। আমার কাছে আপাততঃ ঋণস্বরূপ যে ধান্য গ্রহণ করিবে, তাহাও অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিবে।" কবিরাজ মহাশয়ের এই সকল সুনীতির কথায় অনেকে কর্ণপাত করিলেন, কিন্তু যে সকল দস্যুপত্নী চিরকাল দুগ্ধ অন্ন আহার করিয়া আসিয়াছে, তাহারা পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে স্বীকৃত হইল না। দস্যুদিগের স্ত্রীপুত্রপরিবারগণ নিতান্ত অনাথ হইয়া পড়ায়, কবিরাজ মহাশয় প্রত্যহ সকলের বাটীতে যাইয়া সংবাদ লইতেন। যাহারা তাঁহার উপদেশ

মত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা এক রকম নিরুদ্বেগে শাকান্ন ভোজন করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল ও কবিরাজ মহাশয়ের প্রতি তাহাদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইরূপে দস্যুপরিবারগণ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ পূর্ব্বকথিত কায়স্থপুত্রের মৃত্যু হইল। তিনি যে কবিরাজ মহাশয়ের নিকট কিঞ্চিৎ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহা পরিবারগণকেও বলিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং কায়স্থপুত্রের পরিবারগণও দস্যুপরিবারগণের ন্যায় বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িল। দস্যুপরিবারেরা কবিরাজ মহাশয়ের পরামর্শানুসারে চলায়, এক রকম দিনপাত করিতেছে দেখিয়া, কায়স্থপত্নীও কবিরাজের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি সে সময়ে কায়স্থপত্নীকে গচ্ছিত টাকার কথা কিছুই বলিলেন না, কেবল এইমাত্র ভরসা দিলেন যে, আপাততঃ আমার নিকট মাসিক পঞ্চমুদ্রা ঋণের স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, তাহার পর তোমাদিগের জীবিকানির্ব্বাহের একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিব। কবিরাজ কায়স্থপত্নীকে এইরূপ ভরসা দেওয়ায় তাঁহার মৃতদেহ যেন পুনর্জ্জীবিত হইল। তিনি দুই হস্ত তুলিয়া কবিরাজের সন্তানসন্ততিগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাটী চলিয়া গেলেন। এদিকে দস্যুপরিবারগণ স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রত্যেকেই দুই চারি বিঘা করিয়া আশু ধান্যের চাষ করিল ও দৈবানুকূল্য বশতঃ সে বৎসর প্রচুরপরিমাণে আশুধান্য জন্মিল।

এইরূপে দস্যুপরিবারগণ কবিরাজ মহাশয়ের সদুপদেশে প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদিগের উপদেষ্টাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। কায়স্থপত্নীও নিয়মমত প্রতি মাসে পাঁচটি করিয়া টাকা ঋণস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নীতিমান্ কবিরাজের সুযশ ক্রমে চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, নিকটস্থ অন্যান্য যে সকল গ্রামে তিনি সময়ে সময়ে চিকিৎসা করিতে যাইতেন, সে সকল স্থানের ক্ষুদ্র ভদ্র লোকেরাও যখন জানিতে পারিলেন যে, কেবল এক কবিরাজ মহাশয়ের সদুপদেশে এবং অর্থের সাহায্যে একখানি ক্ষুদ্রগ্রামের বহুসংখ্যক নিঃসহায় পরিবারের জীবনরক্ষা হইতেছে, তখন তাঁহার মানমর্য্যাদার আর পরিসীমা রহিল না। বস্তুতঃ তিনি দশ বার খানি গ্রামের মধ্যে এক জন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

এদিকে দস্যুদলের মধ্যে যাহাদিগের অল্পদিন কারাদণ্ড-ভোগের আদেশ হইয়াছিল, তাহারা দুই এক জন করিয়া কারামুক্ত হইয়া বাটী আসিতে লাগিল। গৃহে আসিয়া পরিবারগণের নিকট কবিরাজ মহাশয়ের বদান্যতা ও সদুপদেশের কথা শুনিয়া তাহারা আনন্দে ও বিস্ময়ে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে রোদন করিতে দেখিয়া পরিবারগণও রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, আমাদের গ্রামে কবিরাজ মহাশয় না থাকিলে তোমরা বাটী আসিয়া আর আমাদিগকে দেখিতে পাইতে না; আমরা আহারাভাবে মরিয়া যাইতাম। এইক্ষণে অনেক কষ্টভোগের

পর বাটী আসিয়াছ, আর কখনও দস্যুবৃত্তি করিও না; কবিরাজ মহাশয় যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিতে আরম্ভ কর। তিনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন; তাঁহার উপদেশ মত চলিলে তোমাদিগের আর কোন কষ্টই থাকিবে না। দস্যুগণের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগের সাত আট বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছিল। যাহারা সামান্য দণ্ডভোগ করিয়া বাটী আসিল, তাহাদিগের আর দস্যুবৃত্তি করিতে সাহস হইল না; সুতরাং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিল। যদি তাহারা দলশুদ্ধ একেবারে কারামুক্ত হইয়া আসিত, তাহা হইলে পুনর্ব্বার দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিত কি না তদ্বিষয়ে সংশয় ছিল। দলপতিরা দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে লাগিল। এদিকে যে সকল সামান্য অপরাধীরা কারামুক্ত হইয়া বাটী আসিল, প্রত্যেক রজনীতে পুলীস-প্রহরীরা তাহাদিগের অনুসন্ধান লইতে আরম্ভ করায় তাহারা একেবারে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ান্তর গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইল।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে দস্যুরা যে কয়েক জন কারামুক্ত হইয়া আসিল, তাহারা সকলেই জ্ঞাতিগণকে জীবিকানির্ব্বাহের নূতন ব্যবসা অবলম্বন করিতে দেখিয়া আপনারাও সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। যে কয়েকজন দস্যুদিগের দলপতি ছিল, তাহারা দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে না পারাতে কারাবাসেই তাহাদিগের মৃত্যু হইল। এদিকে কায়স্থ-পত্নী পূর্ণ এক বৎসর কবিরাজ মহাশয়ের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আপনাপনি লজ্জিতা হইয়া বলিল, মহাশয়!

আর কতকাল আমরা আপনার গলগ্রহ হইয়া থাকিব? আমার ছেলে দুটি একপ্রকার কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে কোন একটা ব্যবসা-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করুন। কবিরাজ মহাশয় সেই দিবস কায়স্থপত্নীর নিকট গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলেন, তৎশ্রবণে সুশীলা কায়স্থপত্নী কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অবশেষে গদ্গদ বচনে কহিল, মহাশয়! আপনি দেবতা না মনুষ্য; আপনার নিকট আমার পতি যে দ্বিসহস্র মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছিলেন, এ বিষয় আর কেহই জ্ঞাত ছিল না; আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কায়স্থপত্নীকে আর অধিক কহিতে না দিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, দেখ, আমি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য ধন্যবাদের যোগ্য পাত্র নহি, আমাকে ধর্ম্মভীরু লোক বিবেচনা করিয়াই তোমার স্বামী আমার নিকট বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, আমি যদি এই টাকা তোমাদিগকে না দিয়া আত্মসাৎ করিতাম, তাহা হইলে আমাকে বিশ্বাসঘাতকতারূপ মহাপাপের উচিত দণ্ড অবশ্যই ভোগ করিতে হইত। তোমরা অন্নাভাবে প্রাণে মরিতে না, তবে, বহুকষ্টে উদরান্নের সংস্থান করিয়া লইতে হইত। এক্ষণে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার দুই পুত্রের তাদৃশ লেখা পড়া বোধ নাই, সজ্জনের সহিত সহবাস ছিল না বলিয়া সদসদ্বিবেচনাশক্তিও হয় নাই। যদি তাহাদিগের সমক্ষে গচ্ছিত টাকাগুলি তোমার হস্তে অর্পণ করি, তাহা হইলে, তাহারা একেবারে অলস হইয়া পড়িবে;

জীবিকানির্ব্বাহের উপায় আছে বলিয়া একেবারে পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হইবে। অলস অবস্থায় বাটী বসিয়া থাকিলে, দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিলেও ঘটিতে পারে, এই জন্য বলিতেছি যে, যে টাকা আমার নিকট গচ্ছিত আছে, তাহা হইতে আপাততঃ দুই শত টাকা লইয়া কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত কর ; না হয়, কতক গুলি ধান্য ক্রয় করিয়া উচিত সময়ে 'বাড়ি' দিতে আরম্ভ কর; তাহা হইলে টাকায় সিকি লাভ হইতে পারিবে ; আর তোমার পুত্রদ্বয়ও ক্রমে ক্রমে ব্যবসাকার্য্য বুঝিয়া লইতে পারিবে। কায়স্থপত্নী কহিল, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব ; তবে, আমার বিবেচনায় ধান্যের ব্যবসা করাই যুক্তি-যুক্ত বোধ হইতেছে ; কারণ, আমার পুত্র দুটি আপাততঃ কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিতে পারিবে না। কবিরাজ মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইলেন। কায়স্থপত্নী দুই শত টাকার ধান্য ক্রয় করিয়া 'বাড়ি' দিতে আরম্ভ করায়, পূর্ব্বকথিত দস্যুপরি-বারেরাই সময়ে সময়ে কায়স্থপত্নীর নিকট ধান্য লইতে আরম্ভ করিল। কবিরাজ মহাশয় তৎকালে গ্রামস্থ সকল লোকেরই অভিভাবকস্বরূপ হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার সমক্ষে কাহারও প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা করিতে সাহস হইত না; এই জন্য দস্যুপরিবারগণ কায়স্থপত্নীর নিকট ধান্যের 'বাড়ি' লইয়া উপযুক্ত সময়ে তাহা পরিশোধ করিয়া ফেলিত। এইরূপে কায়স্থপত্নীর এক ধান্যের ব্যবসা দ্বারা অনায়াসে জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। এদিকে দস্যুপরিবারেরা প্রবঞ্চনাদি পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যের উপর কায়মনোযত্নে নির্ভর করায়, দুই এক বৎসরের মধ্যে তাহারাও গুছাইয়া উঠিল।

পাঠকগণ! নীতির প্রয়োজন দর্শাইবার পূর্ব্বে আমি একটি সুদীর্ঘ গল্প উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু এই গল্পটি নীতির প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিবেচনা করিয়া দেখুন, একখানি দস্যুপরিপূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রামে একজন মাত্র নীতিমান্ লোক ছিলেন। তিনি যদিও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, তথাপি পরহিতের জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন, পরকষ্ট তাহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় আঘাত করিত, সেই একটি মাত্র নীতিমান্ সদাশয় সাধু লোকের সদুপদেশে কতদূর ফল ফলিল, উপরি উক্ত গল্পটি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদি কবিরাজ মহাশয় সে গ্রামে না থাকিতেন, তাহা হইলে, যে সময়ে দস্যুদল কারারুদ্ধ হইল, সে সময়ে, দস্যুপরিবারগণ উদরান্নের জন্য কি না করিতে পারিত? হয়ত তাহারা নিকটস্থ গ্রামসমূহে চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া বেড়াইত, না হয় কৃষকদিগের ক্ষেত্র হইতে শস্যাদি চুরি করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিত। সেই সূত্রে হয়ত দস্যুপত্নীগণকেও কারারুদ্ধ হইয়া বর্ণনাতীত কষ্ট-ভোগ করিতে হইত; কেহ কেহ বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিত। পক্ষান্তরে কায়স্থপত্নীর দুর্দ্দশার একশেষ হইয়া যাইত। তিনি বিশিষ্টবংশোদ্ভবা, হঠাৎ কোনক্রমেই নীচবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিতেন না; তবে, উদরান্নের জন্য না হইতে পারে কি? হয়ত পেটের জ্বালায় শিশুসন্তান দুটিকে লইয়া তাঁহাকেও দস্যুপত্নীগণের অনুসরণ করিতে হইত।

ইহা প্রায় শিক্ষিত লোক মাত্রই জানেন যে, শিক্ষা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক পরিমাণে কার্য্যকর হয়। দুই চারি

জন দস্যুপরিবার কৃষিকার্য্য দ্বারা অনায়াসে নির্ভয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে দেখিয়া, পূর্ব্বে যাহাদিগের ঐ কঠোরবৃত্তি অবলম্বন করিবার ইচ্ছা ছিল না, তাহারাও ক্রমে ক্রমে ঐ জাতিবর্গের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের মূল কবিরাজ মহাশয়ের নীতি। যদিও ব্যক্তিগত নীতির অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি মনুষ্যহৃদয় একেবারে নীতিশূন্য হয় নাই। নীতিমান্ হওয়া নিতান্ত শ্রেয়ঃ, ইহা বিশিষ্ট বিধানে জানিয়া শুনিয়াও অনেকে কেবল এক স্বার্থের জন্য কুনীতির দাস হইয়া পড়ে। অসহায় ব্যক্তি-বৃন্দের প্রতি দয়া করা উচিত, ইহা নরঘাতক দস্যুরাও জানে; সময়ে সময়ে তাহারাও বালক ও বৃদ্ধের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। গল্পে শুনিয়াছি, কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে একদল দস্যু ডাকাইতি করিতে গিয়াছিল; তাহারা অন্দর মহলে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই, সেই সম্পন্ন ব্যক্তির ছোট ছোট বালকবালিকাগুলি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল, তদ্দৃষ্টে একজন দস্যু অন্য কয়েক জনকে কহিল, ওরে তোরা কেহ ছেলেপিলের গায়ে হাত দিস্‌নে, ওরা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা চিরকাল দুর্গমপথে নরহত্যা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তাহারাও কখন কখন কাণা খোঁড়া ও অথর্ব্ব গণকে দুই চারি পয়সা দান করিয়া থাকে। সংসার একবারে নীতিবিহীন হইলে, মনুজকুল নিবিড় অরণ্যবাসী হিংস্রক পশুর ন্যায় ব্যবহার করিত; কিন্তু এখনও তাহা হয় নাই; কেবল এক নীতির জন্যই হয় নাই। মনুষ্যের মনে স্বভাব-সিদ্ধ যে সকল বৃত্তি আছে, তাহার মধ্যে সুনীতিও একটা

স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি বলিয়া ধরিতে হয় ; কারণ, শিক্ষা এবং উপদেশ ব্যতিরেকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা দীনদরিদ্রের প্রতি দয়া করিতে অগ্রসর হয়। এক সময়ে আমি কোন সুকুমারমতি বালককে রাজপথে একজন অন্ধের হস্তে একটি পয়সা দিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি ও পয়সাটিতে খাবার কিনিয়া না খাইয়া কাণাকে দিলে কেন? বালক কহিল, "কাণা আজ সমস্ত দিন খাইতে পায় নাই তাই দিয়াছি, আমি আর একটি পয়সা বাবার নিকট চাহিয়া লইব।" বালকের সেই দয়া স্বভাবসিদ্ধ না বলিয়া আর কি বলিতে পারি? এখনও যদি কোন ভদ্রমহিলা গঙ্গাস্নান করিয়া একাকিনী আসিতেছে দেখিতে পাইয়া একজন ঘোর লম্পট তাহাকে বিদ্রূপ করে, তাহা হইলে অন্য পথিকেরা তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, ও সেই কুলনারীকে অভয় দিয়া কহেন, "মা! তুমি স্বচ্ছন্দে বাটী গমন কর, কোন ভয় নাই, আমরা তোমার পশ্চাতে রহিয়াছি।"

জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত লোকের অন্ন বস্ত্রের নিতান্ত প্রয়োজন; তৎসম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য না করিলে সমাজের সমস্ত কার্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। কিন্তু সেই সাহায্যের ভিত্তিতে নীতি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। যাহারা কুনীতির একেবারে দাস হইয়া পড়িয়াছে, পরের কথা দূরে থাকুক, তাহারা তাহাদের নিতান্ত আত্মীয় বন্ধুরও সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হয়। কিন্তু যখন স্বার্থপর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিবৃন্দের নিজের জন্য পরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন তাহারা সুনীতির প্রয়োজন

বুঝিতে পারে ও একবার ঠেকিয়া উত্তমরূপ শিক্ষা করে যে, অন্যের সাহায্য করা কেবল আপনারই মঙ্গলের জন্য; ও সজ্জনের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিলে বিপৎ-কালে সেই অর্থের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; প্রতি-বেশীর বিপদে বা সম্পদে সহায়তা করাতেও কেবল উপকার গচ্ছিত করিয়া রাখা হয়; প্রয়োজনকালে সেই উপকার পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাঠকগণ! নীতিমান্ লোকের উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে কতদূর সুফল ফলে, তাহা পিতৃবৎসল রামচন্দ্রের উপমা দ্বারা দেখুন। নীতিশাস্ত্রে আছে যে, প্রাণপণে পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, রামচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই সেই নীতি প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিলেন। যখন মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর চাতুরীজালে বদ্ধ হইয়া প্রিয়পুত্র রাম-চন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনপ্রস্থানের আদেশ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতে না পারিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন; তখন জানকীনাথ পিতার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ বনগমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাম-চন্দ্র যখন জানকী ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজ-ধানী পরিত্যাগ করত গমন করিলেন, তখন প্রজাবর্গ পরস্পর একদিকে পিতৃবৎসলতা, অপরদিকে, মহারাজ দশরথের স্ত্রৈণতার সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিল। রাম-চন্দ্র একদিকে আপনার সুখ্যাতিবাদ, অপরদিকে গুরুনিন্দার কথা শ্রবণমাত্রেই দুই কর্ণে হস্ত প্রদান করিলেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তদ্দৃষ্টে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, দেখ,

দেখ, আমাদিগের স্ত্রৈণ রাজা কিরূপ সুসন্তানকে বনে পাঠাইতেছেন ? যে রাজা স্ত্রীর চিত্তবিনোদন জন্য রাম রূপ পুত্রকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন, অচিরকালমধ্যেই তিনি এই অন্যায় কার্য্যের ফলভোগ করিবেন। পাঠকগণ ! এই স্থলেই সুনীতি ও কুনীতির ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখুন। স্ত্রীবাধ্য দশরথ স্ত্রীর মনোরঞ্জনার্থ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের ন্যায় সুপুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া শোকে বিহ্বল হইলেন ও তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিল এবং ইহ জগতে তাঁহার সেই কলঙ্ক দেদীপ্যমান হইয়া রহিল। পক্ষান্তরে সুনীতিপরায়ণ পিতৃবৎসল রামচন্দ্র নিজগুণে কতশত লোকের অনুরাগভাজন হইলেন। তিনি সুনীতিপরায়ণ বলিয়াই ঘোর অরণ্যমধ্যেও তাঁহার বন্ধুর অভাব হয় নাই ; অন্য কি কথা, যখন দুর্দ্দান্ত রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃত হন, তখন সেই নির্ধন জটাধারী রামচন্দ্রের জন্য কত লোক প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল। পুণ্যাত্মা বিভীষণ প্রবলপরাক্রান্ত ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়া বিভীষণের পক্ষে যদিও শ্লাঘার কার্য্য হয় নাই, তথাচ "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" এই সুনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করায় তাঁহাকে সম্পূর্ণ দোষী করা যাইতে পারে না। কারণ নীতিশাস্ত্রে আছে যে, যদি ঔরস পুত্রও দুর্নীতির বশবর্ত্তী হয়, তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে। এই জন্যই তিনি দুর্নীতিপরায়ণ মহাপাতকী ভ্রাতার জন্য পুণ্যাত্মা রামচন্দ্রের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করা নিতান্ত অবিহিত বিবেচনায় স্ত্রী

পুত্র পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের অনুবল হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ বিভীষণ বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যেরূপ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইবার পূর্ণকাল উপস্থিত হইয়াছে; এ সময়ে সজ্জনের শরণাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষা করা কোনক্রমেই অবিহিত নহে। রঘুকুলপতি রামচন্দ্র সুনীতিপরায়ণ ছিলেন বলিয়া তিনি কত শতসহস্র লোককে আপনগুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই বিপৎকালে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রক্ষ, নর ও বানর প্রভৃতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিল। "দুর্জ্জনকে পরিত্যাগ করিবে" এই নীতির বশবর্ত্তী হওয়ায় বিভীষণের প্রাণরক্ষা হইল ও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া পরিশেষে রাজ্যলাভ হইল: মন্ত্রণা দিয়া জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ সাধন করাও দোষের মধ্যে গণ্য হইল না। কারণ প্রাণপণে আশ্রয়দাতার ও সজ্জনের উপকার সাধন করাও নীতির একটি অঙ্গ বলিয়া স্থির আছে। পাঠকগণ! দশরথ, রামচন্দ্র ও বিভীষণ, এই তিন জনের মধ্যে কাহার কিরূপ ফল ফলিল, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই অনায়াসে সুনীতির কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

সুনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া না চলিলে মনুষ্যকে পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। বিপৎকালেও দুর্নীতিপরায়ণ লোকের বন্ধু হইতে কেহ চাহে না; অধিক কি, তাহার আশ্রিত ও আত্মীয় লোকেরাও তাহাকে মনের সহিত ঘৃণা করে। দুর্নীতিপরায়ণ লোক প্রথমতঃ বুঝিতে পারে না যে, সে দুর্নীতির দাস হইয়া ভবিষ্যতের জন্য আপনার কতদূর

অমঙ্গলের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছে। সে কেবল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছাচারীর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। দুর্নীতির দাস হইয়া তাহার ধন প্রাণ ও মান যে কতদূর নষ্ট হইতেছে ও প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারও অনিষ্ট না করিয়াও যে, সে সাধারণের কতদূর ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু সে যখন বিপৎসাগরে পতিত হইয়া দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিতে থাকে, কাহাকেও তাহার দুঃখে দুঃখিত হইতে দেখিতে পায় না, তখন সে সুনীতির প্রয়োজন ও প্রভাব বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারে ও সুনীতির পথে পরিভ্রমণ করে নাই বলিয়া তাহার মনে মনে ঘোর আক্ষেপ উপস্থিত হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে নীতির প্রয়োজন ও প্রভাব বুঝিয়া সাবধানতার সহিত কার্য্য না করিলে, পরে আক্ষেপ করা বৃথা মাত্র।

সুনীতি প্রতিপালন করিলে যে কেবল সেই নীতিমান্ লোক সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন ও নীতি যে কেবল নীতিমান্‌কেই রক্ষা করে এরূপ নহে; যদি কেহ কায়মনোযত্নে সুনীতির পথে চলেন, তাহা হইলে, তাঁহার সেই সুনীতির পুণ্যপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া, বহুসংখ্যক লোক তাঁহার অনুরাগী হয়। দেখিয়া আসা যাইতেছে যে, নীতিমান্ লোকেরা কেহ কখন কাহাকেও বাটী হইতে ডাকিয়া আনিতে যান না, তথাপি জনে জনে আসিয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বন করে। যদিও অনেকে নানাকারণ বশতঃ সময়ে সময়ে সুনীতির অপমান করিয়া থাকে, সুনিয়মে চলিতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত নীতিমান্ লোককে সকলেই ভাল

বাসে ও তাঁহার হিতোপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করে। যদি প্রকৃত নীতিমান্ লোক কোন বিপদে পড়ে, তাহা হইলে ভদ্রলোক মাত্রই তাঁহার সাহায্য করিবে। ইহার উদাহরণ-স্থলে আমরা যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতেছি। নীতিমান্ হওয়ায় কতদূর ফল, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন; এই জন্য তিনি অশেষ বিপদে পড়িয়াও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন নাই। কি ধনবলে, কি জনবলে, কি বুদ্ধিবলে, যুধিষ্ঠির অপেক্ষা দুর্য্যোধন সর্ব্বপ্রকারে উন্নত ছিলেন। কিন্তু তিনি সজ্জনের উপদেশ অগ্রাহ্য করিতেন বলিয়া, তৎপক্ষীয় নীচ ব্যক্তিরাও তাঁহাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে পদে পদে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির সমরজয়ী হউক, পাপাত্মা দুর্য্যোধনের সমূলে নিপাত হউক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য এই চারিজন সেনাপতিরও আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কর্ণ এতদূর সাবধান হইয়া চলিতেন যে, দুর্য্যোধন এক দিনের জন্যও বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি মনে মনে পাণ্ডবের জয় কামনা করেন। ভীষ্ম ও দ্রোণের মনোগত অভিপ্রায় দুর্য্যোধনের অবিদিত ছিল না। অন্য কথা কেন বলিতেছি, তিনি সমর-জয়ী হইবেন না, ইহা দুর্য্যোধন নিজেও বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন। আমি পুণ্যাত্মাকে অকারণ কষ্ট দিতেছি, এ জ্ঞান মধ্যে মধ্যে তাঁহারও মনে স্ফূর্ত্তি পাইত। কিন্তু বাল্যকালাবধি দুর্নীতির দাস ছিলেন বলিয়া অসতের পরামর্শ তাঁহার হিতকর বলিয়া বোধ হইত। যুধিষ্ঠির কেবল নীতিমান্ ছিলেন বলিয়া, কার্য্যকালে সকলেই তাঁহার পক্ষ অবলম্বন

করিয়াছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া লইতে হয় যে, সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবার সময়, সুনীতির সহিত সমস্ত কার্য্য করিবার নিতান্ত প্রয়োজন আছে।

পূর্ব্বকালে সাম্যনীতির নামমাত্র ছিল, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কেহ পালন করিতে পারেন নাই। যাঁহারা মুক্ত-কণ্ঠে বলিয়া বেড়াইতেন যে, সকলকে আপনার ন্যায় ভাবিও, প্রত্যেক জীবকে শিবের সহিত তুলনা করিও, তাঁহারাই পদে পদে বৈষম্য ঘটাইয়া নীতির মস্তকে মুদ্গ-রাঘাত করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্ববিধানে উন্নত পদ প্রাপ্ত হইতেন, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে দেবসেবায় কাহারও অধিকার ছিল না, এক ব্রাহ্মণেরাই বেদপাঠ করিতে পাই-তেন, কেবল ব্রাহ্মণজাতিই দানের প্রকৃত পাত্র, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই পুণ্য হইবে, অন্য জাতিকে ভোজন পান করাইলে তাদৃশ পুণ্য হইবে না, এই সকল কথা পদে পদে ব্রাহ্মণেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শূদ্রেরা চিরকাল ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবে, এতদ্ভিন্ন শূদ্রজাতির উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরা অনায়াসে শূদ্রকন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকন্যার অঙ্গ স্পর্শ করিলে শাস্ত্রানুসারে উৎকট দণ্ডভোগ করিবেন। এই সকল পক্ষপাত-পরিপূর্ণ ধর্ম্মনীতি কালে অনিষ্টের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সাম্যনীতির সকলেই পক্ষপাতী। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এতদ্দেশে বিশেষতঃ ইউরোপ-খণ্ডে বহুকালাবধি দাস-ব্যবসায়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রভুরা দাসের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতেন, এইক্ষণকার

গোপজাতি গবাদি পশুর প্রতিও তাদৃশ অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয়। পুরাকালে নরপতিগণ আপনাপন অন্তঃপুর রক্ষার জন্য শত শত পুরুষের পুরুষত্বের হানি করিয়া দিতেন; সেই সকল হতভাগ্যেরা শস্ত্রপাণি হইয়া দিন-যামিনী রাজভোগ্যা কামিনীগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। রাজগণের কাহারও একশত, কাহারও বা দ্বিশত, কাঁহারও বা পঞ্চশত মহিষী থাকিত, তাহারা পশুপালের মত অন্তঃ-পুরবাসপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিত। কাহার কাহার ভাগ্যে সম্বৎসরের মধ্যে এক দিনও পতিসহবাস ঘটিয়া উঠিত না। এই সকল অত্যাচার কত-দূর নীতিবিরুদ্ধ, তাহা অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিরাও অনায়াসে, উপলব্ধি করিতে পারেন। ভারতবর্ষীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, দাসব্যবসা, অন্তঃপুররক্ষার জন্য পুরুষের পুরু-ষত্বহানি ও বহুবিবাহ নিবারণ করিবার জন্য, কোন কালে কোন চেষ্টা করেন নাই; বরং বল্লালসেনের সময় হইতে কৌলীন্যমর্য্যাদার প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় নিঃস্ব লোকেরাও বহুসংখ্যক নারীর পাণিগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেই সেই সকল দুর্নীতির মূলোচ্ছেদন হইতেছে। কতকগুলি নীতিমান্ লোক যখন একত্র হইয়া ইউরোপখণ্ডের দাসব্যবসায় উঠাইবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তখন ধনাঢ্য লোকমাত্রই তাঁহাদিগের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সহৃদয় নিঃস্ব লোকেরা ধনাঢ্য লোকের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে কিছু মাত্র ভীত হন নাই, তাঁহারা লোকের দ্বারে দ্বারে অসম-

সাহসের সহিত বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "তোমরা এই জঘন্য দাসব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মনুষ্য শব্দের বাচ্য হও; যাঁহাদিগের শরীরে অণুমাত্র দয়া আছে, যাঁহারা ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন, যাঁহারা খ্রীষ্টকে তাঁহাদিগের মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা কি সাহসে দাসব্যবসায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিব, সত্য কথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না, কি রাজা কি প্রজা, যাঁহারা দাসব্যবসায় দ্বারা অর্থ অর্জ্জন করেন এবং এক্ষণেও যাঁহারা সেই ব্যবসায় রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের এই মহৎ সঙ্কল্পের প্রতিকূলতাচরণ করিবেন, তাঁহারা কখনই খ্রীষ্টান নহেন, কখনই খ্রীষ্টান নহেন।" "বিকৃতাঙ্গ কাফ্রিজাতিরা কি মনুষ্য নহে, তবে কি জন্য আমরা তাহাদিগকে পশুপালের ন্যায় হাটে বাজারে লইয়া বিক্রয় করিয়া আসি, তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিলে কি জন্যই বা আমাদিগের রাজদণ্ড হয় না? ধর্ম্মশাস্ত্রে কি এ কথার উল্লেখ আছে যে, সুশ্রী এবং সভ্য জাতিরা, কুশ্রী ও অসভ্য জাতির উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে? যদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার কিছু মাত্র উল্লেখ না থাকে, বরং ইহার প্রতিকূল বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন কোন্ ক্ষমতা অনুসারে তোমরা নিগ্রোজাতির উপর স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় এতদূর নিগ্রহ করিয়া থাক?"

নীতিমান্ ব্যক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক লোকের মনে ধারণা হইল যে, মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় করা যার পর নাই জঘন্য ব্যবসায়, এ ব্যবসায় আশু পরিত্যাগ করা

কর্ত্তব্য। যদিও সদাশয় ব্যক্তিমাত্রই দাসব্যবসায়ের প্রতিকূল কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যাঁহারা বহুকালাবধি ঐ জঘন্য ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরমসুখে কালহরণ করিতেছিলেন, তাঁহারা নীতির অনুরোধে এরূপ স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে সহজে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু যখন একবার সত্যের আলোক জ্বলিয়া উঠে, তখন আর তাহার কোনক্রমেই নির্ব্বাণ হয় না; দাসব্যবসায় যে একটা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য, পূর্ব্বে তাহা কেহ বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু যখন এক জন নীতিমান্ লোক দুর্ভাগা নিগ্রোজাতির প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন, তাহাদিগের দুঃখে সমদুঃখী হইলেন, কিরূপে সেই দুর্ভাগাদিগকে নরপিশাচগণের হস্ত হইতে মুক্ত করিব, দিনযামিনী এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন, তাহার পর লোকের দ্বারে দ্বারে দাস-ব্যবসায়িগণের নিষ্ঠুরতাচরণের কথা অকুতোভয়ে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখন এক জন নীতিমান্ লোকের কথা শুনিয়া আর পাঁচ জন লোক সেই বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিতে শিখিল; অবশেষে আপনারাই ধার্য্য করিয়া লইল যে, এই দাসব্যবসায় নীতিবিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহাতে আর সংশয় নাই। যে ব্যক্তি এই সুনীতির উত্তেজক, আমরা অবশ্যই তাহার পৃষ্ঠপোষক হইব। যাহাতে এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদন হয়, আমরা সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা দেখিব। কালে সহস্র সহস্র লোক ঐ সুনীতিপ্রবর্ত্তনে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিল; সুতরাং একদিনে না হউক, ক্রমে ক্রমে সেই জঘন্য দুর্নীতি তিরোহিত হইয়া গেল।

যবনাধিকারে দীর্ঘকাল বাস করিয়া, ভারতবর্ষীয়গণ একেবারে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া দোষাকর দেশাচারকে শাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের একদিকে নবাব সিরাজদ্দৌলা ভূস্বামী, মির্জাফর মন্ত্রী, স্বার্থপর রাজগণ কর্ম্মচারী, অন্যদিকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য; এরূপ স্থানে সুনীতি কি প্রকারে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে? যখন বঙ্গরাজ্য একেবারে রসাতলশায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছে; ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম দূরদেশে পলায়ন করিয়াছে; সুনীতির পথে স্বার্থরূপ কণ্টক বিস্তারিত হইয়াছে; সকলেই স্বার্থের জন্য ব্যস্ত, পরদুঃখ ভাবিবার অবসর মাত্র নাই; সেই যবনাধিকারের পরিশিষ্টাংশে যেন ঈশ্বরের দূত হইয়া, ইংরাজেরা বঙ্গরাজ্যে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। সে সময় সিরাজদ্দৌলার দুর্নীতিতে সকলেরই হৃদয় জ্বলিতেছিল; কিন্তু উপায় নাই বলিয়াই ক্ষুদ্র ভদ্র প্রজামাত্রই সেই দুর্নীতির অত্যাচার ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতেছিল।

চিরকালই দেখিয়া আসা যাইতেছে, যখন সংসার পাপে পরিপূর্ণ হয়, সেই সময় ঈশ্বর কৃপা করিয়া তাহার একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন। বাণিজ্যকার্য্যে ইংরাজজাতিকে নীতিমান্ ও বুদ্ধিমান্ দেখিয়া, এতদ্দেশীয়গণ তাহাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টে চাহিতে লাগিলেন। আমির ওমরাহগণ ভাবিলেন যে, যদি কোন সূত্রে দুর্নীতির প্রধান সহচর সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বঙ্গরাজ্যে পুনরায় সুনীতির পথ পরিষ্কৃত হইবে। কালে

তাহাই হইল; নরপিশাচ সিরাজদ্দৌলা দুর্নীতির দাস বলিয়া সমূলে বিনাশ পাইল, নীতিমান্ ইংরাজেরা ধীরে ধীরে প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। ব্যবসায়ী ইংরাজদিগের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টের অনুচর পাদ্রি সাহেবেরা এতদ্দেশে অকুতোভয়ে সত্যাসত্যের সমালোচনা আরম্ভ করিল। নূতন ইংরাজেরা যদিও সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের স্বার্থের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, চিরকাল কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু জয়লব্ধ বঙ্গরাজ্য সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিয়া তাঁহারা এতদ্দেশীয়গণের কুনীতি সংশোধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদিগের যত্ন ও চেষ্টাতেই সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে, গঙ্গাসাগরে শিশুসন্তান বিসর্জ্জন দেওয়া একটা উপকথার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে, হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত মনুষ্য ক্রয় বিক্রয়ের কথা, আর কাহারও কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় না। এতদ্দেশীয় করদ ও মিত্র রাজগণের সাধ্য কি যে, তাঁহাদিগের অন্তঃপুর রক্ষার জন্য কতকগুলি পুরুষের পুরুষত্ব নষ্ট করাইবেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও মহারাষ্ট্রীয়েরা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই সূতিকাগারে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিত। কেবল এক নীতিমান্ ইংরাজ-প্রভুর প্রভাবে সেই জঘন্য ব্যবহারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। এতদ্দেশীয় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোককে লইয়া যথেচ্ছাচার করিতেন; তাহাদিগের জ্ঞানের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অজ্ঞানান্ধ নরনারীগণকে যে পথে লইয়া যাইতেন, তাহারা দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই পথে ধাবত হইত। এইক্ষণে বিদ্যার আলোক চারিদিকে জ্বলিয়া উঠায়

জ্ঞানচক্ষে সকলেই ভাল মন্দ দেখিয়া লইতেছে, কেহই তর্ক ব্যতিরেকে এক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কোন কার্য্য করিতে চাহে না। জ্ঞানের প্রভাবে বহুবিবাহ আপনাপনি তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। শত শত কৃতবিদ্য যুবকগণ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল এক স্বজাতির মঙ্গলার্থ বিবিধ চেষ্টা পাইতেছেন। পূর্ব্বকালে মনুষ্যেরা মনুষ্যের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়া অনায়াসে নিস্তার লাভ করিতেন, কেহই সাহস করিয়া তাঁহাদিগের সেই সকল দুর্নীতির প্রতি কটাক্ষপাত করিত না। এইক্ষণকার কালে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশুর প্রতি অত্যাচার করিলেও রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

নরাধমেরাও নীতির প্রয়োজন মনে মনে বুঝিয়া থাকে। যাহারা নীতির পথ একেবারে পরিত্যাগ করিযাছে, তাহারাও প্রয়োজনকালে নীতির দোহাই দিতে ক্ষান্ত নহে। বোধ কর, কোন ব্যক্তিকে সকলেই মিথ্যাবাদী প্রতারক বলিয়া জানে, সে যে মন্দলোক, তাহা সে স্বয়ং বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। সেরূপ ব্যক্তি যদি কোন সময়ে আপনার স্বার্থ সাধনের জন্য একজন নীতিমান্ লোকের নিকট গমন করে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে আপনার সাধুতা সপ্রমাণ করিতে যায়। যদি কোন বিষয়কার্য্যের জন্য গিয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই রূপ বলিতে থাকিবে, "মহাশয়, এ কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পণ করুন, আমি এ কার্য্যে বিলক্ষণ পটু, আপনার কাছে, মিথ্যা বলিব কেন? প্রতারণা কাহাকে বলে তাহা আমরা পুরুষানুক্রমে জানি না, মহাশয়! সৎপথে থাকলে

চিরকাল এক মুটা অন্ন করিয়া খাইতে পারিব।” তবেই বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রবঞ্চনার দাস, সামান্য বিষয়ের জন্য অম্লানবদনে শত শত মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহাকেও সত্যের দোহাই দিয়া কথা কহিতে হয়।

একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন, Even the wicked hate wickedness in others. যে ব্যক্তি চিরকাল চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে সেও যদি দেখিতে পায় যে, রাজপথে পুলীসপ্রহরীরা একজন তস্করকে ধৃত করিয়া লইয়া যাই-তেছে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও দশজনকে শুনাইয়া বলিতে আরম্ভ করিবে, চুরি কোরে মরিস্ কেন? খেটে খুটে কেন খা না; জানিস্‌নে যে, পাঁচ দিন চোরের একদিন সাধের; এখন যাও শ্রীঘরে গিয়ে পাপের ভোগ ভোগোগে। ঐ চোরের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, রাজপথের দর্শকেরা তাহাকে সাধু বিবেচনা করিয়া বলিবে, হাঁ মহাশয়! ঠিক কথা বলিতেছেন, এত সাজা পায়, তবুত চুরি কর্‌তে ছাড়ে না। ব্যবসায়ী চোর বলিবে, যার যেমন স্বভাব, সে কি কখন তাহা ছাড়িতে পারে? এইরূপ সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ লোকই আপনাপন পাপ গোপন করিয়া অন্য অন্য পাতকিগণকে ভৎসনা করে। আর একটি আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তি চিরকাল অসৎপথের পথিক হইয়া বেড়াইতেছে, চুরি ও প্রতারণা যাহাদিগের ব্যবসায়, তাহারাও সৎসঙ্গ পাইলে মনোযোগ পূর্ব্বক সৎকথার আলোচনা শুনিয়া থাকে, সজ্জন ব্যক্তিকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। যদিও

নিজে অসৎ, কিন্তু আপনার পুত্রপৌত্রগণকে বিশেষরূপ বিদ্যাশিক্ষা করাইবার চেষ্টা দেখে ও যাহাতে তাহার পুত্র-পৌত্রগণ সৎপথের পথিক হইয়া সজ্জনের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করে। সুরাপায়ীরা কি আপন পুত্রকে সুরাপান করিতে দেখিলে ভর্ৎসনা করে না? যে অতিশয় বেশ্যাসক্ত, সেও যাহাতে তাহার পুত্রটি সেরূপ দুর্নীতিপরায়ণ না হয়, কায়মনোযত্নে তাহার চেষ্টা পায়। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, একজন সুরা-পায়ী সুরাসেবনে উন্মত্ত হইয়া তাহার অষ্টমবর্ষীয় পুত্রকে বলিতেছে, "তুই আজ স্কুলে যাস্ নাই কেন? লেখা পড়ায় তোর বিশেষ মনোযোগ নাই; এর পর কি মূর্খ হয়ে আমা-দের মত হয়ে উঠ্‌বি? আমরা যদি ছেলে বেলা মনোযোগ করে লেখা পড়া শিখিতাম, তা হলে কি আর এমন করে অধঃপাতে যেতাম।" এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, যে সকল লোক স্বভাব-দোষেই হউক, বা সঙ্গদোষেই হউক, কিম্বা সুশিক্ষার অভাবেই হউক, একেবারে দুর্নীতির দাস হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা, নিজ পুত্রের কথা দূরে থাকুক, প্রতিবাসীর সন্তানগণকেও দুর্নীতি-পরায়ণ দেখিলে আপন ক্ষমতানুসারে নীতিমান্ হইবার উপদেশ দিয়া থাকে।

নীতির অভাবে এক দিনের জন্যও সংসারের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। যাহারা নিরক্ষর, কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারাও নীতির প্রয়োজন বুঝিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের লোক সকলেই অবগত আছেন

যে, চৈত্র বৈশাখ মাসে কৃষিজীবী লোকমাত্রই মহাজনের গোলা হইতে ধনস্বরূপ ধান্য লইয়া গিয়া আপনাদিগের উদরান্নের সংস্থান করে। সময়ে যদি তাহাদিগের ধান্যক্ষেত্রে উচিত মত ধান্য জন্মে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে মহাজনের ধান পরিশোধ করিয়া ফেলে। যদি কোন দুষ্টলোকে তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়, অর্থাৎ এইরূপ কথা বলে যে, পাঁচ কাটা ধান এখনও ঘরে যায় নাই, এরি মধ্যে তাড়াতাড়ি মহাজনের ধার শোধ্‌বার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? আগে অন্য পাঁচটা কাজ সার, তার পর হয়ে বয়ে ওঠে মহাজনকে দিবে, তা না হয় বলিবে, এবার হয়ে উঠ্‌লো না, আর বছর দিব! তদুত্তরে সদাশয় কৃষক বলিবে, অমন কথা বলিও না; আগে মহাজনের ধন পরিশোধ করা চাই; যখন ঘরে ভাত থাকে না, তখন যে ধান দিয়ে ছেলে পিলের প্রাণ বাঁচায়, আগে তার ধার না শুধ্‌লে ধর্ম্ম থাক্‌বে কেন? আগে মহাজনের ধার সুধে না রাখ্‌লে আবার হাত পাতলেই দেবে কেন? এবার যেন দুকাটা হয়েছে, হাজাশুকার বছরে প্রাণ বাঁচিয়েছিল কে? আমার ঘরে যদি একটা ধানও না যায়, তাহলেও মহাজনের পথ আগে খোলসা করে রাখ্‌বো। এতদ্দারা কাহার না উপলব্ধি হইবে যে, অজ্ঞানান্ধ কৃষিবল লোকেরাও নীতির প্রয়োজন বুঝিয়া থাকে ও তদনুরূপ কার্য্য করে। যে কৃষকের কথা উপরে উক্ত হইল, তদ্দারা সামান্য বুদ্ধির লোকও বুঝিতে পারে যে, সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এক বিশ্বাসের উপরই সংসারের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা দৈনিক মজুরির দ্বারা

গুজরাণ নির্ব্বাহ করে। মুদির দোকানই তাহাদিগের ভাণ্ডার ঘর। ক্ষুদ্র ভদ্র সকলেই সমভাবে পরিশ্রম করিতে পারে না; সুখ অসুখ সকল শরীরেই আছে; মুটে মজুর লোক যদি অসুস্থ অবস্থায় দুই চার দিবস উপার্জ্জন করিতে না পারে, তাহা হইলে আপনাপন পল্লীর মুদির দোকান হইতে আহার্য্যোপযোগী সামগ্রী ঋণ করিয়া লইয়া শরীর রক্ষা করিয়া থাকে। যাহারা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করে, তাহারা হাতে পয়সা আসিলেই সর্ব্বাগ্রে ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলে; যাহারা নিতান্ত অজ্ঞান, তাহারা সুসময়ে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য না করায় অসময়ে বর্ণনাতীত কষ্টভোগ করে।

কুনীতি এবং সুনীতির প্রভেদ কি, নিম্নে তাহারই একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। যবন অধিকারে যখন প্রজা পীড়নের একশেষ হইয়া উঠিয়াছিল, পরস্ব হরণে যখন রাজা ও রাজপুরুষগণ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তখন যদি কাহারও কোন সূত্রে কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় হইত, রাজা ও রাজপুরুষগণের ভয়ে সে ঐ ধন মৃত্তিকাসাৎ করিয়া রাখিত। রাজকার্য্যের দ্বারা যাঁহারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেন, সে ধন নিরাপদে ভোগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া ঐ সময়ে যক দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। যে যক্ষের হস্তে ধন ন্যস্ত করা হইত, তাহার জীবদ্দশায় ধনস্বামী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোড় করে কহিতেন যে, যদি আমার পুত্রপৌত্রগণ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে এই ধন ন্যস্ত করিও। এইরূপ করিলেই তুমি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে। যদি এ ধন আমার উত্তরাধিকারিগণকে না দিয়া

অন্য কোন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত কর, তাহা হইলে স্থাপিত ধন হরণে যে পাতক হয়, তোমাকে সেই পাপে পাপী হইতে হইবে। যাঁহারা অতি অল্পমাত্র ধন উত্তরাধিকারিগণের জন্য রাখিয়া যাইতে মনন করিতেন, তাঁহারা আপনাপন গৃহের মধ্যস্থলে একটি সুগভীর গর্ত্ত কাটিয়া পিতলের কলসী করিয়া ঐ ধন পুঁতিয়া রাখিতেন। সেই স্থানে কত পরিমাণে ধন সেই গর্ত্তমধ্যে রহিল, ঘরের দিয়ালের গায়ে সঙ্কেত দ্বারা তাহা লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপে তৎকালের ধনাঢ্য লোকের ধন অদ্যাপিও কত স্থানে মৃত্তিকাসাৎ হইয়া রহিয়াছে, কখন কখন কাহারও ভাগ্যে সেই ধন লাভ হইয়া থাকে। সংসারের লোক যৎকালে একেবারে কুনীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সে সময়ে ধনেরও প্রকৃত ব্যবহার হইত না। এক্ষণে নীতিজ্ঞ রাজার অধিকারে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে। প্রজারা অকুতোভয়ে রাজভাণ্ডারে আপনার ধন রাখিয়া আসিতেছে। কি সাহসে তাহারা এরূপ কার্য্য করে? তৎপ্রত্যুত্তরে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, রাজার প্রতি এইক্ষণকার প্রজার কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাই। রাজার প্রতিজ্ঞা অটল, সত্য বাক্য কহিয়া থাকেন, যাহা বলেন, কার্য্যে অবশ্যই তাহা পরিণত করিয়া থাকেন, প্রজার এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছে; সেই জন্য রাজভাণ্ডারে ধন রাখিতে কাহারও অবিশ্বাস নাই। নৈতিক ইংরাজ রাজ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছে। আইনের চক্ষে ছোট বড় ভেদাভেদ নাই। রাজা যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণ করেন, সমস্ত প্রজারাও সেই-

রূপ সুখভোগ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সংসারের নীতির প্রয়োজন কত, তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এক বিশ্বাস লইয়াই বাণিজ্য-কার্য্য চলিতেছে। একজন দশ টাকা বেতনভোগী কিঙ্করকে প্রভু অনায়াসে দশ সহস্র মুদ্রা দিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। রাজভাণ্ডারের বিপুল অর্থ অষ্টমুদ্রা বেতনভোগী দ্বারবানের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, মহাজনেরা মুটে মজুরের হস্তে দিয়া রাশি রাশি মুদ্রা আপনাদিগের গদিতে পাঠাইয়া দেন। যদিও মধ্যে মধ্যে কিঙ্করেরা বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করে, কিন্তু তজ্জন্য জগৎ কুনীতিরই স্থান হইয়াছে, এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না। ব্যক্তিগত দোষ ধরিয়া সমাজের দোষ প্রতিপন্ন করা যায় না।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, নীতি স্বভাবসঙ্গত; সকলের শরীরেই প্রচ্ছন্ন ভাবে নীতি অবস্থান করিতেছে। তবে যে যেমন অবস্থায় পড়ে, কার্য্যক্ষেত্রে সে সেইরূপ নীতির কার্য্য দর্শাইয়া থাকে। বিনা স্বার্থে কে কোথায় দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়াছে। একটি সুন্দর শিশু-সন্তান রাজপথে ক্রীড়া কৌতুক করিয়া বেড়াইতেছে, সে পথে জনমানব গমনাগমন করিতেছে না; সেই সময় সেই পথে যদি একজন নরঘাতক দস্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, সে কখনও ঐ শিশু সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। যদি সেই শিশুর অঙ্গে কতকগুলি আভরণ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই দস্যু তাহার প্রাণ বধ করিয়া আভরণগুলি আত্মসাৎ করিবে। কৌতুক করিয়া কেহ কখন কাহারও জীবনান্ত করে না। স্বার্থ ব্যতিরেকে

কেহ কখন মিথ্যা কথা কহে না, প্রবঞ্চনা করে না ও পরপীড়নে অগ্রসর হয় না। সুনীতির পথ পরিত্যাগ করিয়া দুর্নীতির পথ অবলম্বন করার একমাত্র কারণ স্বার্থ। যখন লোকে অজ্ঞান থাকে, স্বার্থ কাহাকে বলে তাহা স্বপ্নেও জানে না; সে সময়ে সকল বিষয়েই সরলতা ও সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার পর সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বার্থ জ্ঞান হইলে, সে সাধুভাব ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইতে থাকে। সপ্তম ও অষ্টম বর্ষীয় বালক বালিকারা আপনাপন ভাই ভগ্নীর জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিয়া থাকে, আবার তাহারাই পূর্ণবয়স্ক হইয়া ঘোর কলহে প্রবৃত্ত হয়। যে ভ্রাতার অসুখের কথা শুনিলে এক সময়ে চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হয়, আবার স্বার্থের জন্য সেই ভ্রাতারই নিধন চেষ্টা করিয়া থাকে। তবেই ব্যক্তিগত নীতি-বিপর্য্যয় কেবল এক স্বার্থের জন্যই হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

এইক্ষণে ব্যক্তিগত দুর্নীতি সংশোধনের কত দূর প্রয়োজন ও এক উপদেশ ভিন্ন তাহার আর অন্য কোন উপায় আছে কি না, নিম্নে সেই বিষয়ের হেতুবাদ করা যাইতেছে। কোন পল্লীস্থ একজন সুরাপায়ী আপনাপনি বলিতেছে, "আমি আপনার পয়সা দিয়া মদ খাই, আপনার ঘরে বসিয়া থাকি, কোন কালে কাহারও অনিষ্ট করি না, যদি সুরাপানে বিহ্বল হইয়া উঠি, তাহা হইলে আত্মপরিবারের উপরই দৌরাত্ম্য করিয়া থাকি, কখনও বাটীর বাহিরে গিয়া অপরিচিত জনের প্রতি হস্তোত্তোলন করি না, তবে লোক আমাকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করে কেন?" এই কথা শুনিয়া

একজন নীতিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সত্য, কিন্তু অগ্রে আমার এই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও, তাহার পর আমি এক এক করিয়া তোমার সমুদয় প্রশ্নের উত্তর করিব। তোমার বাটীর সম্মুখস্থ চতুষ্পাঠীতে রামনিধি বিদ্যারত্ন বহুকালাবধি অবস্থান করিতেছেন। তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত; অধ্যাপক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যারত্ন মহাশয়ই উচ্চ বিদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; সেই সূত্রে বিদ্যারত্ন বিলক্ষণ দশ টাকা সঙ্গতি করিয়াছেন; কিন্তু কৃপণ স্বভাব বলিয়া সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। বিদ্যারত্নের কথা উপস্থিত হইবামাত্রই মাতাল দুই কর্ণে হস্ত দিয়া কহিল, ছিছি মহাশয়! কি করিলেন; প্রাতঃকালে ও নরাধম বামুনের নাম করিলেন কেন? দেখিবেন, অদ্য আমার ও আপনার অদৃষ্টে অন্ন জুটিবে না। প্রশ্নকারী ভট্টাচার্য্য কহিলেন, উত্তম কহিতেছ! বিদ্যারত্ন মহাশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, নির্ব্বিরোধী, কাহারও ভাল মন্দ কোন কথায় থাকেন না, কোন কালে কাহারও নিকট এক কপর্দ্দক ও ঋণ গ্রহণ করেন না, এক পয়সার জন্য কাহাকেও বিদ্যারত্নের দ্বারে কোন কালে দাঁড়াইতে হয় না, কেবল তাঁহার একমাত্র দোষ তিনি কৃপণ; এই সামান্য দোষের জন্য তুমি অনায়াসে তাঁহাকে নরাধম বলিলে; তিনি যদি নরের অধম, তাহা হইলে তোমাকে পল্লীস্থ লোক কতদূর ঘৃণা করিতে পারে, তাহা তুমি আমাকে বলিয়া দাও। মাতাল কহিল, কেন মহাশয়! আমার দোষ কি? আমি কাহার অনিষ্ট করিযাছি, আপনার পয়সা দিয়া ঘরে বসিয়া মদ খাই, ইহাতে লোকে আমাকে মাতাল বলিবে কেন?

প্রশ্নকারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, উত্তম কথা। যেমন তুমি বলিতেছ, আমি আপনার পয়সা দিয়া মদ খাই, লোকে আমাকে মন্দ বলিবে কেন? বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কি সেই-রূপ বলিবার অধিকার নাই যে, আমার বহুকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিব, তজ্জন্য লোকে আমাকে কৃপণ বলিয়া ঘৃণা করিবে কেন? মাতাল কহিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি বুঝিতেছেন না, যার যেমন টাকা, সে যদি সেইরূপ ব্যয়ভূষণ না করে, তাহা হইলে কি ভাল দেখায়? শুনিতে পাই বিদ্যারত্নের দুই-তিন শত টাকা মাসিক আয়, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কখন উঁহার বাটীতে আমা-দিগের পাত পড়ে নাই। অর্জ্জিত ধনের যদি উচিত ব্যবহার না হইল, তাহা হইলে সে ধনের প্রয়োজন কি; যক্ষের মত টাকা বুকে করিয়া থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে না? মরি-বার সময় টাকাগুলা কি ঠাকুরের সঙ্গে যাইবে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার একটি কথাও অযথার্থ নহে। ভাল, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি ধনের উচিত ব্যবহার কাহাকে বল? মাতাল কহিল, কেন মহাশয়! যাহার টাকা আছে, সে দোল করুক, দুর্গোৎসব করুক, পুত্রকন্যার বিবাহে দশ টাকা ব্যয় করুক, কাঙ্গাল দুঃখীকে দুপয়সা হাতে তুলে দিক; ইহাকেই ধনের উচিত ব্যবহার বলে। ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ভাল, তোমার মাসিক-আয় কত? মাতাল কহিল, বাবা মরিবার সময় হাজার টাকা মাসিক আয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমি তাহার কিয়-দংশ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি; তথাচ আমার এখনও চারি

পাঁচ শত টাকা মাসিক আয় আছে। ভট্টাচার্য্য কহিলেন, চারি পাচ শত টাকা মাসিক আয় সামান্য আয় বলিয়া ধরিতে পারা যায় না; মাসে মাসে পাঁচ শত টাকা তোমার ঘরে আসিয়া থাকে, সে টাকার তুমি কি উচিত ব্যবহার করিয়া থাক? মাতাল কহিল, কেন মহাশয়! আমি ভাল খাই, ভাল পরি, এক মদের খরচই আমার মাসে প্রায় একশত টাকা যায়, এ ছাড়া আবার গাড়ি ঘোড়ার খরচপত্র আছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, পূর্ব্বে তুমি ধনের উচিত ব্যবহার সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াছিলে, আপনার বেলা তাহার একটিরও নাম করিলে না; তুমি কি জন্য দোল, দুর্গোৎসব, কন্যাপুত্রের বিবাহে মহাসমারোহ, এবং কাঙ্গাল দুঃখীকে হাতে তুলে দশ টাকা দান কর না? মাতাল কহিল, মহাশয়! আপনি সব উল্‌টা কথা ধরিতেছেন; এইক্ষণকার কালে দোলদুর্গোৎসব করা কি আমাদিগের কার্য্য; যে মহার্ঘ-গণ্ডা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে স্ত্রীপুত্রপরিবারের ভরণ পোষণ হইয়া উঠাই ভার; আর, যার যেমন আয়, তার তেমনি খরচ, এখনকার কালে কি চারি পাঁচ শত টাকায় ক্রিয়াকাণ্ড হইতে পারে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, তোমার যদি চারি পাঁচ শত টাকা আয়ে ক্রিয়াকাণ্ড না হইতে পারে, তাহা হইলে বিদ্যারত্নের দুই শত টাকার আয়ে কি প্রকারে ক্রিয়া-কাণ্ড হইবে? তোমার ন্যায় বিদ্যারত্নেরও স্ত্রীপুত্র পরিবার আছে। তুমি অপব্যয়ী, বিদ্যারত্ন ন্যায্যব্যয়ী; তুমি সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য কর, বিদ্যারত্ন তাহা করেন না। ভবিষ্যতে পুত্র-পৌত্রের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতেছেন। তোমার

যে অসদ্ব্যয়ে ধনক্ষয় হইতেছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে আপন মুখেই ব্যক্ত করিয়াছ। তোমার পিতা মৃত্যুকালে সহস্র মুদ্রা মাসিক আয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তুমি তাহা পঞ্চ শত মুদ্রায় দাঁড়-করাইয়াছ; বিদ্যারত্নের পিতা মৃত্যুকালে এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যান নাই, তিনি আপন ক্ষমতায় দুই শত টাকা মাসিক আয় করিয়াছেন; তোমার পিতা তিন বৎসর মাত্র পরলোক-গত হইয়াছেন, এই স্বল্পকালের মধ্যে তুমি তাঁহার সঞ্চিত বিষয়ের অর্দ্ধাংশ নষ্ট করিয়াছ; এইক্ষণে যেরূপ ভাবে চলি-তেছ, এইরূপ আর কিছুকাল চলিলে, তোমার পুত্রপৌত্র-দিগের জন্য এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারিবে না; তাহারা উদরান্নের জন্য কি করিবে, এইক্ষণে তাহার কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না; হয়ত তাহারা ধনহীন হইয়া সমা-জের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিবে। বড় মানুষের ছেলে বলিয়া তাহাদিগের এক্ষণে যে গর্ব্ব আছে, তোমার মৃত্যুর পর সহসা তাহারা সে গর্ব্ব পরিত্যাগ করিবে না; বড় বাড়ীখানা দেখা-ইয়া ও পিতৃপিতামহের পরিচয় দিয়া, লোকের কাছে ঋণ করিবে; সেই ঋণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হইলে, মিথ্যা কথা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা আপনাদিগের মান বাঁচাইবার চেষ্টা দেখিবে; সুযোগ পাইলে এইক্ষণকার সভ্যতা ধরণের পরস্ব হরণেরও ত্রুটি করিবে না। এই সমস্ত অনিষ্টের মূল তোমার একমাত্র সুরাপান ও অসদ্ব্যয়। পক্ষান্তরে, বিদ্যারত্ন, বোধ-কর, মৃত্যুকালে পঞ্চ শত মুদ্রা মাসিক আয় রাখিয়া গেলেন। তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ, পিতা এবং পিতামহের পরিমিতাচার দেখিয়া, অবশ্যই সেইরূপ আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবে,

সুতরাং বিদ্যারত্নের পরিবারগণ তাঁহার মৃত্যুর পর সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। তোমার পুত্রপৌত্রগণের তোমার ন্যায় অপব্যয়ী ও সুরাপায়ী হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিবে। এই সকল ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তোমার প্রতিবেশিগণ তোমাকে সুরাপায়ী বলিয়া ঘৃণা করে। আর একটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর; তুমি বলিতেছ যে, আমি ঘরের টাকা দিয়া মদ খাই, লোকে আমাকে মাতাল বলিবে কেন? তদুত্তরে আমি এই প্রশ্ন করিতেছি, অন্য এক ব্যক্তি ঘরের টাকা লইয়া জুয়া খেলিয়া থাকে, রাজপুরুষেরা তাহাকে ধৃত করিয়া দণ্ড দেন কেন? এ দেহটি আমার, আমি যদি এই শরীর ইচ্ছা পূর্ব্বক নষ্ট করিবার চেষ্টা করি, রাজা তাহার প্রতিকূলাচরণ করেন কেন? এই জন্য বলিতেছি যে, নীতি-বহির্ভূত কার্য্য করিলে দেশভেদে ও কালভেদে রাজার নিকট ও সমাজের নিকট তাহার দণ্ডের তারতম্য হয়। কোন কোন দোষে রাজদণ্ডও হয়, কোন কোন দোষে বা সামাজিক দণ্ডও হয়, আবার কতকগুলি দোষের রাজদণ্ড নাই এবং সামাজিক দণ্ডও নাই, কিন্তু স্বভাব, দোষের উপযুক্ত দণ্ড তদ্দণ্ডেই দিয়া থাকেন। তুমি যেরূপ নীতিবহির্ভূত কার্য্য করিতেছ, তজ্জন্য তোমাকে ত্রিবিধ দণ্ডই ভোগ করিতে হইবে। যে দিবস সুরাপানে বিহ্বল হইয়া রাজপথে আসিয়া পড়িবে বা পথিকদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে, সেই দিবসই, তোমাকে পুলীস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, রাজদণ্ডের ভাজন হইতে হইবে। তুমি বিশিষ্ট-বংশোদ্ভব হইয়া, এইক্ষণে ম্লেচ্ছের ন্যায় আচার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছ, তজ্জন্য বিশিষ্ট সমাজে তোমাকে

মস্তক অবনত করিয়া চলিতে হয়; খাদ্যাখাদ্যের বিচার কর না বলিয়া, হয়ত একদিন তোমাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। যদি বল, তাহাতে ক্ষতি কি, এইক্ষণে যদিও তাহা বুঝিতে না পার, কন্যাপুত্রের বিবাহ দিবার সময় তাহা বিলক্ষণ বুঝিবে। সর্ব্বোপরি দিনযামিনী সুরাপান করিয়া আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতেছ, তজ্জন্য অতি অল্পকালের মধ্যেই উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া যখন বর্ণনাতীত কষ্টভোগ করিবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, কুনীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে কতদূর প্রাকৃতিক দণ্ড-ভোগ করিতে হয়। এখন কি বুঝিতে পারিলে যে, সংসার-আশ্রমে থাকিতে গেলে নীতির প্রয়োজন আছে কি না?

ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া, সুরাপায়ীর কিয়ৎপরিমাণে চৈতন্য হইল। সে কিয়ৎক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্যকে সবিনয়ে কহিল, মহাশয়! আজ আপনি আমার জ্ঞানচক্ষুদাতা হইলেন; এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সদ্‌গুরু না হইলে শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয় না। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন যে, "স্বভাব যায় না মলে, ইল্লত যায় না ধুলে," ফলতঃ এ কথা সত্য বলিয়া আর আমি বিশ্বাস করিব না। কারণ, যথার্থ নীতিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ মহাপাপীর হৃদয়েও অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। সেই অগ্নিতে পাপীর হৃদয়ের সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমি যথার্থ বলিতেছি, লোকে উপদেশ দিবার প্রণালী জানে না, সেই জন্যই উপ-দেশের ফল ফলিতেছে না। আপনি আজ আমার কথাতেই আমাকে হীনবল করিয়া আনিলেন। আপনার কথা আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতে বাধ্য হইলাম; যেহেতু

আপনি আমাকে বিরক্ত করিয়া কথা কহিলেন না। আমি সুরাসক্ত হইয়া সঞ্চিত সম্পত্তি নষ্ট করিতে আরম্ভ করায়, অনেকেই আমাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া আমার গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে আমি পূর্ণপাপী হই নাই বলিয়া পাপের পথ বড় পরিষ্কার বোধ হইত। কুনীতির পথে বিঘ্ন আছে, তাহা একবারও ভাবিবার অবসর প্রাপ্ত হইতাম না। এই জন্য, গুরুজনেরা যখন আমাকে কর্কশ কথায় উপদেশ দিতেন, সে উপদেশ আমার হৃদয়গ্রাহী না হইয়া বরং ঘোর বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিত। এইক্ষণে আমি পূর্ণমাত্রায় পাপী হইয়া উঠিয়াছি, পাপের ফল মধ্যে মধ্যে অনুভবও করিতেছি, পূর্ব্বের ন্যায় সুরাপানে আর সুখ বোধ হয় না, তথাচ অভ্যাস বশতঃ না খাইয়াও থাকিতে পারি না। গত রজনীতে অপর্য্যাপ্ত সুরাপান করিয়াছিলাম; আমাকে পুনঃপুনঃ সুরাপান করিতে দেখিয়া আমার সহধর্ম্মিণী আমার দুইটি হস্ত ধারণ করিয়া সবিনয়ে কহিয়াছিলেন, তুমি আজ কি করিতেছ? এরূপ বাড়াবাড়ি মদ খাইলে আর কয় দিবস বাঁচিবে? এই রুক্ষকথা শুনিয়া, তাঁহাকে আমি যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়াছিলাম। এই সংবাদ আমার শ্বশুর মহাশয় প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে যৎপরোনাস্তি ভৎ´সনা করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই প্রাতে উঠিয়া বলিতেছিলাম "আমি আপনার টাকা খরচ করিয়া মদ খাই, লোকে আমাকে মাতাল বলিয়া ভৎ´সনা করিবে কেন? সে লোক আর কেহ নহে, আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়। মহাশয়! গত রজনীতে আমি পাপের শেষ

সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। সুরাপান করিয়া লোকে যত-দূর অত্যাচার করিতে পারে, গত রজনীতে তাহার কিছুই বাকী ছিল না। এইক্ষণে মহাপাতকীকে আপনি মিষ্টবাক্যে গুটিকতক নীতিকথা বলিয়া উদ্ধার করিলেন। আমি আর সুরাপান করিব না, আপনার সাক্ষাতে শপথ করিয়া বলি-তেছি, অদ্য হইতে জন্মের মত মদ খাওয়া ছাড়িয়া দিলাম। আপনি যেমন আমাকে রক্ষা করিলেন, সেইরূপ আমার আর কয়েকটি বন্ধুকেও রক্ষা করিতে হইবে।" মাতালের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইল দেখিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহ্লাদের সহিত কহিলেন, যদি আমার কথা শুনিয়া তোমার কিছু মাত্র উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বোধ করিব; তুমি এক্ষণে সুরাপান পরি-ত্যাগ করিবে বলিতেছ, যদি তুমি নিজ প্রতিজ্ঞা সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে তোমার বন্ধুগণেরও এই সূত্রে বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে সার কথা বলিতেছি যে, নীতির অভাবে আমরা এক মুহূর্ত্তকালও সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারি না। কুনীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা নীতিবহির্ভূত কার্য্য করে, কিন্তু সমাজশুদ্ধ লোক তাহার ন্যায় নীতিবহির্ভূত কার্য্য করে না বলিয়া মহাপাতকীর প্রাণরক্ষা হয়। সে, যে প্রকৃ-তির লোক ও প্রতিবেশীর উপর যেরূপ কুব্যবহার করে, প্রতিবেশীরা যদি সকলে একমত হইয়া তাহার প্রতি সেই-রূপ ব্যবহাব করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে কত-ক্ষণ বাঁচিতে পারে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? এই বিষয়

একটি সামান্য উদাহরণ দিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

এক সময়ে আমরা কয়েকজন ভট্টাচার্য্য মিলিত হইয়া, মাহেশের স্নানযাত্রা দেখিতে গিয়াছিলাম। কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে অনেক ভদ্র-মহিলারাও মাহেশের জগন্নাথ দর্শনে গমন করিয়া থাকে, ইহা তুমি জ্ঞাত আছ। আমরা যে পথ ধরিয়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছি, সেই পথে কতকগুলি কুলকামিনী, অতি সঙ্কোচভাবে শির অবনত করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। সেই সময়ে একজন দুর্ব্বৃত্ত যুবক ঐ সকল কুলকামিনীগণের কখন বা অগ্রে গিয়া দাঁড়াইতেছে, কখন বা পশ্চাতে আসিয়া অশ্রাব্য গান করিতেছে, কখন বা নানা ছাঁদে বিদ্রূপ করিয়া করতালি দিয়া হাস্য করিতেছে। ঐ দুরাত্মা যুবকের অত্যাচারে সেই কয়েকটি ভদ্র-মহিলা ভয়ে জড়সড় হইয়া উঠিয়াছে; দৈব বশতঃ সেই সময়ে ঐ দুরাত্মা যুবকের কয়েকজন নিজ পরিবার সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা প্রথমতঃ তাহা বুঝিতে পারি নাই; তাহার পর যখন দেখিলাম যে, নবাগত কয়েকজন স্ত্রীলোককে সমাগত দেখিয়া, ঐ দুরাত্মা যুবক কিয়ৎপরিমাণে শান্তভাব অবলম্বন করিল এবং আমাদিগের প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়া শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "মা! তোমরা এখন ইহাদিগের সকলকে লইয়া বৃক্ষের ছায়ায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাক, আমি একবার দেখিয়া আসি, মন্দিরের ভিড় কমিয়াছে কি না। এই কথা শুনিবামাত্রই আমাদিগের সমভিব্যাহারী একজন ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ওহে

যুবক! তুমি কি সাহসে নিজ পরিবারগণকে এই বৃক্ষের ছায়ায় বসাইয়া রাখিয়া মন্দিরের গোল দেখিতে যাইতেছ? তুমি কি জান না যে, ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি ভদ্র-মহিলার প্রতি তুমি যেরূপ কুব্যবহার করিয়াছিলে, তোমার পরিবারগণের প্রতি আমরাও সেইরূপ করিব। আমাদিগের মধ্যে একজন সুরসিক ভট্টাচার্য্য আছেন, মস্তকে বস্ত্র বাঁধিয়া তিনি যদি তোমার পরিবারগণের সম্মুখে নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে, অবলা-কুলকামিনীগণকে কে রক্ষা করিবে? অতএব এক্ষণে তোমার যাওয়া হইতেছে না; কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া আমাদিগের রসিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নৃত্যটা দেখিয়া যাও। আমাদিগের এই কথা শুনিয়া যুবকের মুখ শুকাইয়া গেল। সে একক, আমরা দ্বাদশ জন; বিশেষতঃ সে পূর্ব্বে যে কয়েকটি ভদ্র-মহিলার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, তদ্দৃষ্টে অনেকেরই তাহার প্রতি উচিত দণ্ড দিবার অভিলাষ হইয়াছিল। কিন্তু উত্তরসাধক ব্যতিরেকে সহসা কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করে না। আমাদিগের এই নীতিগর্ভ বিদ্রূপের কথা শুনিয়া বহুসংখ্যক লোক আসিয়া আমাদিগের সহিত যোগ দিয়া কহিল, মহাশয়! আপনারা যাহা বলিতেছেন কার্য্যে তাহাই করুন, আমরা ঐ ছোঁড়ার কান ধরে এই স্থানে দাঁড়-করাইয়া রাখি, তাহলেই ওর উত্তম শিক্ষা হবে। সেই সময় দুই একজন বলবান্ যুবক কহিল, মিষ্ট কথার কার্য্য নহে, ভদ্র স্ত্রীলোকগণের প্রতি ও যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার উচিত সাজা প্রহার; ওর নিজ পরিবারগণের সম্মুখেই ঘা-কতক দিয়ে দেওয়াই

যুক্তিযুক্ত, তাহলে আর এমন কাজ কখনও করিবে না। চারিদিক হইতে এইরূপ গোলযোগ হওয়ায় দুরাত্মা যুবক ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল; করযোড়ে আমাদিগকে কহিল, মহাশয়েরা আমাকে মাপ করুন্; আমি না বুঝিতে পারিয়া একটা গর্হিত কার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য আমার যথেষ্ট সাজা হইয়াছে; আর এরূপ কার্য্য কস্মিন্ কালেও করিব না। দুরাত্মা যুবকের এইরূপ বিনয় বাক্য শুনিয়া আমরা তাহাকে অভয় দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। এইক্ষণে বুঝিতে পারিলে, সংসারে নীতির প্রয়োজন আছে কি না? যদি রাজপথের সকল যুবকেরই ঐ দুরাত্মার ন্যায় চরিত্র হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত ঐ কয়েকটি ভদ্র-মহিলার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। কিন্তু সংসারে নীতি আছে বলিয়াই কুলকামিনীর প্রতি অকারণ অত্যাচার দেখিয়া রাজপথের অধিকাংশ লোকেরই ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল; আর কিছু অধিক হইলে সেই কুনীতিপরায়ণ যুবকের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়া যাইত। আমাদের কয়েকটি নীতিগর্ভ উপদেশ দ্বারা সকল দিক রক্ষা হইয়া গেল; কথিত দুরাচার যুবকেরও জ্ঞানের উদ্রেক হইল। সে, যে উপদেশ ঠেকিয়া শিখিয়া গেল, সে উপদেশ আর জন্মাবচ্ছিন্নেও বিস্মৃত হইবে না।

নীতির প্রয়োজন আরও বিস্তারে লিখিতে গেলে, পাঠকগণের ধৈর্য্য থাকিবে না, এই জন্য উপরি-উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা শেষ করিলাম। এইক্ষণে নীতির প্রভাব বিষয়ে যাহা কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহাই বিবৃত করা যাইবে। ভুবনবিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি এক দিন আক্ষেপ করিয়া তাহার বন্ধু-

বর্গের নিকট বলিয়াছিলেন—"তোমরা আর আমাকে বীরবর বলিয়া সম্বোধন করিও না; বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে আমি বীরশব্দে বাচ্য হইতে পারি না। দেখ, শারলামেন্, মহাবীর আলেকজাণ্ডার ও আমি বাহুবলে এক একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছি; কিন্তু সূত্রধরপুত্র খ্রীষ্ট কেবল এক নীতির প্রভাবে আমাদিগের অপেক্ষা বহুবিস্তীর্ণ অধিকার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্ট বহুকাল ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এইক্ষণেও তাঁহার জন্য শত শত লোক প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে; কিন্তু শারলামেন্, আলেকজাণ্ডার ও আমার জন্য কেহই মরিতে চাহে না। আমি যখন পদাতিক ছিলাম, তখন এ সকল বিষয় বুঝিতে পারি নাই যে, ভুজবল অপেক্ষা নীতিবল অধিক কার্য্যকর। অনেক যুদ্ধ করিয়া ও আপন অধীনস্থ লক্ষ লক্ষ সেনানীর জীবনান্ত করাইয়া ইউরোপের কয়েকটি রাজাকে আয়ত্তাধীনে আনিয়াছিলাম; এক্ষণে আমি বন্দী হইয়াছি, আমার অধীনস্থ রাজগণও স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে আমা কর্ত্তৃক যে উৎপীড়িত হইয়াছিল, তজ্জন্য কোন কালেই তাহারা আমার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিবে না। এক নীতির প্রভাবে খ্রীষ্ট যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাজগণ অদ্যাপি উদ্দেশে তাঁহার পদে মস্তক অবনত করিতেছে। যতকাল সংসারে মনুষ্যের সঞ্চার থাকিবে, বোধ হয়, ততকাল নীতিপরায়ণ খ্রীষ্টের নাম লোপ হইবে না। আমি স্বার্থের জন্য না করিয়াছি এমত কার্য্যই নাই, এক দিবস কেবল আমার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শত

শত বীরপুরুষ সমরানলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। রাজ-গণকে হীনবল করিবার মানসে আমি সময়ে সময়ে কয়েকটি নগর একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছি। যে সময়ে আমার আদেশানুসারে সৈনিকগণ এক একটি নগরের চারি-দিকে অনল সংলগ্ন করিয়া দিত এবং কেহ নগরের বহির্ভাগে আসিতে না পারে, তজ্জন্য শত শত সৈনিক সেই সকল নগরের গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিত, নগরবাসিগণ কোন দিকে পলাইবার পথ না পাইয়া যখন চীৎকার শব্দে নভোমণ্ডল ভেদ করিত, তখন আমি সেই সকল হতভাগ্য-গণের কাতরোক্তি শ্রবণে, একপ্রকার বধির হইয়া থাকি-তাম। এরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম কেন? কেবল এক স্বার্থের জন্য। ইউরোপখণ্ডে একাধিপত্য স্থাপন করিব, এই আমার একমাত্র সঙ্কল্প ছিল। আমি সকলের প্রভু হইব, ইউরোপের রাজগণ আমার পদানত হইয়া থাকিবে, এই অভিলাষ পরিপূর্ণ করণের জন্য আমি ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মের দিকে এক দিনের জন্যও দৃষ্টি রাখি নাই; স্বেচ্ছাচারী হইয়া যখন যাহা ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তাহাই করিয়াছি। ইউরোপবাসীরা দিন কয়েক আমাকে সাক্ষাৎ কৃতান্ত বলিয়া বোধ করিত, আমার নাম শুনিলে হীনবীর্য্য রাজগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। সে দিন আমার আর নাই, আমি এক্ষণে বন্দী হইয়া হেলেনাদ্বীপে বাস করি-তেছি। আমাকে যাহারা ভাল বাসিত, তাহারা আমার জন্যই বহুকাল পূর্ব্বে সমরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। আমি কাহাকেও ভাল বাসিতাম না বলিয়া, এই দুরবস্থার সময়ে

আমাকে কেহ ভালবাসিতে চাহে না। আমি যেমন স্বার্থের দাস ছিলাম, সেইরূপ আর কতকগুলি লোক কেবল স্বার্থের জন্য আমার দাসত্ব করিতে আসিয়াছিল; এইক্ষণে আর আমি স্বার্থের দাস নহি, অদৃষ্টের অধীন হইয়া পড়িয়াছি; এই জন্য আর কেহ আমার দাসত্ব করিতে চাহে না। হে বন্ধুগণ! তোমরা আর কেহ আমার ন্যায় স্বার্থের দাস হইও না, স্বার্থত্যাগী হইয়া নীতির দাস হইয়া কার্য্য কর। দেখ, আমার ন্যায় খ্রীষ্টের অস্ত্র ছিল না, গোলাগুলি ছিল না, ও বহুসংখ্যক সৈন্য ও সেনাপতি ছিল না। অন্য কি কথা, তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন যে, শৃগালের বিশ্রাম করিবার বিবর আছে, পক্ষিগণ রজনীযোগে আপনাপন বাসায় যাইয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করে; কিন্তু মনুষ্যপুত্র কোথায় মস্তক রাখিবেন, তাহার স্থান অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই; এরূপ দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তি একক, কেবল এক নীতির প্রভাবেই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যদিও এক্ষণে ইহ জগতে আর নাই, তথাচ তাঁহার প্রজাপুঞ্জ প্রত্যহ দুই বার করিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করে। কেবল তাঁহার নাম লইয়া তাঁহার ভক্তেরা অদ্যাপি তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিতেছে। খ্রীষ্টের এমন কি গুণ ছিল যে, তিনি মৃত্যুর পরও রাজ্যচ্যুত হইলেন না? কেবল একমাত্র নীতি। সেই নীতির প্রভাবেই তিনি জগজ্জনের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন; তিনি যখন ক্রমে নিহত হইতেছেন, সে সময়েও তিনি নীতি বিস্মৃত হন নাই; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাতরস্বরে বলিয়াছিলেন, 'পিতঃ! যাহারা আমাকে ক্রসে হত্যা করিতেছে,

তাহাদিগের অপরাধ গ্রহণ করিও না; কারণ, তাহারা কি করিতেছে, তাহা তাহারা আপনারাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।' এই কথা শুনিয়া খ্রীষ্টের পরম শত্রুগণ, যাহারা ঐ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগেরও হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল, কাহারও কাহারও বা চক্ষে জল আসিল।"

তিনি যেরূপ নীতির প্রভাব দর্শাইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ আর কোথায় পাইব? তিনি মরিবার সময়েও গুটিকতক নীতিকথা কহিয়া শত্রুপক্ষেরও মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রভাব দেখিয়া কতকগুলি নীতিজ্ঞ লোক খ্রীষ্টপ্রেমে অঙ্গ ঢালিয়াছিল। সেই সকল শিষ্যেরা সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া খ্রীষ্টের গুণকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যদিও তৎকালের রাজগণ খ্রীষ্টশিষ্যগণের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন, যদিও তাঁহারা সর্ব্বদা, 'আর খ্রীষ্টের নাম মুখে লইও না, যদি রাজাজ্ঞা অবহেলা কর, তাহা হইলে, এইক্ষণেই শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিব,' খ্রীষ্টের শিষ্যগণের প্রতি এইরূপ তাড়না বাক্য কহিতেন, তথাপি সেই নীতিপথাবলম্বী খ্রীষ্টপ্রেমের প্রেমিকগণ কেহই তাহাতে ভয় করিত না। কথিত আছে, কোন সময়ে একজন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজপুরুষ খ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে একজনকে ধৃত করিয়া আনিয়া সদর্পে কহিলেন, তোমরা প্রতারক যীশুর নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নিরক্ষর লোকের প্রাণ ভুলাইতেছ কেন? তদুত্তরে নীতিপরায়ণ খ্রীষ্টশিষ্য কহিলেন, মহাশয়, রোমরাজ্যের আরম্ভাবধি কত কত লোক এবং সম্রাট্ রোমের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন;

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শত্রু কর্ত্তৃক গুপ্তাঘাতে বিনষ্ট হইয়াছেন; ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্‌গণের জন্য কি আপনারা একদিনও অনুতাপ করেন? রাজপুরুষ কহিলেন, যে সকল সম্রাট্ নীতিমান্ ছিলেন, তাঁহাদিগের জন্য অদ্যাপি প্রজারা অনুতাপ করিয়া থাকে। খ্রীষ্টের অনুচর কহিলেন, ইহ জগতে অনেক ধর্ম্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জন্য আমরা অনুতাপ করি না, কেবল খ্রীষ্টের জন্য করি, ইহাতে আপনার অবশ্যই বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, অবশ্য তাঁহার কোন মহৎ গুণ ছিল; নতুবা, নিরক্ষর ধীবরগণ তাঁহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে কেন? মহাশয়, খ্রীষ্টের গুণ যাহা চক্ষে দেখিয়াছি, তাঁহার সদুপদেশ যাহা কর্ণে শুনিয়াছি, সেই সত্য বিষয় সাধারণের নিকট প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? সত্য চিরকালই একভাবে থাকিবে, কোন কালেই তাহার বিনাশ হইবে না। যখন কাল-প্রভাবে সত্যের প্রভা কিয়ৎপরিমাণে মলিন হইয়া আইসে, সেই সময়ে স্বয়ং ঈশ্বর নরাকার ধরিয়া সেই সত্যের উদ্দীপন করিয়া থাকেন। আমরা সেই সত্যের দাস; আপনারা যত কেন উৎপীড়ন করুন না, সত্যের জয় অবশ্যই হইবে। খ্রীষ্টশিষ্যের এইরূপ দর্পের কথা শুনিয়া রাজপুরুষ আপনার কিঙ্করগণকে আদেশ করিলেন, এই প্রতারকের শিষ্যকে অগ্নিতে দগ্ধ কর। অনুচরেরা রাজপ্রতিনিধির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিচ্ছদে অনল সংলগ্ন করিয়া দিল। তিনি সেই অনলে দগ্ধ হইতে হইতে চীৎকার-শব্দে বলিতে লাগিলেন, নীতিবিশারদ খ্রীষ্টের উপদেশ-

গুলি কেহ বিস্মৃত হইও না, আমি মরিলাম বলিয়া ভয় করিও না, সত্যের অনুরোধে এক ব্যক্তির মৃত্যু দেখিলে সহস্র ব্যক্তির পক্ষে নীতির পথ পরিষ্কার হইবে। খ্রীষ্টের শিষ্য যে কথা বলিয়া মৃত হইলেন, সেই ভাবিবাক্যের ফল ফলিল;—যাহারা ঐ ভয়ানক কাণ্ড স্বচক্ষে দেখিল, তাহারা মনে মনে ভাবিতে আরম্ভ করিল, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এ ব্যক্তি যখন খ্রীষ্টের জন্য মরিতেও ভয় করিল না, মরিবার সময়েও খ্রীষ্টের সুনীতির দোহাই দিয়া মরিল, তখন অবশ্যই খ্রীষ্টচরিত্রে কিছু বিশেষ মহত্ত্ব আছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

যদি খ্রীষ্টের ঐ দ্বাদশ জন শিষ্য, সত্যের অনুরোধে স্বার্থ ত্যাগ না করিত, তাহা হইলে খ্রীষ্টের এতদূর প্রভাব কখনই বিস্তার হইত না। প্রারম্ভে দ্বাদশ জন মাত্রই প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিল। রোমরাজ্যের প্রায় সমস্ত লোকই তাহাদিগের প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিল। ঐ শিষ্যগণের যদি ভোগেচ্ছা ও ধনের লোভ থাকিত, তাহা হইলে তৎকালের লোকেরা অর্থের দ্বারা অনায়াসে ঐ নীতিপ্রচারকদিগকে বশ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের নাম লোপ করিয়া দিতে পারিত; কিন্তু খ্রীষ্টের শিষ্যগণ একমনে একধ্যানে সত্য ও নীতির অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়া, দিন দিন খ্রীষ্টনীতির প্রভাব বিস্তার হইল। সেই একজন মহাপুরুষের নীতির প্রভাবে ভারতবর্ষীয়গণ কতদূর উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা এক্ষণে যবনজাতির হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়া খ্রীষ্টান জাতির অধীন হইয়াছি। খ্রীষ্টানেরা

সাম্যনীতির দাস; সেই সাম্যনীতির প্রভাবেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত পাদ্রি সাহেবেরা এতদ্দেশে আসিয়া শত শত মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত করেন। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর লোক চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া এতদ্দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। পাদ্রি সাহেবদিগের কৃপাতেই এক কপর্দ্দকও ব্যয় না করিয়া বাঙ্গালার মধ্যশ্রেণীর যুবকবৃন্দ উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। পাদ্রি সাহেবদিগের প্রযত্নেই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালায় মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। যে সংবাদপত্রের প্রভাবে এক্ষণে আমরা ব্যবসায়ী ইংরাজজাতির উৎপীড়ন হইতে নিস্তার লাভ করি, যে সংবাদপত্রের প্রভাবে বাঙ্গালার কৃষীবল লোকেরা নীলকরের অত্যাচার হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছিল, যে সংবাদপত্রের দ্বারা আমরা সর্ব্বদা মনের ক্ষোভ রাজপ্রতিনিধির কর্ণগোচর করিতে পারি, এতদ্দেশে সেই সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তক সর্ব্বাগ্রে খ্রীষ্টের শিষ্যেরাই হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-নীতির আদর্শ লইয়া রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে বলিয়াই ইংরাজ রাজত্বের এত গৌরব। ইংরাজেরা খ্রীষ্টের নীতি অনুসরণ করেন; প্রজার সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির মানসে ভারতবর্ষে অবিরত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। এতদ্দেশীয়গণ পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল যবন-উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিল; কাজে ত নহেই, কথাতেও যবন-সম্রাটেরা হিন্দু মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিতেন না। এক্ষণে ইংরাজ-জাতির সাম্যনীতির প্রভাব পদে পদে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মহারাণীর ঘোষণা-

পত্রের প্রকৃত মর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের রাজপ্রতি-নিধি লর্ড রিপন্ কায়মনে যত্ন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়-গণের মঙ্গলের জন্য তিনি স্বজাতির তিরস্কার-ভাজন হইয়াছেন। ইংরাজেরা মিলিত হইয়া তাঁহাকে না বলিয়াছেন এমন কথাই নাই। তথাপি, তিনি অটলভাবে উভয়জাতিকে সমান করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ছিলেন। লর্ড রিপন্ খ্রীস্ট ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম রক্ষা করিবার চেষ্টা দেখিতেন। তিনি কি স্বজাতিকে ভাল বাসিতেন না? না ইংরাজ জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না? এ কথা কে বলিবে? তিনি স্ব-জাতিকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, কেবল কতকগুলি দুর্নীতিপরায়ণ ইংরাজ তাহার হৃদয়ের প্রকৃতভাব না বুঝিয়া, নীতিবিশারদ রাজপ্রতিনিধিকে ভর্ৎসনা করিত। তিনি যেমন নীতির বলে তাহাদিগের বিদ্রূপোক্তি অগ্রাহ্য করিয়া অটলভাবে ছিলেন, সেইরূপ একদিবস মহাপ্রাজ্ঞ লর্ড ক্যানিং বাহাদুরকে স্থিরভাবে স্বজাতির ভর্ৎসনা সহ্য করিতে দেখা গিয়াছে। আমাদিগের নিতান্ত বিশ্বাস আছে যে, নীতিমান্ রাজপ্রতিনিধি অবশ্যই একদিবস জগৎপূজ্য হইবেন। এক্ষণে যাহারা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে, তাহারাই আবার এক সময়ে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিবে। যে ব্যক্তি সাধারণের ভয়ে প্রকৃত নীতির পথ অবহেলা করে না, হীনবলের উপকারের জন্য সকলের কোপকটাক্ষে ভয় পায় না, তাহার সদ্‌গুণের পুরস্কার স্বয়ং ঈশ্বর করিয়া থাকেন। চিরকাল দেখিয়া আসা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি কায়মনোযত্নে নীতির প্রভাব বিস্তার করিতে যায়, জগৎশুদ্ধ লোক তাহার প্রতিকূলে

দাঁড়াইলেও সেই সকল নীতিপরায়ণ লোকের প্রভাব নষ্ট করিতে পারে না।

নীতি তিন প্রকার; রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি। এই ত্রিবিধ নীতির পরস্পর প্রায় সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সকল নীতির ভিত্তিতেই ধর্ম্মনীতির প্রয়োজন আছে। তাহা না থাকিলে নীতির প্রভাব বৃদ্ধি হয় না। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্মের মধ্যে অনেক কুনীতির সংস্রব আছে। রাজনীতির সহিত প্রকৃত নীতির সামঞ্জস্য কি প্রকারে হইতে পারে? রাজপুত্রগণ বাল্যকালাবধি শিক্ষকের নিকট সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই চারিটি বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া শিক্ষা করেন। রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, প্রতিযোগী রাজার সহিত যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রে সাম অর্থাৎ সামঞ্জস্যের চেষ্টা দেখিবে; তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, দান অর্থাৎ অর্থের দ্বারা প্রতিযোগী রাজার সৈন্য সামন্তকে বশ করিবার ব্যবস্থা করিবে; তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে সুহৃদ্ভেদ ঘটাইবে। যখন রাজনীতিজ্ঞেরা সুহৃদ্ভেদ ঘটাইবার চেষ্টা দেখেন, তখন তাঁহারা ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। ভেদ ঘটাইতে গিয়া রাজা এবং রাজ-পুরুষগণকে ঘোর পাতকীর ন্যায় কার্য্য করিতে হয়। সর্ব্ব-শেষে দণ্ড দিবার বা দ্বন্দ্ব করিবার নিয়ম আছে। বিশুদ্ধ নীতিশাস্ত্রের নিয়ম এই যে, সদাশয় সাধু ব্যক্তিরা কোন ক্রমেই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবেন না; যেহেতু দ্বন্দ্ব করিতে গেলে, রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, এই সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী

হইতে হয়। ক্রোধের আবির্ভাব ব্যতিরেকে কে কোথায় দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? যে ক্রোধ সর্ব্ব অনিষ্টের মূল, কলহে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বাগ্রে সেই ক্রোধের প্রয়োজন। উত্তরগোগৃহে বীরচূড়ামণি ধনঞ্জয় পিতামহ ভীষ্মদেবকে সমাগত দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে কহিয়াছিলেন, যথা—

"অর্জ্জুন বলেন দেব, ভদ্র আপনার,
কি হেতু এ মৎস্যদেশে হলে অগ্রসার?
বিরাটের গাভী নিতে বুঝি অভিপ্রায়,
হেন ছার কার্য্য কি তোমার শোভা পায়?
তথাপিও লোভ নাহি পার সম্বরিতে,
সসৈন্যেতে আসিয়াছ পরগাভী নিতে।"

তদুত্তরে ভীষ্মদেব কহিয়াছিলেন। আমি গাভীর জন্য আসি নাই, তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। যদি গাভী হরণ করিবার অভিপ্রায়ই থাকে, তাহাতেই বা দোষ কি?

"ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে বেদের বচন,
বাহুবলে শাসিবেক পররাজ্য-ধন।"

যে ভীষ্মদেব পরগাভী হরণ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়-নীতির দোহাই দিয়া ধনঞ্জয়কে বিচারে পরাস্ত করিলেন, তিনিই আবার শান্তিপর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিশুদ্ধ নীতি শিক্ষা দিবার সময়ে পরস্বহরণকে মহাপাপ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। তবেই রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সামঞ্জস্য থাকিতেছে না। মনু লিখিয়াছেন যে,—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ পুত্রদার-ধনৈরপি" ইত্যাদি। লোকে শত শত মিথ্যা কথা কহিয়া, উৎকোচ দিয়া, অন্য কি কথা, প্রয়োজন হইলে আপনার

সহধর্ম্মিণীকে দিয়াও আপনাকে রক্ষা করিবে। কেন না, আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলে স্ত্রীপুত্র পরিবার ও বিষয় বৈভব আদি পুনর্ব্বার হইবার সমূহ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আপনার নাশ হইলে ভবের খেলা একেবারে ফুরাইয়া যাইবে। স্ত্রী দিয়া জীবনরক্ষা করাকে প্রকৃত নীতিমান্ লোকেরা কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া ধরিয়াছেন। সক্রেটিস্ যখন কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তৎকালে তাহার ছাত্রেরা পুনঃপুনঃ তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল যে, মহাশয়, আপনার পলাইবার পথ আমরা অনেক কৌশলে প্রস্তুত করিয়াছি, আপনি অদ্য রজনীতে পলায়ন করুন, অকারণ জীবন উৎসর্গ করিবার প্রয়োজন কি? প্রাণ বাঁচাইতে পারিলে সংসারের অনেক উপকার কবিতে পারিবেন। তৎশ্রবণে নীতিবিশারদ সক্রেটিস্ কহিয়াছিলেন, আমি জীবন-রক্ষার জন্য তস্কর-বৃত্তি অবলম্বন করিব? কখনই না। সক্রোটস্ যদি ছাত্রগণের উপদেশানুসারে কারাগার হইতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে, কখনই তাহার নামের এত গৌরব হইত না।

যাঁহারা স্বদেশের হিতের জন্য স্বার্থত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহারা আপনার প্রাণকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করেন। যদি প্রাণরক্ষার জন্য ভীত হইতে হয়, তাহা হইলে কে সাহস করিয়া দুর্দ্দান্ত রাজার সম্মুখে বিশুদ্ধ নীতির কথা উত্থাপন করিত? যাঁহারা রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহারা কোন কালেই বিশুদ্ধ নীতির আদর্শ হইতে পারেন নাই। পুরাণাদি শাস্ত্রে অনেকানেক রাজার সদ্‌গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে কেহই

বিশুদ্ধ নীতি প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, রাজা যুধিষ্ঠির সত্যের জন্য প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনিই দ্রোণাচার্য্য-বধের উপক্রমে মন্ত্রিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পুনঃপুনঃ মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন। তবেই এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, সত্যের অনুরোধে তিনি রাজ্যলাভলালসা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যদি তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ অবহেলা করিয়া শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে সাহসের সহিত সত্য কথা কহিতেন, তবে তাহাকে উচ্চনীতির আদর্শ বলিয়া ধরিতাম। যদি কৃষ্ণ ক্রোধ করেন, পাছে রাজ্যলাভে ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়ে তিনি অনায়াসে গুরুর সম্মুখে পুনঃপুনঃ কপট বাক্য কহিলেন। এ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির অপেক্ষা সক্রেটিস্‌কে অধিক সম্মান করিতে হয়। তিনি একটি মাত্র মিথ্যা কথা কহিলে অনায়াসেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন।

জগতের মঙ্গলের জন্য যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, সদাশয় মহাত্মগণ হৃষ্টচিত্তে তাহা দান করিয়া থাকেন। যখন দৈত্যভয়ে ভীত হইয়া দেবতারা দধীচি মুনির শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, গুরো! আপনার কৃপা ব্যতিরেকে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা হইবার আর উপায়ান্তর নাই; যখন দেবরাজ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছেন, তখন দেবগণের আর কোন অংশেই নিস্তার নাই; আমাদিগকে এক্ষণে ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে; এক্ষণে আপনিই একমাত্র অসুর-বিনাশের উপায়। আপনি দেহত্যাগ করিলে আপনার অস্থিতে বিশ্বকর্ম্মা এক অমোঘ অস্ত্র প্রস্তুত

করিবেন, সেই অস্ত্রাঘাতে দেবারিস্টের অবশ্যই পতন হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। যদি দুর্নীতিপরায়ণ অসুরেরা স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতালে একাধিপত্য স্থাপন করে, তাহা হইলে ব্রহ্মার সৃষ্টি লোপ হইয়া যাইবে; ধর্ম্ম কর্ম্ম আর কিছুই থাকিবে না। দেবগণের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃপানিধান দধীচি তৎক্ষণাৎ আত্মপ্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যদি মহামুনি দধীচি, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই নীতি পালন করিতেন, তাহা হইলে দুর্নীতিপরায়ণ অসুরদিগের অত্যাচারে সংসার ছারখার হইত। একব্যক্তি জীবন উৎসর্গ করিলে যদি জগতের হিতসাধন হয়, উচ্চনীতি-পরায়ণ ব্যক্তিবৃন্দ সে বিষয়ে কুণ্ঠিত নহেন।

কুনীতি এবং সুনীতির সর্ব্বতোভাবে তারতম্য দেখান দুরূহ ব্যাপার। এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা অনেক কার্য্যে উচ্চনীতির পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু দুই একটি সাংসারিক বিষয়ে তাহাদিগকে ঘোর নারকী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, যদি জগৎ-শুদ্ধ লোক সুনীতিপরায়ণ হয়, তাহা হইলে আর ঈশ্বরের প্রতি ভয়-ভক্তির প্রয়োজন থাকে না। কারণ, কুনীতিপরায়ণ লোকের জন্য রাজদণ্ড, সামাজিক দণ্ড, এবং প্রাকৃতিক দণ্ড কিছুই ফলদায়ক হইতেছে না; কেবল এক ঈশ্বরকে ভয় করিয়া কুনীতিপরায়ণ লোকেরা কিয়ৎপরিমাণে কুকার্য্য হইতে বিরত থাকে। ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রস্তাবে ভয়-ভক্তি করিতে গেলে, বিশিষ্ট বিধানে সুনীতিপরায়ণ হইতে হয়। কেন না, আমরা যাহাকে ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া ধরি,

অর্থাৎ যে সকল কার্য্য করিলে জগদীশ্বর পরিতুষ্ট হইবেন মনে করি, তৎসমুদায়ই উচ্চনীতিতে পরিপূর্ণ। শাস্ত্রকারেরা ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য যে সকল কার্য্যের আদেশ করিয়া গিয়াছেন, কেবল এক নীতির অনুরোধে যদি আমরা সেই সকল কার্য্য করি, তাহা হইলে, স্বতন্ত্র ঈশ্বরারাধনার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। যিনি উচ্চনীতি পালন করেন, তিনিই ধার্ম্মিকশব্দবাচ্য হয়েন। কিন্তু স সারের কার্য্য-কলাপ এতদূর জটিল যে, সর্ব্বতোভাবে সুনীতি প্রতিপালন করা অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে সকল নরনারীর চরিত্র পাঠ করিলে আমাদিগের অশ্রুপাত হয়, তাঁহাদিগের চরিত্রেরও স্থানে স্থানে কুনীতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু নীতির এমনি প্রভাব যে, এক এক ব্যক্তি এক একটি সুনীতি প্রতিপালন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। দানধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল বলিয়া তৎ কালের সম্রাট্‌গণ অপেক্ষাও কর্ণকে জগতের লোক পূজা করিয়াছেন। যদিও কর্ণের ন্যায় দাতা পৃথিবীতে আর ছিল না, কিন্তু এক দানধর্ম্ম ব্যতিরেকে তাঁহার চরিত্রে অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার আশ্রয়দাতা ধৃতরাষ্ট্র অনেক সময়ে তাঁহাকে কুমন্ত্রী এবং কপটী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ধৈর্য্যগুণে যুধিষ্ঠির, প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম, স্বার্থত্যাগে বিদুর, প্রজারঞ্জন ও সরলতায় রামচন্দ্র, আত্মত্যাগে বিভীষণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ দুই একটি উচ্চনীতির পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়া জগৎ পূজ্য হইয়া গিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা উচ্চনীতির প্রভাব আর কি হইতে পারে? এক ব্যক্তি অত্যন্ত লম্পট, কিন্তু পরের

দুঃখ দেখিলে তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, পরদুঃখ নিবারণের সময় নিষ্কাম হইয়া দান করে; সেই দানশীলতা-নীতির প্রাখর্য্য বশতঃ তাহার লাম্পট্য দোষের প্রতি আর কেহই দৃষ্টি রাখে না। এইরূপ শত সহস্র লোককে দেখা যায় যে, তাঁহারা বহু-দোষসত্ত্বেও কেবল দুই একটি নীতির বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায় জগতে পূজ্য হইয়া গিয়াছেন। যদিও মনুজকুল সর্ব্বতোভাবে উচ্চনীতি প্রতিপালন করিতে পারে না, (কারণ সংসারীর পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব বলিয়াই ধরিতে হয়;) তথাচ যতদূর হইয়া উঠে, ততদূর নীতিপালন করাও উচিত; তাহা হইলে সংসারের এবং নিজের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে।

একজন ধনবান্ লোকের এরূপ বিশ্বাস যে, আলস্য, বাহাদুরী দেখান ও ভোগাভিলাষের আধিক্যেই লোকে কুনীতিপরায়ণ হয়। এরূপ বিশ্বাস ধনবান্ লোকের হওয়াই সম্ভব; কারণ অভাব যে সর্ব্ব অনিষ্টের মূলকারণ, ইহা তাঁহারা মনেও ভাবিতে পারেন না; যেহেতু বাল্যকালাবধি অভাব কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা একদিনের জন্যও অনুভব করেন নাই। যাহা হউক, ঐ ধনবান্ লোক যে কুনীতি-পরায়ণ হইবার ত্রিবিধ কারণ দর্শাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে না হউক অনেকাংশে সত্য। আলস্য যে কুনীতির পোষকতা করে, তাহাতে আর সংশয় কি? বাহাদুরী দেখা-ইতে গিয়াই লোকে আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ও অভিলষিত বাহাদুরী করিতে অক্ষম হইলেই মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও পরপীড়নের দ্বারা সেইটি সম্পাদন করিতে

যায়। কিন্তু বিলাস দুর্নীতির আকর। অভাব দুই প্রকার, প্রাকৃতিক অভাব ও বিলাস-চরিতার্থতার জন্য ধনাভাব। যাহারা দরিদ্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের অভাব অতি সঙ্কীর্ণ, কিন্তু যাঁহারা উচ্চ বিলাসভোগ করিয়াছেন; তাহাদিগের অভাব সংসারের ঘোর অনিষ্টকারক। দরিদ্র-সন্তানেরা যদি অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে অনেকাংশে অভাবের পূরণ হইল বলিয়া তাহারা পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকে। কিন্তু ধনিসন্তানগণ যদি নির্ধন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় বিলাসভোগ করিবার জন্য পদে পদে নীতিবহির্ভূত কার্য্য করিয়া থাকেন। ধনের অভাব ঘটে না বলিয়া ধনীরা কেহ কখন সিঁধেল বা চোর হন না; কিন্তু আলস্য, বাহাদুরী ও ভোগাভিলাষ বশতঃ নির্ধনের সন্তান অধিক পরিমাণে কুনীতির বশবর্ত্তী হয় না। আলস্য-পরতন্ত্র হইলে যে সকল দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, যাহারা রাজসেবা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের সেরূপ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ধনবল ও শারীরিক বলে বলীয়ান্ লোকেরাই বাহাদুরী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যাহাদিগের এই দুয়েরই অভাব, তাহারা বাহাদুরীজনিত কোন দোষে লিপ্ত হয় না। যাহাদিগের আয় স্বল্প, তাহারা চেষ্টা করিয়া অভাব সঙ্কোচ করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং তাহারা হঠাৎ বিলাসে লিপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু নির্ধন লোকের আর একটি ভয়ানক অভাব আছে। দরিদ্র বা অকুলীনের হঠাৎ দার-পরিগ্রহ ঘটিয়া উঠে না, সেই জন্য তাহারা ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইয়া কখন কখন ঘোর নারকীর ন্যায় কার্য্য

করিয়া থাকে। মদনবিকার নরনারীর হৃদয়ে সর্ব্বদা জ্বলিতেছে, স্নুতরাং পতি-পত্নী-বিহীন নরনারীগণের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া নিতান্ত সম্ভব বলিয়া ধরিতে হয়। অনেক স্থলে কেবল উদরান্নের অভাবেই কত শত কুলকামিনী ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। সেইরূপ অনেক পুরুষও আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য উপায় করিতে না পারিয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। যদিও সংসারের এইরূপ অবস্থা, তথাচ স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে আমরা স্নুনীতির অসীম প্রভাব দেখিতে পাই। প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানী ও অহল্যা বাই বিপুল বিভবের অধীশ্বরী হইয়াও অতি অল্পকালে স্বামিধনে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পাশববৃত্তি চরিতার্থ করাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারা নারীজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেইরূপ শত শত পুরুষ চিরকাল অবিবাহিতাবস্থায় অতি সম্মানের সহিত কালহরণ করিয়া ভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণেও অনেক ভদ্রমহিলা অল্পকালে বিধবা হইয়া সাক্ষাৎ সাবিত্রীর ন্যায় কালহরণ করিতেছেন, সম্মুখে দাঁড়াইলে তাঁহাদিগের তেজঃপুঞ্জপ্রভাব দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়। এক্ষণেও যদি কোন ব্যক্তি সংসারের ইষ্টকর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করেন, তিনি জগতের পূজ্য হন, এতদ্বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কতকগুলি ব্যক্তি উচ্চনীতির আদর্শ হইবার মানসে সাংসারিক স্নুখে লিপ্ত না হইয়া নির্জ্জনে ইষ্ট আরাধনায় জীবন যাপন করেন, এরূপ লোকের দ্বারা সংসারের ইষ্ট বা

অনিষ্ট নাই। যিনি কাহারও অনিষ্ট করেন না, তিনি আপনার উচিত কার্য্যই করিয়া থাকেন, তজ্জন্য সাধারণের প্রশংসাভাজন হইতে পারেন না, কেন না, তিনি নির্জ্জনে বসিয়া কায়মনে যে কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তদ্দারা তাঁহারই ভাবী মঙ্গলের পথ পরিষ্কার করিতেছেন, সাধারণের তাহাতে কি উপকার হইতে পারে? একপ্রকার ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান নাই, কিন্তু পরোপকার করিবার সময় তাঁহাদিগের ন্যায় উদারতার পরিচয় আর কেহই দিতে পারেন না; সেই গুণে তাঁহাদিগের প্রতিবাসীরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের অন্যান্য দোষের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। যিনি জন্মাবচ্ছিন্নে কোন গর্হিত পাপে লিপ্ত হন নাই, কেবল আপনি সাবধান হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, প্রতিবেশীর ভাল মন্দ কিছুতেই থাকেন না, তিনি সাধারণের নিকট প্রশংসা লাভ করিতে পারেন না। সাধারণের উপকারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে অগ্রে স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়। যাঁহার হৃদয়ে উচ্চনীতি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তিনি কখনই প্রকৃত প্রস্তাবে পরোপকারী হইতে পারেন না। উপকার কেবল ধনের দ্বারা হয় এরূপ নহে; যদি কেহ দুর্নীতিপরায়ণ লোকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া সুনীতি শিক্ষা দেন, তিনিই যথার্থ পরোপকারী; পরের দুঃখে যাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, তিনিই যথার্থ পরোপকারী। ইহ সংসারে যে সকল লোক সুনীতির পরিচয় দিয়া সজ্জনবৃন্দের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় নিঃস্ব ছিলেন। ধন অপেক্ষা সুশিক্ষাদানে সাধারণের অধিক উপকার সাধন করিতে পারা যায়। ইহ সংসারে যখন

এক একটি ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহার শান্তি ধনের দ্বারা হয় নাই, কেবল উচ্চনীতির দ্বারাই হইয়াছে। অতএব আদি, মধ্য এবং অন্ত কালে নীতির প্রভাব সমভাবেই কার্য্য করিতেছে ও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। নীতির প্রভাব দেখিয়া আমরা যদি সুনীতির অনুসরণ করি, তবেই ইহ সংসারে সকল অবস্থায় স্বচ্ছন্দরূপে সুখী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

নীতিশব্দের বহু অর্থ আছে, যথা—ন্যায্য ব্যবহার অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ কার্য্য করা, সদাচার, নিয়ম, উপদেশ ইত্যাদি। নীতি বহুপ্রকার; যথা—ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাংসারিক নীতি ইত্যাদি। এই সমস্ত নীতির মধ্যে ধর্ম্মনীতির সহিত অন্য সমস্ত নীতির সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে গেলে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয় যে, ধর্ম্মনীতির সহিত রাজনীতি, সমাজনীতি ও অন্যান্য নীতির সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করিতে পারা যায় না। কোন কোন স্থলে রাজনীতির সম্মান রক্ষা করিতে গেলে ধর্ম্মনীতির সম্মান রক্ষা হয় না। আবার ধর্ম্মনীতির সম্মান রক্ষা করিতে গেলে রাজনীতির ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারা যায় না। রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতির কতদূর বিপর্য্যয়, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে রাজাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়; রাজার চরিত্র যত কেন দূষিত হউক না, রাজার প্রতি কোপদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিলে প্রজাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়।

পক্ষান্তরে রাজা, প্রজার ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিবেন। প্রজারঞ্জন করাই রাজনীতির প্রধান অঙ্গ। সেই রাজনীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই মহারাজ রামচন্দ্র সীতা হেন গুণবতী ভার্য্যাকে নিরপরাধা জানিয়াও পূর্ণগর্ব্ভাবস্থায় সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এস্থলে তিনি ধর্ম্মনীতির সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। যদিও প্রজারঞ্জন করা রাজনীতির প্রধান অঙ্গ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু কোন্ ধর্ম্মনীতিতে আছে যে, একজন পতিপ্রাণা সাধ্বী সতীকে নিরপরাধা জানিয়াও লোককলঙ্কভয়ে গর্ব্ভাবস্থায় পরিত্যাগ করিবে? ধর্ম্মনীতি অনুসারে আত্মপরিবারকে প্রাণপণে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, রামচন্দ্র ইহাও বিশিষ্ট বিধানে অবগত ছিলেন। যশের জন্য প্রজারঞ্জন করিতে হয়, ধর্ম্মের জন্য স্ত্রীপুত্রপরিবার প্রতিপালন করিতে হয়; তথাপি, রামচন্দ্র কেবল এক যশের জন্য ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলেন। সীতার নির্ব্বাসন-কাহিনী রামায়ণে পাঠ করিবার সময় নিতান্ত মূঢ় ব্যক্তিরও হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে। রাজমহিষী সীতা যখন নিবিড় অরণ্যমধ্যে অনাথার ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, সেই ভাবটি আমরা মনোমধ্যে চিন্তা করিলে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। সীতা কিয়ৎক্ষণ রোদন করিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, যখন রামচন্দ্র আমাকে ত্যাগ করিলেন, তখন আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করাই যুক্তি; আবার ভাবিলেন, আমার গর্ব্ভে সন্তান রহিয়াছে; গর্ব্ভাবস্থায় আমি যদি আত্মপ্রাণ

বিসর্জ্জন করি, তাহা হইলে অনন্ত নরকভোগ করিতে হইবে। সেই ভয়ানক দুরবস্থায় পতিত হইয়াও রামচন্দ্র-সঙ্গিনী ধর্ম্মনীতির মর্ম্ম বিস্মৃত হয়েন নাই, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ রাজা রামচন্দ্র একজন দূতের মুখে সীতার কলঙ্ক-কীর্ত্তন শুনিয়া একেবারে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইলেন। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সামঞ্জস্য না রাখিয়া রাজনীতির অনুরোধে ধর্ম্মনীতির অবমাননা করিলেন। সীতাবর্জ্জন অপেক্ষা লক্ষ্মণবর্জ্জন আরও ভয়ানক; কেবল প্রতিজ্ঞা-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতাকে অনায়াসে বর্জ্জন করিলেন। লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করায় এইটি প্রতিপন্ন হইল যে, রামচন্দ্র কেবল এক রাজনীতি-প্রতিপালনেই যত্নবান্ ছিলেন; কোন কার্য্যেই ধর্ম্মনীতির নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। নিরপরাধ বালি রাজাকে চোরাবাণে হত্যা করায়, তিনি ধর্ম্মনীতির মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। সুগ্রীব তাঁহার উপকার করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, এই জন্য তিনি আত্মকার্য্য উদ্ধার করিবার মানসে অনায়াসে অকৃতাপরাধ একজন রাজার প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। অকারণ একটা সামান্য জীবজন্তুর প্রাণনাশ করিতে ধর্ম্মনীতিতে নিষেধ আছে; "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম" বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা স্থির করিয়াছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যে রামচন্দ্রের যশঃ-কুসুমের সৌরভ অদ্যাপি দেশকে আমোদিত করিতেছে, তিনিই কোন বিষয়ে রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারেন নাই। রামচন্দ্রের প্রিয় অমাত্য ও প্রিয় সুহৃদ্ বিভীষণ ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য বলিয়া

প্রসিদ্ধ; তিনি ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ঋষির ন্যায় তাহার আচার ব্যবহার ছিল। সেই ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করিতে পারেন নাই। দ্বাপরযুগের পরিশিষ্টাংশে লোকে মহাত্মা ভীষ্মকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও পরমধার্ম্মিক বলিয়া সম্মান করিত, কিন্তু কার্য্যকালে তিনিও রাজনীতির ও ধর্ম্মনীতির সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তারা পদে পদে বলিয়া গিয়াছেন যে, সজ্জন ব্যক্তিরা অসতের সহিত সংস্রব রাখেন না। যে স্থানে দুর্জ্জন বাস করে, সজ্জনের পক্ষে সে স্থান একেবারে পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত; কেন না, অসতের আশ্রয়ে থাকিলে, মহতের মহত্ত্ব নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ধার্ম্মিক ভীষ্মদেবের তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি দুর্য্যোধনের দুর্জ্জনতার পরিচয় পদে পদে প্রাপ্ত হইয়াও, তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। কৌরব সভায় যখন দুরাত্মা দুঃশাসন পাঞ্চালীর অবমাননা করিতে লাগিল, সেই সময় কৃষ্ণা দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া কহিয়াছিলেন "সভাস্থ গুরুজনেরা আমাকে এই নরাধমের হস্ত হইতে রক্ষা করুন, আমি রাজমহিষী, কুলকামিনী, পতিপরায়ণা, আমাকে ভারতকুলকণ্টক দুঃশাসন এই সজ্জনসভায় উলঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেছে। হে জাহ্নবীনন্দন! তুমিই এই কুরুকুলের ভিত্তিস্বরূপ, তুমি আমাকে এই শার্দ্দূলের হস্ত হইতে রক্ষা কর, আমি দুঃশাসনের কেশাকর্ষণ আর সহ্য করিতে পারি না।" এইরূপে পাঞ্চালী পুনঃপুনঃ ভীষ্মদেবের সাহায্য

প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেই অবলা কুলকামিনীর কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া নতশিরে সভামণ্ডপে বসিয়া ছিলেন। নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রমণীকুল বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রাণ বা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য পুরুষের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, সেই স্ত্রীর উদ্ধারসাধনের জন্য পুরুষের প্রাণপর্য্যন্ত পণ করা যুক্তি। কিন্তু পুরুষসিংহ ভীষ্মদেব তাহা করিতে পারেন নাই। তবেই এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে, কেবল এক রাজনীতির অনুরোধে ধর্ম্মনীতির দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাজনীতির ও ধর্ম্ম-নীতির কতদূর সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিয়াছিলেন। রাজা যুধি-ষ্ঠির প্রথমে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় ভীমসেন আক্ষেপ করিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরকে কহিয়াছিলেন, মহারাজ! আপনি রাজা হইয়া রাজধর্ম্ম প্রতি-পালন করিতে পারিলেন না। যে রাজা ক্ষমতাসত্ত্বে শত্রু কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকেন, তিনি রাজ-পদের যোগ্যপাত্র নহেন; এরূপ ব্যক্তির প্রথম হইতেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত ছিল; আপনি কেবল এক ধর্ম্মনীতির অনুরোধে রাজনীতির মূলে কুঠারা-ঘাত করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছেন, শত্রুদলনের জন্য কিছুই উদ্যোগ করিতেছেন না। মহারাজ, রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতির সংস্রব নাই। আপনি যেরূপ ধর্ম্মনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, রাজার পক্ষে তাহা সর্ব্বতোভাবে অহিত-কর। রাজ্যরক্ষার জন্য ও স্বরাজ্য-বিস্তারের জন্য রাজারা

সময়ে সময়ে ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আপনার অভীষ্ট সাধন করিয়া অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে সেই পাপের ক্ষালন করেন। আপনি এক ধর্ম্মের অনুরোধে দুর্ব্বল শত্রুকে অনায়াসে ক্ষমা করিয়া বসিয়া আছেন। মহারাজ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণের পক্ষে এক ধর্ম্মনীতিই মাননীয়, ব্রাহ্মণেরাই ক্ষমাপরবশ হইবে; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সে ব্যবস্থা নহে। শত্রুকে ক্ষমা করিলে, ক্ষত্রিয়, রাজনীতিমতে কাপুরুষমধ্যে গণ্য হয়। মহারাজ! আমাদিগের প্রাচীন সচিব কণিক্‌কে আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন, মহাত্মা ভীষ্মদেবও কখন কখন কণিকের মন্ত্রণানুসারে কার্য্য করিতেন। কিন্তু সেই কণিক্ আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে কিরূপ মন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

আপনি যখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, ধনঞ্জয় ও আমি দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম এবং মাদ্রীপুত্রদ্বয় রাজসভায় প্রধান সচিব হইয়া উঠিলেন, তখন আমাদিগের কার্য্যকলাপ দর্শনে হস্তিনার প্রজাপুঞ্জ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। আপনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, প্রজাগণের ইহা নিতান্ত বাসনা হইয়াছিল। অন্ধরাজ তাঁহার গুপ্তচরের মুখে আমাদিগের বলবীর্য্যের, আপনার সাবধানতার ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়ের রাজকার্য্যে পারদর্শিতার কথা শ্রবণ করিয়া ছন্নমতি হইলেন। আমাদিগের সুখ্যাতির কথা জ্যেষ্ঠতাতের হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল; কিসে আমরা সমূলে বিনষ্ট হই, জ্যেষ্ঠতাত তাহারই চেষ্টা

দেখিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রধান অমাত্য কণিক্‌কে বিপুল অর্থদানে আত্মবশে লইলেন। কণিক্ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বিশ্বাসপাত্র হইলে পর, এক দিবস, তিনি মন্ত্রিপ্রবর কণিক্‌কে নিভৃত স্থানে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কণিক্! আমাকে তুমি সদুপদেশ প্রদান কর। আমি যেরূপ গতিক দেখিতেছি, ভবিষ্যতে আমার পুত্রগণ কৌরবরাজ্যের এক কণাও প্রাপ্ত হইবে না। আমার জ্যেষ্ঠ-পুত্র দুর্য্যোধন কোন সূত্রে যদি হস্তিনার রাজা হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর। কণিক্ কহিলেন, মহারাজ—

"————————শুন রাজনীত।
পূর্ব্বাপর আছে ইহা শাস্ত্রীয় বিহিত॥
আত্মচ্ছিদ্র লুকাইয়া পরম যতনে।
পরচ্ছিদ্র পাইলে ধরিবে ততক্ষণে॥
সময় বুঝিয়া রাজা করিবেন কর্ম্ম।
ক্ষণে গুপ্ত ক্ষণে ব্যাপ্ত যেন যায় কূর্ম্ম॥
দুর্ব্বল দেখিলে শত্রু দয়া নাহি করি।
শরণ লইলে তবু না রাখিব বৈরী॥
বালক হইলে শত্রু না করিবে ত্রাণ।
ব্যাধি, অগ্নি, রিপু, জল একই সমান॥
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি করিবে বিনয়।
অপমান আদি ক্লেশ সবে সমুদয়॥
সদাই থাকিবে তারে স্কন্ধেতে করিয়া।
সময় পাইলে মার ভূমে আছাড়িয়া॥
বলে ছলে মার শত্রু ইথে নাহি পাপ।"

মহারাজ! কণিকের রাজনীতির কথাগুলির ভাবার্থ বুঝিয়া দেখুন, সে যাহা বলিয়াছিল, ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের প্রতি তাহাই করিয়াছে। কপটে আমাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করায় যদি অন্ধরাজের পাপ না হইয়া থাকে, তবে প্রকাশ্য-ভাবে শত্রুদলনে আমাদিগের দুরদৃষ্টের সম্ভাবনা কি? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভাই! তুমি যে সকল কথা বলিলে, তাহা সমুদয় সত্য; যেখানে রাজনীতির চালনা, সেখানে ধর্ম্ম-নীতির সম্যক্ স্থান হইতে পারে না। কিন্তু ভাই! "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এই মহাবাক্যের প্রতি কি তোমার বিশ্বাস নাই! ধর্ম্মনীতির মস্তকে মুদ্গরাঘাত করিয়া কেবল এক রাজনীতির বিধানানুসারে অনেকেই আপনাপন রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে রাজ্য তাহারা দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারেন নাই। জরাসন্ধ, শিশুপাল এবং কংসাসুরই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। যে সকল ভূতপূর্ব্ব রাজগণ ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করিতেন, তাঁহারা ইহ-কালে যশোলাভ ও চরমে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। নিষধাধি-পতি নল, সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ শান্তনু তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভাই! অলীক রাজ্যের জন্য আমি ধর্ম্মনীতির অবমাননা করিতে পারিব না। জ্যেষ্ঠের এইরূপ অর্থপরিপূরিত কথা শুনিয়া ভীমসেন আর কিছুই বলিলেন না।

রাজনীতির বিধানানুসারে সম্মুখ সংগ্রামে গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতিতে পাতক নাই। কিন্তু ধর্ম্ম-নীতিতে বলিতেছে, গুরুজনের প্রতি মনে মনে বিরক্ত

হইলেও পাপগ্রস্ত হইতে হয়। ব্রহ্মহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যাহাতে প্রজাগণের ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা হয়, রাজা আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াও তাহাতে যত্নবান্ হইবেন। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে কেবল আপনার জেদ বজায় রাখিবার জন্যও সম্মুখসমরে অসংখ্য প্রজাকে বিনষ্ট করায় রাজার পাপস্পর্শ হয় না। বলপূর্ব্বক পররাজ্য কাড়িয়া লইলে রাজার পাপ নাই। কিন্তু ধর্ম্মনীতি পদে পদে ঐ সকল কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছে। ভীম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে যদিও ধর্ম্মপুত্র ভীমসেনকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধকালে তিনিই আবার মিথ্যা কথা বলিয়া শিক্ষাগুরুর বধসাধন করাইলেন। তবেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেই ধর্ম্মনীতির দিকে সম্যক্ দৃষ্টি রাখিতে কেহই পারেন না।

সংসারের ভাব দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হয় যে, একপ্রকার নীতি সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে কখনই খাটিতে পারে না। যিনি যে অবস্থার লোক, তিনি সেইরূপ কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এ কথার উপর কেহই কথা কহিতে পারেন না। সেই মহাবাক্যেব প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোন্ কালে প্রাতঃস্মরণীয় রাজগণ মৃগয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ও অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন! যে সময় শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া ছদ্মবেশে ও গুপ্তপথে জরাসন্ধের বধসাধন-মানসে তাঁহার রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, জরাসন্ধ তাঁহাদের ভাবভক্তি দেখিয়া ছদ্মবেশী শত্রুজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,

তোমাদিগের অবয়ব ও পরিচ্ছদ দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার কোন ক্রমেই বিশ্বাস হইতেছে না। তোমরা চৌর-রূপে কোন গুপ্তপথে আমার রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছ। দেখ, আমি কোন কালে তোমাদিগের অপকার করি নাই। তোমাদিগের যদি কু-অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে, এই দুই পঙ্‌ক্তি কবিতা পাঠ করিতে করিতে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর।

"অহিংসক জনেরে যে জন হিংসা করে,
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে।"

এই কথা শুনিয়া মহাত্মা বাসুদেব উপহাসের সহিত জরাসন্ধকে কহিলেন, "মহারাজ! মানুষে আপনার দোষ দেখিতে পায় না কেন, আপনি এ কথার মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন? হিংসায় পাপ নাই, এ কথা আমার শিরোধার্য্য। এই জন্যই আজন্মকাল ঐ মহাবাক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি কার্য্য করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আপনি কি সাহসে সে কথাটি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন! আপনি যদি সেই পরমধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে, এক লক্ষ রাজাকে ভুজবলে বাঁধিয়া আনিয়া পশুর ন্যায় পশুশালায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন না ও আপনার পূজিত পশুপতির নিকট বলিদান দিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া বসিতেন না। মহারাজ! যে সকল রাজাকে কারা-রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা কোন কালে আপনার কোন অপরাধ করে নাই; সেই নিরীহ দুর্ব্বল ভূপতিগণকে কি অপরাধে আপনি বলিদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন?

ইতিপূর্ব্বে আপনি আমাকে যে কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, আমি আবার সেই কথাই আপনাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। যে ব্যক্তি হিংসাশূন্য হইয়া সংসারে বিচরণ করে, কোন কালে কেহ তাহার শত্রু হয় না। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।" সেই ধর্ম্ম আপনি পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, জগৎ শুদ্ধ লোক আপনার শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। যে রাজগণকে আপনি কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি। হয়, অহিংসারূপ পরমধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করুন, নতুবা আমার হস্তে কিম্বা এই দুই জন মহাবীরের হস্তে অবশ্যই মরিতে হইবে। তুমি প্রকৃত নরঘাতক হইয়া আর অধিককাল রাজ্যভোগ করিতে পাইবে না। হিংসার ন্যায় পাপ নাই, এ কথা আপনিই পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এক্ষণে সেই পাপের ফল-ভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

"দয়ার বাড়া ধর্ম্ম নাই ও হিংসার বাড়া পাপ নাই।" এই মহাবাক্য দুইটা প্রায় সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু ইহার মতে আবার কার্য্য করিতে হয়, ইহা কেহই স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখেন না। কোন সময়ে একটি লোক রবিবার দিবস কতকগুলি ছিপ হস্তে মৎস্য ধরিবার মানসে গমন করিতে-ছিলেন। এক ব্যক্তি কহিল, "ওহে! অকারণ জীবহিংসা করিও না; জান না, নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে, অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।" তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন, ও বচন সক করিয়া মাছ ধরার পক্ষে খাটে না; দুইটা মাছ ধরিয়া আনিয়া খাইলে বুঝি আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবে? এই কথা বলিয়া

তিনি মৎস্য ধরিতে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার এক পক্ষ পরে শুনা গেল যে, তিনি জ্বরবিকার রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। হঠাৎ এরূপ পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন যে, দাদা আধ ক্রোশ পথ মেঠো জল ভাঙ্গিয়া একটা বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে বসিয়াছিলেন, তাহার উপর আবার সমস্ত দিবস বৃষ্টি হইয়া ছিল; এই বাধা দাদা মহাশয় ভ্রূক্ষেপও করেন নাই; সন্ধ্যার সময় তিন চারিটা বড় বড় মাছ লইয়া বাটী আসিলেন সত্য, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, সে মাছ আর তাহাকে খাইতে হয় নাই; বাটী আসিয়াই শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন; মাছ ধরার অনুরোধে জলে ভিজা ও জল ভাঙ্গাতেই তাহার অকাল মৃত্যু হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তটি লোকের বড় হৃদয়গ্রাহী হইবে না, তাঁহারা হাস্য করিয়া কহিবেন, চিরকালটা বর্ষাকালে মাছ ধরিয়া আসিতেছি, কিন্তু কই এখনও ত মরি নাই। এতদূর অহিংসা-পরম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করার প্রয়োজন দেখি না। তদুত্তরে আমি এই কথা বলিতে পারি যে, আমাদিগের দেশের লোক নীতির অবমাননা করিয়া প্রত্যক্ষ তাহার ফল-ভাগী হইয়াও যখন তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তখন কিঞ্চিৎ বিলম্বে পাপের ফলভাগী হইলে তাঁহারা ত অবশ্যই হাস্য করিবেন। "সুরাপান করিও না, তাহাতে ইহকাল পরকাল নষ্ট করে।" মাতালেরা সে নীতির মস্তকে মুদ্গারা-ঘাত করিয়া রজনীতে মদ্যপান করিলেন, রাজপথে আসিয়া পড়িলেন, ঝোলায় চড়িয়া পুলীসে যাইলেন ও দণ্ড দিয়া বাটী আসিলেন, এত লাঞ্ছনাতেও আবার সেই দিনই রাত্রি-

কালে হাস্যবদনে বন্ধুগণের সহিত সুরাপান করিতে বসি-লেন। যাঁহারা এতদূর নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট নীতিকথা, কথামাত্র বই আর কি হইতে পারে!

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বহুদর্শী পণ্ডিতগণ অনেক বিবেচনা করিয়া যে সকল উপ-দেশ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কথামাত্র জ্ঞান না করিয়া যদি আমরা তদনুরূপ কার্য্য করি, তাহা হইলে আমা-দিগকে সর্ব্বদা দুরদৃষ্টভাগী হইতে হয় না। সন্তানপ্রতিপালন-সম্বন্ধে চাণক্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশ-বর্ষাণি তাড়য়েৎ প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।" এই দূরদর্শী পণ্ডিত কতদূর বিবেচনা করিয়া এ কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; এ কয়েকটি কথার কি কোন কালে কোন দেশে তাৎপর্য্যের অন্যথা হইবে? সন্তানলালন-পালনসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর আর কোন কথারই প্রয়োজন নাই। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্তই সন্তানকে কেবল আদর করিয়া রাখিতে পারা যায়। তৎকালে তাহাদিগের সমস্ত আবদার সহ্য করিতে পারা যায়। শিশুর মিষ্ট কথা শুনিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। পাঁচ বৎ-সরের পুত্র কি কন্যার প্রতি কোন কঠোর নিয়মই খাটিতে পারে না, গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় না, তাহাদিগের শরীরে তৎকালে পাপস্পর্শ হয় না। কেন হয় না? পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর হৃদয় পরিশুদ্ধ, সে হৃদয় সর-লতায় পরিপূর্ণ, দ্বেষ-হিংসা-শূন্য, তাহার শত্রুমিত্র সমান জ্ঞান;

এই জন্যই পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর প্রতি পণ্ডিতেরা কোন প্রকার দণ্ডবিধান করিয়া যান নাই। কিন্তু ষষ্ঠবর্ষে তাহারা বিদ্যা-শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, সংসারের অনেক অজ্ঞাত বিষয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হয়, কিয়ৎ পরিমাণে ভাল মন্দ বুঝিতে পারে, এই জন্য সে সময়ে পিতামাতাকে সর্ব্বদা সন্তানসন্ততির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়, কোনরূপ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সে সময়ে সন্তানসন্ততিকে তাড়না করা উচিত। নিতান্ত অবাধ্য হইলে প্রহার পর্য্যন্ত করা বিধেয়। সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয় বালক বালিকার মন একটি কর্দ্দমের পিণ্ডের মত। তৎকালে সেই নরম দ্রব্যে যাহা গঠন করিবে, তাহাই হইবে। পাঁচবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গঠন করিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। একটা মোটা কথায় বলিয়া থাকে, "কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাক্‌লে করে ট্যাঁস্ ট্যাঁস্।" কাঁচা বাঁশকে যে দিকে নোয়াইবে সেই দিকেই নত হইয়া থাকিবে, কিন্তু পরিপক্ক হইয়া উঠিলে আর কাহার সাধ্য তাহাকে নত করিয়া রাখে। বলপ্রয়োগ করিতে গেলে দুই খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে তথাচ নত হইবে না। বালকবালিকাগণও সেইরূপ; দশবৎসর পর্য্যন্ত তাড়না সহ্য করে ও সেই সময়ে যদি তাহাদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া যায়, সজ্জনের সহিত সহবাসজনিত সভ্যতা ভব্যতা শিক্ষা করে, তবেই মঙ্গল, নতুবা যৌবনসীমায় আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে, আর তাড়না দ্বারা তাহাকে শিক্ষা দিবার সময় থাকে না। প্রথম অবস্থা ছাড়িয়া দিয়া যদি যৌবনকালে পিতা মাতা আপনার সন্তানগণকে শিক্ষা দিতে চেষ্টিত হন ও সর্ব্বদা তাড়না

করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালের কথা দূরে থাকুক, বর্ত্তমান কালের ষোড়শবর্ষীর যুবকদিগকে দেখিলে আমাদিগেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সে সময়ে পিতা যদি পুত্রের সহিত বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করেন, অর্থাৎ উপযুক্ত পুত্র কোন গর্হিতাচরণ করিলে তিনি সদ্‌বন্ধুর ন্যায় মিস্ট কথায় তাঁহাকে উপদেশ দেন, তবেই মঙ্গল, নতুবা এইক্ষণকার পুত্রগণ পিতার কথা শুনা দূরে থাকুক, বৃদ্ধ পিতাকে প্রহার পর্য্যন্তও করিতে প্রস্তুত আছেন। তবেই এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পুত্রের লালনপালন সম্বন্ধে চাণক্য পণ্ডিত আমাদিগকে যে নীতিশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিলে আমাদিগকে ভবিষ্যতে কষ্ট করিতে হইবেই হইবে।

"প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি ॥"

এই কবিতাটী যাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল, তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী ব্যক্তি আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই মহাত্মা ঐ চারি চরণ কবিতার মধ্যে সংসারের সমস্ত কাণ্ড প্রবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ মহামূল্য কবিতাটীর প্রকৃত অর্থ করিতে গেলে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। কবিতার স্থূল মর্ম্ম এই যে, মনুষ্যজীবন চারি অংশে বিভক্ত, যথা বাল্য কৈশোর, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্য। কবি বলিতেছেন, প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা, অর্থাৎ পঞ্চবর্ষ হইতে পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যার্জ্জন না করিলে চলে না। এই সময় এক্ষণকার

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে। যিনি যে অধিকারে প্রবিষ্ট হইবেন, পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে সেই বিদ্যা শেষ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। তাহার পর পঁচিশ হইতে পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পেন-সেন লইতে পারিবেন। পঞ্চান্নবৎসরের পর নিশ্চিন্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনা ও সুখভোগ করুন, এক্ষণকার গবর্ণ-মেণ্টের এই উদ্দেশ্য। যে নিয়ম আমাদিগের রাজপুরুষেরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রতি অবধারিত করিয়াছেন, এবং পেনসেন সম্বন্ধীয় আইন ন্যূনাধিক পঞ্চাশ পৃষ্ঠায় শেষ করিয়াছেন, সেই নিয়ম আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা চারি চরণ কবিতায় এমত ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, যে তাহার পশ্চাতে একটি বর্ণ যোজনা করিতেও কাহার সাধ্য হইবে না।

জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে মনুষ্যজীবনের প্রথমাংশ ক্ষেপণ করি-বার উপদেশ হইয়াছে; কারণ, যৌবনে আমাদিগের সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ থাকে, অর্থাৎ দশবর্ষ হইতে ত্রিংশবর্ষ পর্য্যন্ত মনুষ্যের স্মরণশক্তি যেরূপ প্রখর থাকে, অধিক বয়সে সেরূপ থাকে না। বিশেষতঃ বাল্যাবস্থায় প্রায় অধিকাংশ লোকই পিতা মাতার অধীনে থাকে, সেই জন্য সংসার-চিন্তায় চিন্তিত হইতে হয় না। শরীর সতেজ, স্মরণ শক্তি প্রখর, মন সংসারচিন্তাশূন্য ও ভবিষ্যতের উচ্চ আশা, এই কয়েকটি সুযোগ থাকায় বাল্যাবস্থাই বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত সময়। যৌবনসীমা উত্তীর্ণ হইলে অনেককেই সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে হয়। সংসারীর পক্ষে অর্থের যেরূপ প্রয়োজন

এরূপ আর কিছুরই নহে, কারণ, অর্থ ব্যতিরেকে আপনার ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয় না এবং কোন আশারই সুসার হয় না। আমি ভাল খাইব, আত্মীয় বন্ধুর সহিত আমোদ আহ্লাদ করিব, সংসারীর পক্ষে এই সকল বাসনা দিন দিন প্রবল হইয়া উঠে। এই জন্য যাহার যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি, সে সেইরূপ বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকে। যিনি যেরূপ উপার্জ্জন করিবেন, তিনি সেইরূপ কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন; কেননা, এক জন আধুনিক নীতিশাস্ত্রবেত্তা কহিয়াছেন যে, উপার্জ্জনের সময় যে ব্যক্তি সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি না রাখে তাহাকে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে হয়। মনুষ্যজীবনের যে অংশ প্রকৃত উপার্জ্জনের সময়, সে সময়ে সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, কারণ, বার্দ্ধক্যে পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জনের সমধিক ক্ষমতা থাকে না। তজ্জন্য অধিক অর্থাগমের সুবিধা হইয়া উঠে না। তখন সেই সঞ্চিত ধন দ্বারা আপনি স্বাধীনভাবে মনের অভিলাষ মত ধর্ম্ম-কর্ম্মের দ্বারা পরমসুখে কালযাপন করিতে পারে। প্রকৃত বার্দ্ধক্য বড় ভয়ানক অবস্থা, এক্ষণকার লোককে প্রায় সেরূপ বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইতে হয় না, সত্তরবর্ষ বয়সের পর প্রায় ভীমরথী অবস্থা পড়ে। সে সময় যার পর নাই শরীর অলস হইয়া উঠে, চলৎশক্তি থাকে না, শরীরে কফ আশ্রয় করে, ক্ষুধা মন্দ হইয়া যায়, শরীর সর্ব্বদা অশুচি থাকে ও মন একেবারে স্ফূর্ত্তি-বিহীন হইয়া যায়, সে অবস্থায় কোন কিছু নূতন শিক্ষা করা, কি অর্থ উপার্জ্জন করা, কি কোন

কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া দুর্ঘট। এই জন্যই পণ্ডিতেরা কহিযাছেন "চতুর্থে কিং করিষ্যতি" অর্থাৎ প্রকৃত বার্দ্ধক্যাবস্থায় লোকের কোন কার্য্য করিবারই ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং যাহার পুণ্য কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি যেন জীবনের তৃতীয়াবস্থায় তাহা সমাধা করেন, মধ্যাবস্থাতে কায়মনোযত্নে অর্থ অর্জ্জনের ও সঞ্চযের চেষ্টা দেখেন, বাল্যকালে বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। এক অবস্থার কার্য্য অন্য অবস্থার জন্য রাখিয়া দিলে কিছুতেই তাহার মঙ্গল হইবে না।

"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিশ্চ মহাফলা।" সংসারের লোক প্রবৃত্তির দাস, এ কথায় আর মতভেদ নাই। প্রবৃত্তি দুই প্রকার, সৎপ্রবৃত্তি ও অসৎপ্রবৃত্তি। এই দুই প্রকার প্রবৃত্তিই অন্ধ; ইহারা কোন কালেই উভয় দিক দেখিয়া শুনিয়া কার্য্য করে না। আমার একটি সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল, অর্থাৎ সেই কার্য্য করিতে মনের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল; কিন্তু সেই কার্য্যটি সমাধা করিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে কি না, এবং তাহা করিতে গেলে, আমার সম্মান রক্ষা হইবে কি না, অর্থের কুলান হইবে কি না, প্রবল ইচ্ছা বশতঃ তাহা বিশেষ বিবেচনা করিবার অবসর হয় না। অসৎপ্রবৃত্তির বিষয় আপাততঃ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে সৎপ্রবৃত্তির উপরেই গুটিকতক কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সৎপ্রবৃত্তিই হউক বা অসৎপ্রবৃত্তিই হউক, এই উভয়বিধ প্রবৃত্তিই সঙ্গের দোষগুণে উত্তেজিত হইয়া উঠে। বোধ কর, একটি বালক দ্বাদশ-বর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে ইংরাজী

বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, সেই সময় তাহার কয়েকটি বৈঞ্চবের সহিত সর্ব্বদা সহবাস ঘটিল, তাহার বৈষ্ণবধর্ম্মে যাহাতে শ্রদ্ধাভক্তি হয়, বৈষ্ণবঠাকুরেরা সর্ব্বদা তাহারই প্রবৃত্তি দিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্ম, স্বর্গ এবং মুক্তি, এই সকলের উপর বৈঞ্চবসম্প্রদায়ীরা নানা কথা তুলিয়া ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষার একেবারে নিবৃত্তি করিয়া ফেলিলেন। কারণ, ঠাকুরেরা যখন পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব-প্রহ্লাদের হরিভক্তির কথা তুলিতেন ও ভাবে গদগদ হইয়া চক্ষের জল ফেলিতেন, তখন বালক ভাবিল, লেখা পড়া শিখিয়া কি হইবে, মানুষ ত চিরকাল বাঁচিতে আসে নাই, হরিভক্তিকে সার করিলে চরমে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইব এবং চিরকাল মনের আনন্দে মহোৎ-সবে মহোৎসবে মাল্‌পো খাইয়া বেড়াইব। বালকটি বৈঞ্চব-দলে মিশিয়া কিয়দ্দিবসের মধ্যেই লেখা পড়া পরিত্যাগ করিল ও হস্তে কুঁড়াজালি লইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণবের সাজ সাজিল। এরূপ কার্য্য করায় যদিও বালকটি দুষ্কর্ম্মা-ন্বিত হয় নাই, কিন্তু অসময়ে এ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করাই যুক্তি। যে ঈশ্বরানুগ্রহে বাল্যকাল হইতেই বিপুল ধনের অধিপতি হইয়াছে, যাহাকে নানা কার্য্যে পিতৃপিতামহের নামসম্ভ্রম রক্ষা করিতে হইবে ও দশ জন আশ্রিত লোককে প্রতি-পালন করিতে হইবে, তাহার এরূপ তরুণ বয়সে সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঝুলি হাতে করা অন্যায় কার্য্য বলিয়া ধরিতে হয়। যাহার যেরূপ বয়ঃক্রম, সে সেইরূপ কার্য্য করিবে, ইহাই ন্যায়-যুক্তি-ধর্ম্ম-সঙ্গত। যদি কেহ বলেন যে, বালকটির অল্প বয়সে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, ইহাতে হানি কি?

বোধ হয়, ইহাতে বিলক্ষণ হানি আছে। বালক ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যদি সংসারকে অসার জ্ঞান করে, বিষয় কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সর্ব্বদা পূজা-অর্চ্চনায় নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে, ঐ বালক বা যুবকের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইবে। বিশেষতঃ এক্ষণকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সৎলোক অতি বিরল; যদি সেই যুবকটিকে, বৈষ্ণবেরা বিশেষ ভক্তিমান্ দেখে, তাহা হইলে তাহারাও নানা কৌশলে আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন করিবার চেষ্টা দেখিবে। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র অল্প বয়সে শবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার জীবন নষ্ট করিয়া-ছিলেন। সময়ের উচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই নীতিশাস্ত্র-সম্মত। অসময়ে সৎপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি করাই যুক্তিযুক্ত। সৎ-প্রবৃত্তিসম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ, উপরি-উক্ত উদাহরণটিই উপস্থিত প্রস্তাবের যথেষ্ট পোষকতা করিবে। এক্ষণে অসৎপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে বক্তব্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ন্যায়বিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যের নামই অসৎকার্য্য, সেই অসৎকার্য্যে আসক্তি এবং তাহাতে বিশেষ আকৃষ্ট হওয়ার নামই অসৎপ্রবৃত্তি। একথা অবশ্য বলিতে হইবে, যে যে প্রকার লোকের সহিত সহবাস করে, তাহার সেইরূপ প্রবৃত্তি জন্মে। এক ব্যক্তি কোন কালে লম্পট ছিল না, আপনার সহধর্ম্মিণী ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকমাত্রকেই মাতৃ-জ্ঞান করিত, সে ব্যক্তিও লম্পটের সহবাসে লাম্পট্যদোষে দূষিত হইয়াছিল এবং সেই নিশাচরীদিগের সহবাসে তাহার

ক্রমে ক্রমে মদ্যমাংসে ঘোর প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। যে ব্যক্তি একটি সামান্য নিকৃষ্ট পশু হনন করিতে কষ্ট বোধ করে, দস্যুর সহবাসে থাকিলে সে অনায়াসেই নরহত্যা প্রভৃতি গর্হিত পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যমাত্রই প্রবৃত্তির দাস, একটি সুরূপা কামিনী নয়নগোচর হইলে কাহার না সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর সহিত সহবাসের প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু সেই কামের আধার কামিনী দর্শনে যখন কোন ব্যক্তির কামরিপুচরিতার্থতায় ঘোর প্রবৃত্তি হয়, তখন সেই অসৎপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার জন্য সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত যুক্তিযুক্ত ও নীতিসঙ্গত। যে সময় কামিনী-দর্শনে লোকের মন কামমদে মাতাল হইয়া উঠে, সে সময় তাহার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। তাহার এরূপ ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এক কামিনীর জন্য সংসারে না হইয়াছে এমত অনিষ্টই নাই। এক একটি নারীর জন্য এক এক সময়ে এক একটি দেশ একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন নীচকুলোদ্ভবা বেশ্যাতে আসক্ত হইলে নানা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়, এবং অকারণ দিন দিন অর্থনাশ, ধর্ম্মনাশ ও মাননাশ হইতে থাকে। কামিনীসম্বন্ধে প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিবার কালে এই সকল চিন্তা করিলে অবশ্যই সুফল ফলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহাদিগের চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা কুপ্রবৃত্তিকে সহসা নিবৃত্ত করিতে পারেন। কেন না, তাঁহারা অনেক দেখিয়া শুনিয়া মনোমধ্যে কতকগুলি নিয়ম অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়

হঠাৎ সেই সকল নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে পারেন না। যাহাদিগের চরিত্র গঠিত নহে, তাহারা আপনা আপনি কোন প্রবৃত্তির দমন করিতে স্বভাবতই অক্ষম, কিন্তু যদি সেই অবোধ ব্যক্তিদিগের কোন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পথে স্বাভাবিক বাধা পড়ে, তবেই মঙ্গল; নতুবা তাহাদিগের আর দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। এই সম্বন্ধে একটি চমৎকার উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দিগ্‌-নগর নামক গণ্ডগ্রামে একজন সম্পন্ন রাজপুত বাস করিত। তাহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, কন্যাটির বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ হইয়াছিল, তথাচ পাত্রের অপ্রতুল বশতঃ বিবাহ হয় নাই। ঐ রাজপুতের নাম শোভারাম। কন্যাসন্তান ভিন্ন তাহার আর একটি মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র ছিল। নবদ্বীপাধি-পতি মহারাজের সরকারে শোভারামের পুত্র জমাদারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শোভারাম বাটীতে বসিয়া তেজারতি কাজ কর্ম্ম করিতেন। ঐ গ্রামে রামকিশোর নামক এক ব্রাহ্মণ-পুত্রের সহিত একজন সমবয়স্ক কায়স্থের বাল্যকালাবধি বন্ধুত্ব ছিল। যদিও ব্রাহ্মণপুত্র বিদ্যানুরাগী, সুশীল ও সজ্জন বলিয়া সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কায়স্থপুত্র বিনোদ-লালের সহিত বন্ধুতা থাকায় অনেকে তাঁহার নিন্দা করিত। বিনোদলালের সহিত সহবাস পরিত্যাগ করিতে পিতাও অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এক দিবস রামকিশোর ও বিনোদলাল উভয়ে দিগ্‌নগরের প্রসিদ্ধ দিঘীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন

যে, শোভারামের সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দুহিতা ঘাটের পার্শ্বে স্নান করিতেছে, তাহার একজন কিঙ্করী বস্ত্র লইয়া উপরে দাঁড়াইয়া আছে। বিনোদ পূর্ব্ব হইতেই শোভারামের কন্যাকে চিনিতেন, কিন্তু সে দিবস সেই ভুবনমোহিনীদর্শনে কন্দর্পস্বরে আহত হইলেন ও আপনার হৃদয়বন্ধু রাম-কিশোরকে কহিলেন, বন্ধু, দেখ দেখ, ঘাটের পার্শ্বে কে স্নান করিতেছে। রামকিশোর কহিলেন, ক্ষান্ত হও, ওদিকে চাহিও না, ও ভয়ানক পদার্থ। আমি উহাকে পূর্ব্ব হইতেই জানি, কতবার ঐ কামিনীর জন্য মনও অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি, চার পাঁচ দিবস ভাল করিয়া আহার হয় নাই, কিন্তু আপনা আপনিই আবার সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিয়াছি। বন্ধু! আমার নিতান্ত বিশ্বাস যে, ঐ অনূঢ়া কন্যা লইয়া এক দিবস বৃদ্ধ শোভারামকে ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইবে। ওরূপ সুরূপা কন্যা দেখিলে কাহার না প্রবৃত্তি হয়। যদি যবনাধিকার হইত, তাহা হইলে, এত দিন ঐ ভুবনসুন্দরী কামিনীকে সাহাজাদারা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যাইত, তাহাতে আর সংশয় নাই। যাহা হউক, ও মেয়েটার শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ হইলে আমাদিগের গ্রামের একটা আপদ বালাই দূর হইয়া যায়। নতুবা গ্রামের ছেলেদের মধ্যে কেহ না কেহ একদিন বিষম বিবাদ ঘটাইয়া বসিবে। বিনোদলাল কহিলেন, বন্ধু, তুমি যে একেবারে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইয়া উঠিয়াছ। সম্মুখে দেখ্‌বার সামগ্রী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ভাল করিয়া দেখিতেও দোষ আছে না কি? ভাই! হাসিও পায় দুঃখও ধরে; অমন কামিনীর জন্য যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহাও

আমি ভাল বলিয়া জ্ঞান করি। দেখ, সীতার জন্য রাবণের দশটা মাথা কাটা গিয়াছিল, আমাদের একটা মাথা বই ত না। রামকিশোর বলিলেন, চুপ কর, চারিদিকে শত্রু মিত্র অনেক লোক স্নান করিতেছে, একটা মিছা কথার ছল করিয়া শত্রু-পক্ষ ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত করিয়া দিবে। বন্ধুর পুনঃ-পুনঃ প্রতিকূল বাক্যে বিনোদলাল মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন এবং সে ভাব গোপন রাখিয়া সে দিবস বন্ধুর সহিত স্নান করিয়া বাটী চলিয়া গেলেন।

রামকিশোরের গঠিত মন, সেই জন্য তিনি শোভারামের কন্যাকে দেখিয়াও তাহার বেগ সহ্য করিতে পারিলেন। স্নান করিয়া বাটী গিয়া বন্ধুর সহিত কামিনীসম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু বিনোদ-লালের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা ছিল না, তাঁহার হৃদয়ে সেই কামিনীমূর্ত্তি সর্ব্বদা দেদীপ্যমান রহিল, তিনি শয়নে স্বপ্নে সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন, কি প্রকারে সেই কামিনী-রত্ন লাভ করিব, এই চিন্তাতেই তাঁহার সে দিবস কাটিয়া গেল; কিন্তু ও সম্বন্ধের কোন কথা আর সাহস করিয়া বন্ধুকে বলিতে পারিলেন না। পরদিবস প্রাতে একপ্রকার উন্মত্তের ন্যায় শোভারামের বাটীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগি-লেন। যাহারা কোন কুকার্য্যে উন্মত্ত হয়, তাহাদিগের সেই-রূপ দুর্ব্বুদ্ধি আপনা আপনিই আসিয়া উদিত হইয়া থাকে। বিনোদলাল অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, শোভারামের বাটীর একজন কিঙ্করীকে অর্থের দ্বারা হস্তগত করিতে হইবে। অনেক নাটকাদিতে পড়িয়াছি যে, দূতী

ব্যতিরেকে এ সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কল্য শোভা-রামের কন্যার বস্ত্র লইয়া যে ঘাটে দাঁড়াইয়াছিল, এ সম্বন্ধে তাহাকেই নিযুক্ত করিতে হইবে। অনুমানে বোধ হয়, সেই কিঙ্করীই শোভারামের কন্যার প্রিয়পাত্রী। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ বাটী আসিলেন, এবং শরীর তৈলাক্ত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র দিঘীর ঘাটে স্নান করিতে গেলেন। দিবা দশ ঘটিকা হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঘাটে বসিয়া রৌদ্রে পুড়িলেন, তথাচ সেই কিঙ্করীর সাক্ষাৎলাভ করিতে পারি-লেন না। যখন লোক কোন প্রবৃত্তির দাস হয়, সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রারম্ভে যত কেন লাঞ্ছনা হউক না, যত কেন কষ্টভোগ করিতে হউক না, তখন কিছুতেই তাহার চৈতন্যোদয় হয় না। বিনোদ দুই ঘণ্টাকাল রৌদ্রে পুড়িয়া বাটী আসিলেন, তথাচ একবারও তাহার মনে হইল না যে, অকারণ কেন শরীরকে ও মনকে কষ্ট দিতেছি। তিনি আহারের পরই ভাবিলেন যে, অদ্য সকাল সকাল বাজারের মিঠাইওলার দোকানে যাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, কারণ দেখিয়াছি, সেই চাকরাণীটা মধ্যে মধ্যে সেই দোকান হইতে মিঠাই কিনিয়া লইয়া যায়। অদ্য সে দোকানে আসিলেও আসিতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া সে দিবস সেই দোকানে যাইয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু চাক-রাণী আসিল না। পরদিবস প্রত্যূষেই আবার শোভারামের বাটীর দিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, চাকরাণী এক ময়রার দোকানে একটি বালক ক্রোড়ে লইয়া মিঠাই কিনিতেছে। বিনোদলাল অাস্তে ব্যস্তে চাকরাণীর

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হাঁগা, এ ছেলেটি কার? তোমাদের বাবুর বুঝি? চাকরাণী স্ত্রীসুলভ হাসি হাসিয়া কহিল, না গো বাবুর নাতি। বিনোদলাল কহিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাতিই বটে, তোমাদের বাবুর এক ছেলে আর এক মেয়ে বই আর হয় নি। মেয়েটির এখনও বুঝি বিয়ে হয় নি? চাকরাণী কহিল, না গো না, মস্ত মাগী হয়েছে, এখনও বাবু বিয়ে দেয় নি। ওরা খোট্টা খলব জাত, তাই অত বড় মেয়ে ঘরে রেখেছে, সময়ে বিয়ে হলে এত দিনে ছেলের মা হোতো। তাহার পর চাকরাণী ভবনাভিমুখে চলিল, বিনোদলাল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দোকান হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে যাইয়া বিনোদলাল চাকরাণীকে কহিলেন, ওগো বাছা! তোমাকে একটি কথা বলি শোনো। আজ হইতে তুমি আমার ধর্ম্ম মা হইলে, দেখ বাছা! ছেলে যদি আব্দার করিয়া তোমার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে, তোমায় কিন্তু তা কর্ত্তে হবে। চাকরাণী কহিল, এ কি ভাগ্‌গী! তুমি বাবা বড়লোকের ছেলে, তুমি বাবা আমাকে মা বলিলে! বিনোদলাল কহিলেন, ওরে বাছা, সাধে কি আমি তোমাকে মা বলিলাম, তোমার চেহারা আর আমার মায়ের চেহারা ঠিক এক রকম। চাকরাণী কহিল, তুমি যেমন বাছা আমাকে সেধে মা বল্লে, আমিও চিরকাল তোমাকে পেটের ছেলের মত ভাব্‌বো। বিনোদলাল কহিলেন, মা, আজ বিকেলবেলা যেন তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, আমার একটা বিশেষ দরকার আছে। চাকরাণী কহিল, দেখি বাবা এখন তা বল্‌তে পারি না, যদি

জিনিস টিনিস কিন্তে আমাকে দোকানে পাঠিয়ে দেয়, তবেই দেখা কোত্তে পার্‌বো, এখন বাবা আমি যাই, আমাদের গিন্নী মাগী বড় কল্লা, একটু দেরি হলে মারমুখো হয়ে ওঠে। এই কথা বলিয়া চাকরাণী দ্রুতপদে বাটীর দিকে চলিয়া গেল। চাকরাণীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল, এই আহ্লাদে বিনোদলালের বুক পাঁচ হাত হইয়া উঠিল। তিনি বাটী আসিয়া স্নান আহার করিলেন এবং ক্ষমতানুযায়ী বেশ বিন্যাস করিয়া একবার চিরবন্ধু রামকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। দুই দিবসের পর রামকিশোর বিনোদকে দেখিয়া কহিলেন, কি হে, তোমার যে আর দেখা পাওয়াই ভার, আজকাল যে সর্ব্বদাই ফিট ফাট হয়ে থাক, কাণ্ডখানা কি বল দেখি! বিনোদলাল হাস্যবদনে কহিলেন, বোল্‌বো, আগে কাজ হাসিল করি, তার পর সব বোল্‌বো। রামকিশোর কহিলেন, আর বলিতে হইবে না, সব বুঝিয়াছি, তুমি একটা ভয়ানক বিপদে পড়িবে তাহারই চেষ্টায় আছ, যা জান ভাই, তাই করগে; কিন্তু আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, কুপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই মঙ্গল। বিনোদলাল কহিলেন, আচ্ছা ভাই, ও সব কথা ইহার পরে হবে, এখন এই গোটগাছ্‌টা বাঁধা দিয়ে তোমার মার কাছথেকে পচিশটি টাকা এনে দাও দেখি। রামকিশোর কহিলেন, মা কি তোমাকে চেনেন না, দরকার থাকে, তুমি আপনি গিয়ে আন। আমি আবার বলিতেছি, যে কর্ম্মে মাতিয়াছ, ইহাতে ধননাশ, মাননাশ এবং প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। বিনোদলাল কহিলেন, তোমার মত আমি সত্যপীর

হইতে পারিব না, যে কাজে নেমেছি, একবার চেষ্টা করে দেখ্‌বই দেখ্‌বো। রামকিশোর আর সে কথায় উত্তর দিলেন না, মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। বিনোদলাল রামকিশোরের মাতার নিকট হইতে পঁচিশটি টাকা লইয়া পুনর্ব্বার সেই মিঠাইওলার দোকানে যাইয়া বসিলেন। কার্য্যগতিকে চাকরাণীও একটি কাংস্যপাত্র হস্তে লইয়া দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। চাকরাণীকে দেখিবা মাত্র বিনোদলাল একটু অন্তরে যাইয়া দাঁড়াইলেন। চাকরাণী দোকানের কাজ সারিয়া বিনোদের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল। বিনোদ একেবারে ধর্ম্মমায়ের হস্তে দশটাকা দিয়া মূলকথা কহিয়া বসিলেন। শ্রবণমাত্রই চাকরাণী সিহরিয়া কহিল, ছি ছি বাবা, অমন কথা কহিও না, এ কি আমার সাধ্য, আমার মনিবের বাড়ী তেমন নয়! বিনোদ কহিলেন, মা, তুমি যদি আমার উপর সদয় না হও, তা হলে আজ রাত্রেই আমি গলায় দড়ি দিয়া মরব। চাকরাণী মনে মনে ভাবিল, এ ছোক্‌রা অত্যন্ত মন্দলোক, ও আমার কাছে সর্ব্বনেশে কথা বলিতে কিছুমাত্র লজ্জা বা ভয় করিল না। আমার দিদিঠাকরুণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তার প্রতি এই সকল মন্দ কথা! এ হতভাগা ছোঁড়া বাওন হয়ে চাঁদ ধত্তে চায়, হতভাগা বেটার সাধ ত মন্দ নয়! প্রকাশ্যে কহিল, বাবা তুমি আজ যাও, আমি বিবেচনা করে এ কথার উত্তর দিব। বিনোদ কহিল, মা, তা হবে না, আমার মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিয়া যাইতে হইবে। চাকরাণী কহিল, আর দিব্বি দ্বীপান্তরে প্রয়োজন নাই, আজ তুমি যাও। সে এই

কথা বলিয়া চলিয়া গেল। পরদিবস প্রাতে বিনোদের সহিত আবার সেই চাকরাণীর সাক্ষাৎ হইল, চাকরাণী বিনোদকে দেখিযা মনে মনে ভাবিল, আবার ঐ হতভাগা ছোঁড়া আমার কাছে আস্‌ছে। আজ আমি ওর কাছে এক-শত টাকা চাহিব, দেখি বেটা কোথা থেকে দেয়। বিনোদ কথা কহিতে না কহিতেই, চাকরাণী কহিল, ওগো বাবা, তুমি যে কথা বলেছিলে, এ সব টাকার কাজ; স্বদু হাত মুখে ওঠে না। দিদিমণির একশত টাকার দরকার হয়েছে, এই সময়ে যদি আমার হাতে একশত টাকা দিতে পার, তা' হলে অনেক স্থবিধা হতে পারে। বিনোদলাল একেবারে একশত টাকার মুখ কখন দেখে নাই। একশত টাকার কথা শুনিয়া বিনোদের মস্তক ঘুরিয়া গেল; পাছে চাকরাণী তাকে গরিব ভাবে, এই জন্য মুখে সাপোট করিযা বলিলেন, একশ ছেড়ে আমি পাঁচশ দিতে পারি, কিন্তু তোমার দিদিঠাক্‌রুণকে আমার হাত থেকে টাকাগুলি নিতে হবে। চাকরাণী কহিল, আচ্ছা তাহাই হইবে, তবে আজ সন্ধ্যার পর টাকাগুলি লইযা আমাদিগের খিড়্‌কীর বাগানের ভিতর বসিয়া থাকিও, আমি সময় মত আসিয়া তোমাকে ডাকিযা লইয়া যাইব। এই কথা শুনিয়া বিনোদ-লাল মনে মনে ভাবিলেন, ভালমানুষের মেয়েরা কি আর টাকা চেয়েছে, এ কথা কখনও বিশ্বাসযোগ্য নয়, চাক-রাণী মাগী আমার কাছে একশত টাকা ফাকি দিবার চেষ্টায় ছিল, আমি কেমন সেয়ানা ছেলে, কেমন প্রস্তাব করিয়াছি; ইহাতে সাপও মরিবে না লাঠীও ভাঙ্গিবে না।

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যদি যথার্থই টাকা চায়, তখন যেমন করে পারি যোগাড় করে দিব। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে বিনোদলাল স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং বহু কষ্টে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর সেই সঙ্কেতিত স্থানে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চাকরাণী বিনোদলালকে যে কথা বলিয়া আসিয়াছিল, তাহার বিন্দু-বিসর্গও মনে ছিল না। সে সন্ধ্যার পর আপনার কাজ কর্ম্ম সারিয়া নিদ্রিত হইয়াছে। বাটীর সকলেই স্ব স্ব স্থানে যাইয়া শয়ন করিতেছে ও চারিদিকে দরজায় খিল পড়ার শব্দ হইতেছে। ক্রমে বাটী নিঃশব্দ হইয়া গেল। বিনোদ-লাল বাগানের অভ্যন্তরস্থিত একটি কামিনীফুলেব প্রকাণ্ড ঝাড়ের পশ্চাতে রজনী দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন, মশার দংশনে সর্ব্বশরীর ফুলিয়া উঠিয়াছিল, তথাচ আশাপথ চাহিয়া স্থিরভাবে সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতে-ছিলেন। যখন রজনী গভীর হইয়া উঠিল, চারিদিকে চৌকিদার হাঁকিতে লাগিল, অন্ধকার বাগিচার ভিতর শৃগাল কুকুর ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল, তখন বিনোদ-লাল আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। উদ্যানের ইতস্ততঃ কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া বাটীপ্রস্থানেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখেন, বহির্ভাগ হইতে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। উদ্যানে প্রবেশ করিবার সেই একমাত্র দ্বার, চতুর্দ্দিকের প্রাচীর উচ্চ, কোনক্রমেই তাহা উল্লঙ্ঘন করা যায় না। এই সকল দেখিয়া বিনোদলালের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, কিন্তু কি করেন, বন্দীর ন্যায় সেই গভীর রজনীতে

একটি বৃক্ষতলে বসিয়া রহিলেন। সেই ভাবে বিনোদ-লাল প্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ভোর হইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে একেবারে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সে স্থানে শয়ন করা কষ্টকর বোধে হাঁটুর উপর মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র খিড়্কীর দ্বার খুলিয়া বাটীব দ্বারবান্ উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষতলে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া চোর জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিয়া ফেলিল। চোর ধরিয়াছি বলিয়া দ্বারবান্ চীৎকার করিতে আরম্ভ করায় বাটীর কর্ত্তা এবং তাঁহার পুত্র খিড়্কীর বাগানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তিন জনে পড়িয়া বিনোদলালকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক প্রহারের পর দ্বারবান্ কহিল বাবু, আমি এ ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়াছি, এ ঘোষেদের বাড়ীর ছেলে, আজ তিন চার দিন ধরিয়া আমাদের সম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে, আমাদিগের ঝিয়ের সহিত একদিন কথা কহিতেও দেখিয়াছি; আমার বোধ হয়, এর অন্য মন্দ অভিপ্রায় থাকিবে। এই কথা শুনিয়া বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র আরও ঘা কতক প্রহার করিয়া খিড়্কীর দ্বার হইতে রাস্তায় ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। বিনোদলাল খুঁড়াইতে খুঁড়াইতে ভবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। খানিক দূর যাইয়া লজ্জা ও ভয়ে অভিভূত হইয়া আপনার দরজায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও সংগোপনে আপনার শয়নগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। এদিকে চারিদিকে গোল হইয়া

পড়িল যে, ঘোষেদের বাড়ীর বিনোদলাল শেষরাত্রে খোট্টা-দের বাড়ী চুরি করিতে গিয়াছিল, তাহারা ধরিয়া অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে।

লোকপরম্পরায় বিনোদলালের বাল্যবন্ধু রামকিশোর এই জঘন্য কথা শুনিয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার শয়নগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, বিনোদ শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া হা হুতাশ করিতেছে। বন্ধুবর ধীরে ধীরে তাঁহার শয্যার নিকটে গিয়া কহিলেন কেমন হে, কার্য্যের উচিত মত ফল ফলিয়াছে কি? যে সকল লোক পরনারীর সতীত্বহরণের চেষ্টা করে, তাহা-দিগের প্রায়ই এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। এ যে কেবল তোমার অদৃষ্টে ঘটিল এমন নহে; পরনারীলোলুপ অনেক পাপাত্মাই তোমার ন্যায় বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছে। অনে-কের প্রাণপর্য্যন্তও গিয়াছে। এইক্ষণে কি বুঝিতে পারিলে যে, কি জন্য পণ্ডিতেরা কুপ্রবৃত্তির উদ্রেককে নিবৃত্ত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। দেখ দেখি, দুই তিন দিবসের মধ্যে কিরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলে! এক্ষণে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে প্রস্থান কর, তাহা না হইলে লোকের নিকট কি প্রকারে মুখ দেখাইবে। বন্ধুর তিরস্কার শুনিয়া বিনোদলাল কেবল চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিলেন।

রামকিশোর এবং বিনোদলাল উভয়েই একটি সুরূপা কামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জ্ঞানপ্রভাবে রাম-কিশোর আপনার মনোবিকার আপনা-আপনিই দমন করিয়া-ছিলেন। বিনোদলাল সেই কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন

নাই, এই জন্যই তাঁহাকে লোকসমাজে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হইয়া রহিতে হইল, এবং চোরের অপেক্ষাও কঠোর প্রহার সহ্য করিয়া দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইল। ঐ পাপ-অভিপ্রায় সংসাধনের জন্য তিনি ঋণ করিয়া কতকগুলি টাকাও নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি যে রজনীতে দাসীর সঙ্কেতিত স্থানে যাইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, সে রজনীর প্রথমাংশের যমপীড়া তিনি বড় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কিন্তু চরম অবস্থার যমদণ্ড দীর্ঘকাল স্মরণ করিতে হইল।

মদ্যপানে দোষ নাই, মাংসভোজনেও দোষ নাই। মনুষ্য প্রবৃত্তির দাস; তবে সকল বিষয়েই নিবৃত্ত থাকায় বিশেষ ফল দেখা যায়। নীতিশাস্ত্রবেত্তার এই দুইটি কথার ভাবার্থ সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। যদি কেহ প্রতিদিন কেবল শরীর রক্ষার অনুরোধে একতোলা পরিমাণে সুরা পান করেন এবং কোনক্রমেই সে নিয়মের অন্যথাচরণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সুরা সেরূপ সামগ্রী নহে, কোন কালে কেহ ইহার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ এক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিশেষ সহানুভূতি আছে; এই হেতু শাস্ত্রকারেরা নানা কৌশলে সুরাপান নিবারণের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ সকলেই পরিমিত ভাবে সুরাপান করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ক্রমে কেহই তাহার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারে না। সুরা পান করিতে করিতে মাংসভক্ষণ ও স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি অন্যান্য নিকৃষ্ট

প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে। সেই সকল প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে গিয়াই লোকের বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। একব্যক্তি মদ খাইতে শিখিয়াছে, কিন্তু অর্থের অনাটন তাহার চৌর্য্যকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। যে ব্যক্তির মদ্য এবং মাংসে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, সে ব্যক্তি অর্থের অভাব হইলে চুরি করিয়া মদ্য মাংস খাইতে পারে। মাতালেরা চুরি করিয়া অন্যের পাঁটা কাটিয়া খাইয়াছে, ইহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি কেহ বলেন, যাঁহার অর্থের অনাটন নাই, মদ্য মাংস খাইলে তাহার অনিষ্টের সম্ভাবনা কি? সুরাপানপক্ষে আমি যে প্রস্তাব লিখিয়াছি, এ সকল কথার হেতুবাদ তাহাতেই বাহুল্যরূপে হইয়াছে। আর একটি মাত্র কথা বলিয়া এই উপস্থিত প্রস্তাব শেষ করিব। ধনবান্ লোকেরা কি সুরা-পান করিয়া রোগগ্রস্ত হয়েন না! যাঁহারা প্রত্যহ মাংস ক্রয় করিয়া আহার করিয়া থাকেন ও যাঁহাদিগের ছাগমাংস খাইতে খাইতে নানাবিধ পশুপক্ষীর মাংসে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া মাংস ভক্ষণ করায় তাঁহারা কি উৎকট পীড়ায় প্রপীড়িত হয়েন না! এদেশের লোকের প্রত্যহ মাংস ভোজনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে ভদ্র হিন্দুরা বৃথা মাংস ভক্ষণ করিতেন না; অর্থাৎ রোগশূন্য হৃষ্টপুষ্ট ছাগ দেবদেবীর সম্মুখে বলিদান দিয়া বৎসরের মধ্যে পাঁচ সাত দিন মাত্র মাংস ভোজন করিতেন। এক্ষণকার লোকের মাংসে ঘোর প্রবৃত্তি হওয়ায় তাঁহারা বিবেচনাশূন্য হইয়া পশুপক্ষীর মাংস পর্য্যন্ত

ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যহ এই কলিকাতা মহানগরীর অভ্যন্তরে হিন্দু কসাইসম্প্রদায় যে সকল ছাগল কাটিয়া মাংস বিক্রয় করে, তাহা চক্ষে দেখিলেও বিবেচক ভদ্রলোকের আর ইহজন্মে মাংস খাইতে ইচ্ছা থাকে না। সুরাসংযোগে সেই সকল মাংস ভোজন করিয়া এক্ষণকার লোক যেরূপ সুস্থশরীরে কালাতিপাত ও দীর্ঘ-জীবন ভোগ করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তবেই মদ্যমাংসভোজনে ও পরকীয় রসে রসজ্ঞ না হওয়া-সম্বন্ধে সাধ্যানুসারে নিবৃত্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

"অতিদর্পে হতা লঙ্কা, অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ, সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং॥"

এই নীতিগর্ভ কবিতাই যথেস্ট উপদেশ দিতেছে। কিন্তু অল্প কথায় অশিক্ষিত মনের কোন কালেই চৈতন্য-সম্পাদন হয় না। অধিক বাড়িলেই পড়িতে হয়, এই একটি মোটা কথা সকলেরই কণ্ঠস্থ আছে, কিন্তু কার্য্যকালে লোকের তাহার প্রতি দৃষ্টি থাকে না। বালকদিগের পাঠ্য পুস্তক 'নীতিকথায়' ঈগল ও কচ্ছপের যে গল্পটি আছে, সেটি কেবল বালকদিগের জন্যই রচিত হয় নাই। বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই সেই সার কথাকটির নিয়মানুসারে চলা উচিত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এতদ্দেশীয় লোক রাশি রাশি সারগর্ভ নীতিকথা বাল্যকাল হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াও কার্য্যকালে তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। এক দর্পেতেই লঙ্কার রাবণ সবংশে হত হইয়াছিল, একথা হিন্দুমাত্রেই পড়িয়াছেন এবং শুনিয়াছেন, তথাচ

লোকের একটু বিনয় হইলে বা ক্ষমতা হইলে নির্ধন এবং দুর্ব্বল লোকের উপর দর্প করিতে কেহই ক্ষান্ত নহে। তিনি লোকের উপর একাধিপত্য করিবেন, পৃথিবীর সার বস্তু ভোগ করিবেন, আত্মসুখে উন্মত্ত হইয়া থাকিবেন, এ বিষয়ে কেহ কথা কহিতে পারিবেন না। তাঁহার সুখের জন্য যদি এক জনের প্রাণ বধ করিতে হয়, একখানি গ্রাম দগ্ধ করিয়া দিতে হয়, দুর্ব্বল লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতে হয়, তিনি তাহাও করিবেন; অধীনস্থ লোককে ধৈর্য্যের সহিত সে সকল অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। যে সকল লোকের ধর্ম্মভয় নাই, যাহারা পরদুঃখে দুঃখিত নহে, যাহারা নাই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তাহাদেরই সামান্য ক্ষমতা হইলে আর দর্পের পরিসীমা থাকে না। দর্পহারী ভগবান্ যে মস্তকের উপর রহিয়াছেন, তাহা তাহারা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। পুরাণাদিতে যে সকল ঘোর দর্পিত লোকের চরিত্র চিত্রিত রহিয়াছে, তৎসমুদয় সত্যই হউক, আর কবির কল্পনাই হউক, সে গুলি পাঠ করিলে মনুষ্যমাত্রেরই জ্ঞানের উদয় হইতে পারে, তাহাতে আর সংশয় নাই। লঙ্কাধিপতি রাবণের দর্পে, কংসাসুরের দর্পে, জরাসন্ধের দর্পে ও আধুনিক নবাব সিরাজদ্দৌলার দর্পে এক এক সময়ে জগৎ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহারা দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পারে নাই। যখন সেই সকল দুরাত্মগণের দৌরাত্ম্য সাধারণের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখনই তাহাদিগের প্রবল শত্রুহস্তে সমূলে নিপাত হইয়া গিয়াছে। উপরি-উক্ত যে কয়েকজন দুরাত্মার নামোল্লেখ করা হইল,

তাহাদিগের মধ্যে একজনেরও স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই, সকলেই শক্রহস্তে নিহত হইয়াছে। সেই সকল পুরাকালের অত্যাচারিগণ আমাদিগের উপর কোন অত্যাচার করে নাই, তথাচ আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বর্ত্তমান দাম্ভিক লোকদিগের কি জন্য চৈতন্য হয় না, বলিতে পারি না। দাম্ভিক লোকেরা প্রায়ই, কেহ তাঁহাদিগের সম্মান করুক বা না করুক, আপনা আপনিই আপন মনে গর্ব্বিত হইয়া থাকেন। অভিমানে দুর্য্যোধন হত হইয়াছিলেন, এই কথাই উপরি-উক্ত নীতি-গর্ভ কবিতায় উল্লিখিত আছে। রাজা দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান পুত্র, কৌরববংশের শ্রেষ্ঠব্যক্তি, সুতরাং তিনি সকলেরই মর্য্যাদার পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রতিযোগী রাজা যুধিষ্ঠিরও তাঁহার যথেষ্ট মর্য্যাদা রাখিতেন। তবে তাঁহার অমর্য্যাদা হইল কোথায়? এক দিবস তিনি ময়দানব-রচিত পাণ্ডবদিগের মহাসভা দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। দৈবাৎ স্থলভ্রমে জলের চৌকায় পড়িয়া যাওয়ায় সভাস্থ লোকেরা কেহ কেহ হাস্য করিয়া উঠিয়াছিল, এই অপমান তাঁহার অসহ্য হইল, পাণ্ডবেরা আমার অপমান করিয়াছে বলিয়া পিতার নিকট নানা কথা কহিলেন, দুষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পাণ্ডবদিগের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হই-লেন। তিনি ভ্রমবশতঃ আপনা আপনিই জলে পড়িয়া যাওয়ায় ঘোর অপমান বোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু যুধি-ষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত হইলে গলায় হাত দিয়া যখন তাঁহাকে সভাতলে নাবাইয়া দিলেন, তখন একবারও ভাবেন

নাই যে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার আমি কিরূপ অমর্য্যাদা করিতেছি। যখন রাজলক্ষ্মী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনাইয়া উলঙ্গ করিবার চেষ্টা করেন, তখনও একবার ভাবেন নাই যে, দ্রুপদরাজদুহিতার কিরূপ অমর্য্যাদা করিতেছি। যে পরের মর্য্যাদা বুঝে না, তাহার নিজের মর্য্যাদা নাই, এ কথা আত্মাভিমানী লোকেরা কোন কালেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তিনি পাণ্ডবসভায় আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন, তাহার বিনিময়ে যুধিষ্ঠিরকে সভাতলে নাবাইয়া দিয়া দ্রৌপদীকে রাজসভায় উলঙ্গ করিয়াও মনের আক্ষেপ মিটিল না। পাণ্ডবেরা যখন জটাজূট ধারণ করিয়া বনপ্রস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগের পশ্চাতে "গোরু গোরু" বলিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। শত্রু কর্ত্তৃক এইরূপ লাঞ্ছিত হইয়া যুধিষ্ঠির কি প্রকৃত প্রস্তাবে অপমানিত হইয়াছিলেন? না—কিছুমাত্র না। বরং মানীর অকারণ অপমান দেখিয়া প্রকৃত মর্য্যাদাশালী লোকেরা হাহাকার শব্দে রোদন করিয়াছিলেন। দ্যূতক্রীড়াস্থলে দুর্য্যোধন আপনার দম্ভ প্রকাশ করিতে এবং মানীর মানহানি করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু প্রকৃত মর্য্যাদাশালী ব্যক্তি যুধিষ্ঠির সেই সকল অপমান ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। যদিও তিনি সে সময়ে ইচ্ছা করিলে দুর্য্যোধনের সর্ব্বনাশ করিতে পারিতেন; কিন্তু অসময় জানিয়া কিছুই করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। পাণ্ডবদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিয়া দুর্য্যোধনের দর্পের সীমা রহিল না ও জলে

পড়িয়া যাওয়াতে যে অপমান বোধ হইয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ লওয়া হইল বলিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু সময়ে ভীম যখন গদাঘাতে দুর্য্যোধনকে সমরশায়ী করিলেন ও পুনঃপুনঃ মস্তকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, তখন হয় ত দুর্য্যোধন বুঝিয়াছিলেন যে, অতিমানের ও অতি-দর্পের চরম ফল এই। পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের ভবনে ভ্রমপ্রযুক্ত জলে পড়িয়া যাওয়ায় অপমান অসহ্য হইয়াছিল, এইক্ষণে ভীমের পদাঘাত অনায়াসে সহ্য হইতেছে।

দাম্ভিক ব্যক্তিরই পদে পদে অভিমান উপস্থিত হয়। দম্ভসম্বন্ধে নর ও নারী উভয়ই সমান। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা মহিষী সত্যভামার মনে মনে এই দর্প ছিল যে, সকলের অপেক্ষা আমি প্রধানা। যদিও রুক্মিণীকে অগ্রে বিবাহ করিয়াছেন, রুক্মিণী অগ্রে পুত্রবতী হইয়াছেন, তথাচ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে আমারই মর্য্যাদা রক্ষা করেন। যদুকুলরমণী-গণের মধ্যে আমি যাহা মনে করি, তাহাই করিতে পারি। সত্যভামার মদগর্ব্বের বিষয় কলহপ্রিয় নারদ ঋষি বিশিষ্ট-বিধানে অবগত ছিলেন, এই জন্য সত্যভামার সহিত রুক্মিণীর কলহ বাধাইবার নিমিত্ত একদিন একটি পারিজাত পুষ্প আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, সে সময়ে বাসুদেব রুক্মিণীর সহিত একাসনে বসিয়াছিলেন, নারদ-দত্ত পুষ্পটি রুক্মিণীর কবরীর উপর বসাইয়া দিলেন। কলহ বাধাইবার এই চমৎ-কার সুযোগ পাইয়া নারদ তৎক্ষণাৎ সত্যভামার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেবি! আপনি না সর্ব্বদা দর্প করিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন যে দুর্ল্লভ সামগ্রী প্রাপ্ত হন,

তাহা আমাকেই আনিয়া দেন; অদ্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদুপতি কোথায় একটি দেবদুর্লভ পারিজাত পুষ্প প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মনোহর কুসুমটি স্বহস্তে রুক্মিণীর কবরীতে বসাইয়া দিতেছেন। এই কথা শুনিয়া সত্যভামার আর অভিমানের পরিসীমা রহিল না। তৎক্ষণাৎ মানাগারে যাইয়া শয়ন করিলেন। ক্ষণবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দেখিলেন, সত্যভামা মানাগারে শয়ন করিয়া আছেন, চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে। কেশব অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার অভিমানের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সত্যভামা দর্পের সহিত কহিলেন, যদি পারিজাত কুসুমের বৃক্ষটি আমার এই মন্দিরের দ্বারে আনিয়া রোপণ করিতে পার, তবেই প্রাণ রাখিব, নতুবা আত্মঘাতিনী হইয়া মরিব, তাহাতে আর সংশয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ অগত্যা সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন, কিন্তু পারিজাত বৃক্ষ আনয়নকালে ইন্দ্রের সহিত ভয়ানক যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে অসংখ্য যাদবসৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ঘটনার কিছুকাল পরে সত্যভামা নারদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কি ব্রত করিলে পতি অন্য স্ত্রীর মুখাবলোকন করেন না। দেবর্ষি কহিলেন, স্বামিদানব্রত—এই ব্রত করিয়া ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী ও নারায়ণী চিরকাল পতিসোহাগিনী হইয়া কালযাপন করেন, কোন কালে তাঁহাদিগকে সপত্নীর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। সত্যভামা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ব্রতের নিয়ম কি? নারদ কহিলেন, আর কিছুই নহে, স্বামীকে উৎসর্গ করিয়া একটি ব্রাহ্মণকে দান করিতে

হইবে, ব্রাহ্মণ যখন দানলব্ধ ব্যক্তির মস্তকে তল্পী চাপাইয়া প্রস্থানপরায়ণ হইবেন, সেই সময়ে আপনি করযোড়ে কহি-বেন, আমি স্বামীর ওজনে স্বর্ণ দিতেছি, স্বামীর বিনিময়ে আপনি স্বর্ণ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করুন। কিন্তু আপনার স্বামীর শরীরটি বড় ছোটখাটো নহে; যদি তাহার সমপরিমাণ স্বর্ণ না দিতে পারেন, তাহা হইলে বিষম বিভ্রাটে পতিত হই-বেন। সত্যভামা হাস্য করিয়া কহিলেন, কি? আমি আমার পতির দেহভারের সহস্রগুণ স্বর্ণ দিতে পারি। নারদ কহিলেন, উত্তম, তবে কল্যই পতিদানব্রত সমাধা করিয়া ফেলুন; কিন্তু অতি সংগোপনে করিবেন, নতুবা আপনার অন্যান্য সপত্নীরা বলিবে যে, স্বামীতে আমাদিগের সকলেরই সমান অধিকার আছে, ষোলশত অষ্ট অংশের একাংশমাত্র দান করিতে পারেন; এরূপ আপত্তি উপস্থিত হইলে আপনার ব্রতের পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। আপনি কল্য প্রত্যূষে নিজ অন্তঃপুর মধ্যে ব্রতের আয়োজন করিয়া রাখি-বেন, আমিই পুরোহিত হইয়া মন্ত্র পড়াইব ও আমিই দান গ্রহণ করিব; এরূপ করিলে আপনার সপত্নীরা বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিবে না, অথচ আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সত্যভামা কহিলেন, ইহাই উত্তম পরামর্শ; তবে কল্য প্রত্যূষে আপনি আমার মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। নারদ তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন ও পাঁচ মহল ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে আসিয়া কহিলেন, যদুপতে, কল্য প্রত্যূষে সত্যভামার মন্দিরে আমি একটি রহস্য ব্যাপার ঘটাইব, আপনি তাহাতে সহায়তা করিবেন। সত্যভামার

দর্প আর আমার সহ্য হয় না। কল্য তোমার প্রিয়ার চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করাইব। শ্রীকৃষ্ণ নারদের সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রহিলেন।

রজনীতে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের নিকট পতিদানব্রতের কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তৎশ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমি তোমার একান্ত অধীন, আমাকে দান বিক্রয় করিতে তোমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। পতির মুখে এই সোহাগের কথা শুনিয়া সত্যভামার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। রাত্রি শেষ হইলে সত্যভামা হৃষীকেশকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র শীঘ্র স্নান করিয়া বস্ত্র-অলঙ্কার পর। শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণকার স্ত্রীকিঙ্করগণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ স্নান ও বস্ত্র-অলঙ্কার পরিধান করিয়া সত্যভামার নিকট হাজির হইলেন। এদিকে দেবর্ষি যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সত্যভামাকে কহিলেন, দেবি! এ ব্রতের মন্ত্র তন্ত্র অধিক নাই, আপনি এই কথা বলিয়া আমাকে পতিদান করুন, যথা,—'আমি আপন পতিকে স্ব-ইচ্ছায় আপনাকে দান করিলাম, অদ্য হইতে আমার পতির উপর আপনার দানবিক্রয়ের স্বত্ব জন্মিল; কিন্তু যদি পতির সমপরিমাণে স্বর্ণ দিতে পারি, তবেই তুমি আমাকে আমার পতি প্রত্যর্পণ করিয়া স্বর্ণ লইয়া প্রস্থান করিবে।' সত্যভামা এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবর্ষিকে পতিদান করিলেন। দেবর্ষি যখন দানলব্ধ ব্যক্তিকে লইয়া প্রস্থান করেন, সেই সময়ে সত্যভামা পূর্ব্বের কথানুসারে স্বামীর বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত হইলেন। তৌলদণ্ড ঝুলান হইল, শ্রীকৃষ্ণ পাল্লার এক দিকে বসিলেন; সত্যভামা অপর দিকে স্বর্ণ

দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার গৃহের সমস্ত স্বর্ণরৌপ্য তৌলদণ্ডে উঠাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের শরীরের তুল্য ভার হইল না। সত্যভামা হতভম্ব হইয়া কহিলেন, এ কি? আমার স্বামীর শরীর কি এত ভারি! নারদ কহিলেন, হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি, তুমি তোমার স্বামীর দেহভার-পরিমিত স্বর্ণ দিতে পারিবে না, আমি শাস্ত্রানুসারে যাহা পাইয়াছি, তাহাই যথেষ্ট; স্বর্ণে আমার প্রয়োজন কি, একটি তল্পীদারের প্রয়োজন ছিল, তাহা বিধাতা মিলাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া নারদ কহিলেন, যদুপতে, এক্ষণে তল্পী মাথায় করিয়া আমার আশ্রমে চল, সুরম্য অট্টালিকায় বাস তোমার জন্মের মত ফুরাইয়াছে, এক্ষণে ফলমূল খাইয়া আমার আশ্রমে থাকিতে হইবে, যখন যাহা বলিব, তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে হইবে, না পারিলে দণ্ডাঘাতে অস্থি চূর্ণ করিয়া দিব। সত্যভামা ঠাকুরাণি, এই ব্রতের ফলে পরজন্মে তোমাকে আর সপত্নীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, তবে আমি চলিলাম। নারদ এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে "উঠ উঠ" বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলিন বদনে সত্যভামাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তবে এক্ষণে চলিলাম, তোমার জন্য আমাকে জন্মের মত সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া সত্যভামা রোদন করিয়া উঠিলেন। হঠাৎ সত্যভামার রোদনধ্বনি শুনিয়া রুক্মিণী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সপ্ত প্রধানা মহিষী সত্যভামার মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দেখিলেন, সত্যভামা দুই হস্তে নারদের চরণ ধরিয়া রোদন করিতেছেন। রুক্মিণী

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, দেবর্ষি এক কৌতুক আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? আপনার মস্তকে কে তণ্ডুল চাপাইয়া দিয়াছে, কেনই বা আপনি বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছেন? রুক্মিণীর কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার ব্রতের কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। রুক্মিণী ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, সত্যভামা ত জন্মের মত তোমাকে হারাইয়াছে, এক্ষণে আমি যদি তোমার সমপরিমাণে স্বর্ণ দিতে পারি, তাহা হইলে, তুমি আমার হইবে কি না? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সে কথার উত্তর আমি দিতে পারি না, দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা কর। নারদ কহিলেন, রুক্মিণী দেবি, এই লোকটিকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাঁর উপরে আমার দানবিক্রয়ের ক্ষমতা আছে, যদি তুমি উপযুক্ত মূল্যে ইহাকে ক্রয় করিতে পার, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে ইনি তোমারই হইবেন। রুক্মিণী কহিলেন, তবে ইহাঁকে পুনরায় তৌলদণ্ডে বসিতে বলুন, আমি স্বর্ণ আনিতেছি। এই কথা বলিয়া রুক্মিণী আপন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং সঙ্গোপনে একটি তুলসীপত্র হস্তে করিয়া তৌলদণ্ডের কাছে আসিয়া দাড়াইলেন। নারদ কহিলেন, আপনি স্বর্ণ আনিয়াছেন?—রুক্মিণী কহিলেন, আনিয়াছি;—এই কথা বলিয়া তৌলের অপরদিকে তুলসীপত্রটি অর্পণ করিবামাত্রই তৌলদণ্ডের উভয়দিক্ সমান হইয়া পড়িল। রুক্মিণী নারদকে কহিলেন, কেমন, এক্ষণে আপনি আপনার দানলব্ধ লোকের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন? নারদ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হাঁ যথেষ্ট পাইয়াছি;

এক্ষণে কৃষ্ণচন্দ্র তোমারই হইলেন। এই কথা বলিয়া দেবর্ষি তুলসীপত্র গ্রহণানন্তর প্রস্থান করিলেন।

এই গল্পটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নহে বলিয়া, এক্ষণকার শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার বিন্দুবিসর্গ বিশ্বাস করিবেন না, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি; কিন্তু প্রাচীন ঋষিরা অমূলক গল্পচ্ছলেও পুরাণাদিতে যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার সারাংশ অবশ্যই আমরা গ্রহণ করিব। বেদব্যাস, সত্যভামার যেরূপ চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, এক্ষণকার শিক্ষিত ও ধনাঢ্য লোকের অভিমানিনী সহধর্ম্মিণীদিগের সহিত তাহার অনেকাংশে ঐক্য হয়, এই জন্যই দর্প এবং অভিমানের চরমফল দর্শাইবার জন্য আমি এস্থলে ঐ পৌরাণিক গল্পের অবতারণা করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট মহিষীর মধ্যে সত্যভামা অত্যন্ত গর্ব্বিতা ছিলেন। যদিও তিনি অধুনাতন কামিনীগণের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে আপনার স্বামীকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাঁহার স্বামী একালের শিক্ষিত বাবুদিগের ন্যায় স্ত্রীর বশ্য ছিলেন না। তিনি সর্ব্বতোভাবে সত্যভামার সম্মান রক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন যে, দিন দিন তাঁহার দর্প ও অভিমান বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে এবং স্বামিদান করিয়া দানের পরাকাষ্ঠা দর্শাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন তিনি দেবর্ষির সহিত কৌশল করিয়া সেই দর্প, অভিমান ও দানশীলতার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিলেন। আধুনিক যে সকল স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বতোভাবে স্বামীকে আয়ত্ত করিয়াছেন, ক্রীতদাসের ন্যায় তাহাদিগকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তথাচ তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ

হয় না, স্বামীর সামান্য ত্রুটি হইলে অভিমানের পরিসীমা থাকে না, তাঁহারা যেন স্মরণ করিয়া রাখেন যে, দর্পহারী ভগবান্ অবশ্যই একদিন তাঁহাদিগের সেই দর্প চূর্ণ করিবেন।

এক্ষণে অতিদানের চরমফল কিরূপ হয়, নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। দানধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? কিন্তু "আত্ম রেখে ধর্ম্ম" ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। রাজা হরিশ্চন্দ্র, অগ্নিশর্ম্মা বিশ্বামিত্র ঋষিকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, অবশেষে দানের দক্ষিণা অপ্রতুল হইয়া পড়ে, সেই-জন্য তিনি স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া দানকার্য্যের দক্ষিণা দিয়াছিলেন এবং আপনি বারাণসীক্ষেত্রে যাইয়া দীর্ঘকাল শূকর চরাইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী এক ব্রাহ্মণগৃহে দাসীবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এরূপ দান করিয়া বর্ণনাতীত কষ্টভোগ করা কি ন্যায়-যুক্তি-ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়? কখনই নহে। পুরাণে কথিত আছে, দুর্য্যোধনের প্রিয়বন্ধু অঙ্গরাজ কর্ণ, সূর্য্যের ঔরসপুত্র, তিনি পিতার স্থানে অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই কবচ-কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকিলে বাণাঘাতেও তাঁহার শরীর অক্ষত থাকিত এবং সম্মুখযুদ্ধে কেহই তাঁহাকে পরাজয় বা বিনাশ করিতে পারিত না, এই কথা দেবরাজ ইন্দ্র অবগত হইয়া তাঁহার ঔরসপুত্র অর্জ্জুনের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণবেশে দাতাকর্ণের নিকট দান প্রার্থনা করিলেন। দানপ্রার্থী এক ব্রাহ্মণকে সমাগত দেখিয়া অঙ্গরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ, তুমি কি প্রার্থনা কর, যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। ছদ্মবেশী ইন্দ্র কহিলেন, আমাকে তোমার কবচ ও কুণ্ডল

অর্পণ কর। কর্ণ তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করিলেন। কিছুকাল পরে কুরুক্ষেত্রে ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ভীষ্মদেব কর্ণকে কহিলেন, রাধেয়, মহারথিগণের মধ্যে আমি তোমার নাম লিখিতে পারিলাম না, যেহেতু তুমি কবচ-কুণ্ডল-বিহীন হইয়া একেবারে ঐশ্বর্য্যরহিত হইয়াছ, সুতরাং তোমাকে অর্দ্ধরথীর মধ্যে গণ্য করা গেল। এই কথা শুনিয়া কর্ণের আর অভিমানের পরিসীমা রহিল না, তিনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি অস্ত্র ধারণ করিব না; ফলতঃ কার্য্যে তাহাই করিয়াছিলেন। ক্রমে ভীষ্ম ও দ্রোণ সমরশায়ী হইলে, কুরুরাজ কর্ণকেই সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সৈনাপত্য লাভ করিয়া একেবারে দর্পিত হইয়া উঠিলেন, রণস্থলে আত্মশ্লাঘা করিতে ক্রটি করেন নাই, কৃষ্ণার্জ্জুনকে বিনাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে যে নির্ব্বোধের ন্যায় আপনার প্রধান ঐশ্বর্য্য দান করিয়া একেবারে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল না। কর্ণ দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

এই বিষয় সত্য হউক বা মিথ্যাই হউক, কিম্বা এক্ষণকার শিক্ষিত সমাজ কবির কল্পনা বলিয়া অগ্রাহ্য করুন, পুরাণাদিতে উপদেশচ্ছলে বেদব্যাস যে সকল গল্পের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সারাংশ অবশ্যই আমরা মহা হিতকর বলিয়া জ্ঞান করিব। দম্ভ, অভিমান ও অতিদানের চরমফলের বিষয় যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা অপেক্ষাও উপরি-উক্ত তিনটি দোষের বিষম ফল ফলিতেছে।

অকারণ দম্ভ করিয়া এতদ্দেশীয় কতশত জমীদারের ঘর ছারখার হইয়া গিয়াছে। আপনার ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সকলের উপর দম্ভ করিতে গিয়া, অতি অল্প দিন হইল, নদীয়া জেলার একজন ব্রাহ্মণ জমীদার একবারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট আছে, তথাচ এখনও দর্প কমে নাই। অভিমান এদেশের যুবক যুবতীর পক্ষে এক সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কোন যুবতী স্ত্রীকে কার্য্যগতিকে স্বামী দুই চারিটা রূঢ়কথা বলিয়াছিলেন, সেই অভিমানে তিনি আত্মঘাতিনী হইলেন। কেহবা সহোদর ভ্রাতার দুই চারিটা রুক্ষ কথা সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোর অভিমানে গৃহত্যাগ করিলেন। যদিও তিনি কুলশীলে জলাঞ্জলি দিয়া স্বাতন্ত্র্যভাব অবলম্বন করিলেন, কিন্তু অভিমান তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই; এইজন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া এবং স্বাতন্ত্র্যভাব অবলম্বন করিয়াও কেবল এক ঘোর অভিমানের কারণ সুখী হইতে পারিলেন না। অবশেষে যে অভিমান বশতঃ কুলত্যাগ করিয়াছিলেন, পরের উপর সেই অভিমান করিয়া আত্মনাশ করিলেন। এই সহরের একজন যুবক ঢোলক তান্‌পুরা কিনিবার জন্য পিতার নিকট দশটি টাকা চাহিয়াছিলেন, তৎশ্রবণে পিতা পুত্রকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন, সে ভর্ৎসনা নাতিগর্ভা, অর্থাৎ তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "লেখাপড়ায় মনোযোগী হও, এই বয়সে ইয়ার হইও না"। যুবক এই ভর্ৎসনায় ঘোর অভিমানে মগ্ন হইলেন। মনের অভিলাষ পূর্ণ হইল না বলিয়া অনায়াসে আত্মনাশ করিয়া ফেলিলেন। এক্ষণকার

যুবক যুবতীরা সামান্য কথার ভর সহ্য করিতে পারেন না; কিন্তু এক অভিমানই যে শত শত নরনারীর মৃত্যুর কারণ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত হইবে, তাহা বলিতে পারি না।

অস্মদ্দেশীয় লোকের সন্তান-সন্ততিগণের বাল্যকাল হইতে প্রকৃত নীতি শিক্ষা করা হয় না। সন্তানসন্ততিগণকে কি প্রণালীতে শিক্ষা দিলে তাহারা নীতিমান্ হইবে, তাহা তাহাদিগের পিতা মাতা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখেন না। বাল্যকাল হইতেই পাঁচ জন সম্পন্ন লোকের সন্তানগণের ক্রীড়া, কৌতুক, আহার বা পরিচ্ছদ দেখিয়া শুনিয়া বালকগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বিলাস-লালসা আসিয়া উদিত হয়। বোধ কর, কোন নিঃস্ব লোকের সন্তান অপর একটি সম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানের পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহার পিতার নিকট সেইরূপ পরিচ্ছদের জন্য আব্দার আরম্ভ করিল। তাহার পিতা সে সময়ে ঐ বালকটিকে নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় সেই আব্দারটি সম্পূর্ণ অন্যায়, তাহার অবস্থার উপযোগী নহে এবং ঐরূপ বিলাসে মনুষ্যের কতদূর দুর্গতি দাঁড়াইতে পারে, সেই সকল বিশিষ্ট বিধানে বুঝাইয়া না দিয়া আপন পুত্রকে সেইরূপ পরিচ্ছদ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। হয় ত আপন প্রভুর তহবিল হইতে কিছু অর্থ লইয়া তৎপর দিবসেই সেইরূপ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। কালে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে করিতে সম্পন্ন লোকের সন্তানগণের ক্রীড়া, কৌতুক, আহার ও পরিচ্ছদ দেখিতে দেখিতে ঐ বালকের মনে ঐরূপ ভোগাভিলাষ

জন্মিতে লাগিল। সম্পন্ন লোকের সন্তানেরা বাটী হইতে পয়সা আনিয়া নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে; কখন কখন বা দোকানদারদিগের নিকট ঋণ করিয়া দ্রব্যসামগ্রী লয়, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ঐ নিঃস্বলোকের সন্তানটিও ঋণ করিয়া জিনিসপত্র লইতে লাগিল, ক্রমে দুই এক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া প্রতারণা ও মিথ্যা কথা কহিতে শিখিল, দোকানদার টাকা চাহিলে, আজ নহে কাল, কাল নহে পরশ্ব, এইরূপ প্রতারণাবাক্য বলিতে বাধ্য হইল। সেই সপ্তম বা অষ্টমবর্ষীয় বালক ঋণের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া উত্তমর্ণের ভয়ে তিন চারি দিবস বিদ্যালয়ে আসিল না। তাহার জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্কুলে যাইতে চাহ না কেন? পূর্ব্বেত তুমি ব্যগ্র হইয়া স্কুলে যাইতে, এখন এরূপ আরম্ভ করিয়াছ কেন?" ঐ বালকটি সুযোগ বুঝিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "গোপাল আমাকে মারিয়া বহি কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছে, সেই জন্য আমার স্কুলে যাইতে ভয় হয়।" জননী কহিলেন, "গোপাল তোমাকে কেন মারিবে, তুমি তাহার কি করিয়াছ?" বালক কহিল, "আমি তাহার দুই টাকা দামের একখানি বহি হারাইয়া ফেলিয়াছি।" জননী কহিলেন, "তজ্জন্য তোমার ভয় নাই; আমি তোমাকে কল্য দুইটি টাকা দিব, তুমি গোপালকে দিয়া বিবাদ মিটাইয়া ফেলিও, এরূপ আর কখন করিও না।" জননীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বালকের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। পরদিবস স্কুলে যাইবার সময় মাতার নিকট হইতে টাকা লইয়া প্রফুল্লচিত্তে স্কুলে যাইয়া দোকানদারের ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিল। সেই

দিন অবধি তাহার মনে মনে এইরূপ ধারণা হইল যে, আমি মাতার নিকট প্রবঞ্চনা করিয়া দুইটি টাকা আনিলাম, মাতা ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, পুনর্ব্বার যদি ঋণ করিয়া কিছু ক্রয় করি, তাহা হইলে আর একটা নূতন কৌশল করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব। প্রবঞ্চনা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হওয়ায়, অর্থাৎ যে ঋণের জ্বালায় বালকটি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ঋণ হইতে এককালে মুক্ত হওয়ায়, বালকের সুনীতির উপর আস্থা রহিল না; সে বিলক্ষণ বুঝিল যে, সুনীতি কেবল কথা মাত্র, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র ফল নাই। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে নানা বিলাস ভোগের অভিলাষ প্রবল হইয়া উঠিল। বিলাস-চরিতার্থতার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থের জন্যই তিনি সর্ব্বদা নীতিবহির্ভূত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

একজন ইউরোপীয় মহাপ্রাজ্ঞ পণ্ডিত কহিয়াছেন, Example is more efficacious than precept. ইদানীন্তন পঞ্চমবর্ষীয় বালককেও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে দেখা যায়; ইহার কারণ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও সহাধ্যায়িগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। সুকুমারমতি বালকগণ যেরূপ দেখিবে, সেইরূপ শিক্ষা করিবে, তাহাতে আর সংশয় কি? সভ্যতার প্রভাবে কি বালক কি যুবক কি বৃদ্ধ কাহারও নিম্নদৃষ্টি নাই, সকলেরই বিলাস, ক্রীড়া, কৌতুক, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতির দিকেই অধিক দৃষ্টি। কালপ্রভাবে মিথ্যা কথা বা প্রবঞ্চনা একটি দোষ বলিয়া ভ্রমেও

কেহ ধরে না। স্বচক্ষে দেখা গিয়াছে, কোন লোকের একটি সার্দ্ধদ্বিবর্ষীয় শিশুসন্তান তাহাদিগের দ্বারদেশে ভিক্ষুক আসিলেই চীৎকার শব্দে বলিয়া উঠিত, "ওগো। হবে না, হবে না—হাত যোড়া।" তাহার এইরূপ শিক্ষার কারণ, সেই শিশুর জননী কার্পণ্যপ্রযুক্ত ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে চাহিত না। ভিক্ষুক দ্বারদেশে আসিলেই স্ত্রীলোকটি ওগো এখন হবে না, হাত যোড়া, এইরূপ কহিত। শিশুটি দুই চারি দিবস জননীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মনোমধ্যে এক প্রকার অবধারিত করিয়া লইয়াছিল যে, ভিক্ষুক আসিলেই বুঝি ঐরূপ কথা বলিতে হয়। সেইরূপ কোন শিশু তাহার পিতাকে প্রত্যহ কাচপাত্রে সুরা ঢালিয়া খাইতে দেখিয়া আপনিও এক গেলাস জল লইয়া তাহার পিতার ন্যায় উপবিষ্ট হইত এবং জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিত, "মা দেখ দেখ, আমি বাবার মত মদ খাইতেছি।" বালকের সেই ভাব দেখিয়া সুরাসক্ত পিতা হাস্য করিয়া উঠিতেন। কেবল এক পিতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সেই বালক পূর্ণবয়স্ক হইতে না হইতেই সুরাপান আরম্ভ করিয়াছিল। এক দৃষ্টান্তই এতদ্দেশীয় যুবকগণের অধঃপতনের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। নীতি বলিতেছে, "সুরাপান করিও না," কিন্তু দৃষ্টান্ত চীৎকারশব্দে বলিতেছে, "দেখ সুরাসেবন করিয়া আমরা কিরূপ আমোদ আহ্লাদ করিতেছি।" যখন শত সহস্র লোক নীতির প্রতিকূলতাচরণ করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নানা আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিতেছে, তখন কেবল এক শুষ্ক কথার বশবর্ত্তী হইয়া কি জন্য এক ব্যক্তি আমোদ-

প্রমোদ হইতে বিরত থাকিবে। চাটুকার হইতে নীতিশাস্ত্রে পদে পদে নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণকার কালে বিনা-স্তবে কেহই প্রসন্ন হয়েন না; স্থতরাং সকলেই স্বার্থসাধনের জন্য ধনবান্ ও ক্ষমতাবান্ লোককে স্তব স্তুতি করিতে শিক্ষা করিয়াছে। যিনি চাটুবাক্য কহিতে ঘৃণা করেন, কোন কালেই তাঁহার স্বার্থসাধন হয় না। অন্য কি কথা, এক্ষণকার স্থসভ্য ইংরাজ জাতিরাও স্তবের বশ্য। একজন ঘোর মূর্খ অথচ শরীরে নানা দোষ আছে, এরূপ লোকও কেবল চাটুবাক্য দ্বারা আপনার প্রভুকে বিলক্ষণ আসক্ত করিয়া থাকে; পক্ষা-ন্তরে একজন কৃতবিদ্য লোক, যাঁহার শরীরে দোষের লেশ মাত্র নাই, কেবল এক নীতিশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চাটু-বাক্য কহিতে ঘৃণা করেন, তিনি, সেই কারণে, কোন কালেই প্রভুর প্রিয়পাত্র হইতে পারেন না। ঘোর মূর্খের উন্নতি দেখিয়া তাঁহাকে সময়ে সময়ে মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া সহ্য করিতে হয়। এই সকল কারণেই এক্ষণকার লোক চাটুকার হইয়া উঠিতেছে। ধনবান্ ও ক্ষমতাবান্ লোককে স্তব-স্তুতি করিবার সময়ে তাঁহারা নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কথা কহিতে পারেন না, যাহাতে প্রভু সন্তুষ্ট হন, অনর্গল তাহাই বলিয়া যান।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নীতির কোন ফল নাই বলিয়া লোকেরা একেবারে নীতিশাস্ত্রপ্রতিপালনে মনোযোগী হয় না। নীতি-শাস্ত্র পদে পদে মিথ্যা কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছে। একজন নব্য ব্যবসাদার সেই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া ব্যবসা কার্য্য আরম্ভ করিল। সেই নূতন ব্যবসাদারের

নিকট কেহ কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে আসিলে সে কহিত, আমি এই দ্রব্য দুই টাকা মণ ক্রয় করিয়াছি, ইহার উপর চারি আনা লাভ পাইলে বিক্রয় করিব। এক দিবস একজন ক্রেতা কহিলেন, "যথার্থ কথা কহ, নতুবা আমি অন্যত্র গমন করি।" নতন ব্যবসায়ী কহিল, "কি মহাশয়, এ কি কথা কহিতেছেন, আপনি কি আমার বাক্যে প্রত্যয় করিলেন না?" ক্রেতা কহিলেন, "হা তোমরা ত চিরকালই সত্য কথা কহিয়া থাক, ব্যবসা স্থলে আবার সত্য!" এই কথা কহিয়া অন্য বিপণীতে চলিয়া গেলেন। ক্রেতা পুনর্ব্বার যে বিপণীতে প্রবিষ্ট হইলেন, তথায় এক জন ঘোর প্রবঞ্চক বসিয়া রহিয়াছে; সে ক্রেতাকে যথেষ্ট আদর করিয়া বসাইল ও সবিনয়ে কহিল, "আপনার কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন আছে বলুন, আমরা সেরূপ দোকানদার নহি, আমরা ভদ্রলোককে চিনি, মহাশয়, এক মণ মাল বেচে, দুটো পয়সা পেলেই মাথায় হাত বুলুই, আপনি একবার লয়ে যান, যদি ভাল বোধ হয়, দশবার আসিবেন, ব্যবসা এক দিনের জন্য নহে।" ক্রেতা পূর্ব্বে যে দোকানদারের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রবঞ্চক মনে করিয়া প্রতারক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দ্রব্য তোমাদের কত করিয়া খরিদ পড়িয়াছে, আর ইহার উপর কতই বা ব্যবসা লইবে?" প্রতারক কহিল, "আজ্ঞা এ দ্রব্য আমার ছুই টাকা করিয়া মণ খরিদ আছে, ইহার উপর টাকার ঝাঁকে চারি পয়সা করিয়া ব্যবসা লইব।" ক্রেতা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, ভাবিলেন, যদি

পূর্ব্ব দোকানদারের নিকট এই দ্রব্য ক্রয় করিতাম, তাহা হইলে মণকরা তিন আনা ঠকিতে হইত। মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, এ দিকে প্রতারক দোকানদার কহিল, "মহাশয় আর ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন কি, আপনি ভদ্রলোক, আর পাঁচবার পাইব, এই জন্য আমি আরও দুই পয়সা লাভের অঙ্ক ছাড়িয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া সে আপনা হইতেই পাল্লা ঝুলাইয়া ক্রেতা যে দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ওজন করিয়া মোট বাঁধিয়া দিল, ক্রেতা দ্বিরুক্তি না করিয়া হিসাব মত মূল্য দিলেন এবং মুটের মাথায় মোট চাপাইয়া বাটী চলিয়া গেলেন।

পাঠকগণ! বুঝিতে পারিলেন, এস্থলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কিরূপ একটি চমৎকার ঘটনা ঘটিয়া গেল? দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাটী যাইবার সময় ক্রেতা ভাবিলেন, আমি অদ্য উচিত মূল্যে এই সামগ্রীটি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি; পূর্ব্বের দোকানদারের নিকট ক্রয় করিলে প্রতারিত হইতে হইত। এদিকে প্রতারক দোকান-দার ক্রেতাকে বিদায় করিয়া প্রফুল্লচিত্তে আপন আসনে আসিয়া বসিল, কেন না, সে ওজন করিয়া দিবার সময় ক্রেতাকে মন্দ সামগ্রী ও তিন সের দ্রব্য কম দিয়াছে। পূর্ব্বকথিত নিরপেক্ষ দোকানদার আপনার দোকানে বসিয়া তাহার সহযোগীর সমস্ত কার্য্য বিশেষ মনোঃ-যোগের সহিত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। সে মনে মনে কহিল, আমি ভদ্র লোকটিকে যথার্থ কথা কহিলাম, তাহাতে তিনি আমার কথায় কিছুমাত্র প্রত্যয় করিলেন না, আমার

প্রতারক সহযোগী অনায়াসে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভ করিল, তিনিও সহাস্যে তাহা লইয়া গেলেন। সহযোগী কম বাট্‌খারায় তাঁহাকে ওজন দিল, তাহা আমি স্বচক্ষে বসিয়া দেখিলাম, বিশেষতঃ ক্রেতা যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহা অপেক্ষা আমার দোকানের দ্রব্য অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, তাহাও তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না। তবে ত সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসা কার্য্য করিতে গেলে আমার কোন অংশেই মঙ্গল হইবে না। আমি আজ সপ্তাহকাল দোকান খুলিয়া বসিয়াছি, ইহার মধ্যে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলাম না, আমার প্রতারক সহযোগী প্রত্যহ শত মণের অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন। তবেই বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, কালের উচিত কার্য্য না করিলে, ব্যবসাকার্য্যে সুপ্রতুল হইবে না। সুতরাং দশ জনের দেখিয়া শুনিয়া কেবল এক স্বার্থের অনুরোধে সেই সজ্জন ব্যক্তিও ক্রমে ক্রমে মিথ্যা-বাদী ও প্রতারক হইয়া উঠিল।

যাঁহার নীতিগর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিলে, অসৎ ব্যক্তিরও সৎপথের পথিক হইতে ইচ্ছা হয়, এমন কোন মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং সুপথাবলম্বী ছিলেন না। তাহার অসদাচরণ দেখিয়া একটি যুবক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাত্মন্! আপনার ন্যায় সদুপদেষ্টা এক্ষণকার কালে আর দ্বিতীয় নাই। আপনার বিরচিত দুইটি মাত্র নীতিগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অসৎকার্য্যে আমার জন্মের মত ঘৃণা জন্মিয়াছে; আমার মনে যখনই কুচিন্তার আবির্ভাব হয়, তখনই আমি আপনার

সেই সারগর্ভ প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করিতে আরম্ভ করি। সেই প্রবন্ধগুলির এরূপ মাহাত্ম্য যে, তাহার কিয়দংশ পাঠ করিলেই আমার মন একেবারে নির্ম্মল হইয়া যায়। এক্ষণে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, কৃপা করিয়া আমাকে তাহার উচিত উত্তর প্রদান করিতে হইবে। আমার প্রস্তাবটি এই,—যে ব্যক্তির বিরচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া শত শত অসৎলোক সৎপথের পথিক হইতেছে ও হইয়াছে, সে ব্যক্তি অন্যকে যেরূপ উপদেশ দেন, আপনি তাহা করিতে পারেন না কেন? উক্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হাস্য করিয়া কহিলেন, Do what I say but do not do what I do. আমি যাহা বলি, তাহাই করিও, যাহা করি, তাহা করিও না। এরূপ কথা উন্নতমনা ব্যক্তির মুখ হইতে কেন নির্গত হইয়াছিল, ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। কারণ, যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই অধিক ফলপ্রদ, তখন উপদেষ্টার অন্যায় আচরণ দেখিলে, তাঁহার ছাত্রেরা কেন না তাঁহার অনুসরণ করিবে। এক দৃষ্টান্তই আমাদিগের দেশের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণকার বালকবৃন্দ অল্প বয়সেই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয় ও নীতিগর্ভ গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে। কথিত আছে যে, বাল্যকালের সংস্কার পাষাণে রেখার ন্যায় হইয়া থাকে, কোন কালেই তাহা বিলুপ্ত হয় না। তবে কেন অস্মদ্দেশীয় যুবকবৃন্দ অর্থের মুখ দেখিয়াই বাল্যসংস্কার বিস্মৃত হইয়া যান? ইহার উত্তর কেবল এক দৃষ্টান্ত দর্শন ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না। লোকে যাহা

দেখিবে, সর্ব্বতোভাবে না হউক, কিয়ৎপরিমাণেও তাহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়গণ চিরকালই অনুকরণের দাস।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, কেবল এক অভাবই লোককে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করাইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বতোভাবে না হউক, কিয়ৎপরিমাণে সত্য বলিলেও বলিতে পারা যায়। কিন্তু পুনর্ব্বার দেখিতে হইবে যে, কোন্ অভাব মনুজ-কুলকে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করায়—প্রাকৃতিক অভাব না কৃত্রিম অভাব? যে অভাবে শরীররক্ষা হয় না ও দারাপুত্রপরিবারের প্রাণ রক্ষা হয় না, তাহাকেই প্রাকৃতিক অভাব কহে। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইলে ভোজন-পান করিতে হইবেই হইবে, তজ্জন্য অনেক লোকই সময়ে সময়ে ধর্ম্ম ও নীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমার একজন কৃতবিদ্য পরিচিত যুবক ত্রিকোণমিতি সম্পর্কীয় জরিপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মাসিক দুইশত টাকা বেতন পাই-তেন। বাল্যকালে তাঁহার স্বধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, আহ্নিক পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। সেই যুবক যখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে তিন চারি জন সহযোগী ইউরোপীয়ের সহিত জরিপ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন তিন চারি মাস কাল তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল না, তাঁহাকে উদয়াস্তকাল পাহাড় পর্ব্বতের উপর জরিপ করিয়া বেড়া-ইতে হইত। সেই সকল স্থানে আহারাদির কোন সুবিধাই ঘটিয়া উঠিত না, সুতরাং সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়া আহারাদি করিতে হইত। এই-

জন্য অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গেল। তাঁহাকে দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেখিয়া তাঁহার ইউরোপীয় বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন, তুমি কি জন্য আপনার প্রাণ নাশ করিতে বসিয়াছ, দেখ, আমরাও তোমার সহিত সমান পরিশ্রম করিয়া থাকি, কিন্তু রুটি, জল ও ডিম্ব প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে রাখি বলিয়া তোমার ন্যায় আমরা জরিপ কার্য্যে কষ্ট অনুভব করি না ও আমাদিগের শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে না। যদি তুমি কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সহিত আহার করিতে আরম্ভ কর, তবেই মঙ্গল, নতুবা তোমাকে অতি অল্প কালের মধ্যেই এ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি বন্ধুবর্গের সদুপদেশে নিতান্ত অবহেলা না করিয়া দিন কতক সন্দেশ মিঠাই লইয়া জরিপ করিতে যাইতেন, আহ্নিক পূজা করিবার আর অবসর হইত না। কালে স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার ইউরোপীয় বন্ধুগণের সহিত আহার করিতেও হইয়াছিল। যদিও সেই যুবক কেবল একটি বিষয় কার্য্যের অনুরোধে ধর্ম্মনীতির অবমাননা করিয়া ম্লেচ্ছের সহিত ভোজন পান করিয়াছিলেন, তথাচ আমরা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে দোষী করিতে পারি না, কেন না, পুরাণাদি-শাস্ত্র-পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সময়ে সময়ে যোগী ঋষিরাও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া নীচ লোকের আশ্রমে অতিথি হইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

প্রাকৃতিক অভাবের জন্য নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে অতি অল্প লোককেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সামান্য-

রূপ গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট; পর্ণকুটীরেও বাস করিতে কষ্টবোধ করেন না; তাঁহাদিগের অন্নবস্ত্রের অভাব হইলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও সে অভাব মোচন করেন, তথাচ চৌর্য্য বা প্রতারণা দ্বারা উদর পূরণ করিবার চেষ্টা দেখেন না। শতবৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় ভিক্ষোপজীবী লোকেরাও সাধু ব্যবহারে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও সামান্য বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেন, তথাচ তাঁহারা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা দেখিতেন না। তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততিরাও গুরুজনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সামান্য অবস্থাতে পরিতুষ্ট থাকিতেন। ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তাঁহারা ধর্ম্ম ও কুল-মর্য্যাদার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিতেন। পণ্ডিতমণ্ডলীকে তৎকালের রাজাধিরাজগণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃত্তি দিয়া কহিতেন, আপনারা এই বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া দিনপাত করুন এবং প্রজাগণকে সদুপদেশ দিয়া আমাদিগের রাজ্য রক্ষা করুন, কারণ, আপনারা পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের লোকই আপনাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ আপনারা যে পথে চলিবেন, তাহারাও সেই পথে চলিবেক। আপনারা যদি কাম, ক্রোধ ও লোভাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে প্রজার কথা দূরে থাকুক, ভূস্বামিগণেরও আর ধর্ম্মজ্ঞান থাকিবে না। পূর্ব্বকালে রাজা, আমির ওমরাহগণ ও অধিকাংশ প্রজাগণের রীতি নীতি ও ব্যবহার ভাল

ছিল বলিয়া সাধারণে নীতিবহির্ভূত কার্য্য করিতে সাহস করিত না।

কোন কোন সময়ে আমরা এক একটি কুপ্রবৃত্তির এত-দূর বশীভূত হইয়া পড়ি যে, সুনীতির বশবর্ত্তী হইয়া চলা দূরে থাকুক, সৎলোকের উপদেশও তৎকালে আমাদিগের শ্রুতিকঠোর হয়। নীতিজ্ঞেরা সামান্য কথায় বলিয়া গিয়াছেন, "বিপৎকালে প্রাচীন ও বিজ্ঞ লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিও, তাহা হইলে বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে।" পাঠকগণ! বোধ করুন, কোন একজন সুরা-পায়ী, আপনার সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া, উত্তমর্ণগণের তাড়নায় জর্জ্জরীভূত হইয়াছেন। তিনি এক দিবস মনে মনে ভাবিলেন যে, লোকে কথায় বলে, বিপৎ-কালে বিজ্ঞলোকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত; অতএব আমি এক্ষণে একজন বিজ্ঞ লোকের নিকট যাইব। যখন এইরূপ চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল, তখন তিনি এইরূপ ভাবিলেন যে, বৃদ্ধের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিলে আমার সকল দিক্ রক্ষা হইবে, মদ খাইতেও পাইব এবং মহাজনদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিও পাইতে পারিব। এই-রূপ চিন্তা করিয়া পল্লীস্থ একজন সদাশয় লোকের নিকট যাইয়া আপনার আদ্যোপান্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণন করি-লেন। বৃদ্ধ তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিবেচনার পর কহিলেন,—"জান বাপু! সুরা ও কামিনী সংসারের সর্ব্ব অনিষ্টের মূল। তুমি দীর্ঘকাল সুরাসেবন-রত ও বেশ্যা-পরা-য়ণ হইয়াছিলে। যাহা আমি বলিতেছি, যদিও সেটি তোমার

পক্ষে এক্ষণে কঠিন কার্য্য; কিন্তু যদি রক্ষা পাইতে চাহ, তাহা হইলে সুরা ও বেশ্যা এ দুই এ জন্মের মত পরিত্যাগ কর, যে সমুদয় বিষয় বৈভব বন্দক দিয়াছ, তৎসমুদয় বিক্রয় করিয়া উত্তমর্ণগণের ঋণ পরিশোধ কর, ঋণ পরিশোধ দিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই মূলধন করিয়া একটি সামান্য-রূপ ব্যবসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, যদি তাহাতে সাহস না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাবস্থা একেবারে বিস্মৃত হইয়া, কোন বন্ধু বান্ধবের সহায়তায় একটি চাকরি অনুসন্ধান করিয়া লও, রীতিমত পরিশ্রম করিয়া ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া সেই চাকরির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া দিনপাত কর, ঈশ্বর অনুকূল হইলে পুনর্ব্বার অবস্থা উন্নত হইবে; কিন্তু সাবধান, আর কখন অসৎপথে পদার্পণ করিও না।” বৃদ্ধের এই পরামর্শ শুনিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি মনে মনে ভাবিল, ভাল লোকের কাছে পরামর্শ লইতে আসিয়াছি; ওঁর মতে কার্য্য করিলে বেশ যশ পৌরুষ হইবে। আমি অমুকের পুত্র, পুরুষানু-ক্রমে কখন কেহ পরের দাসত্ব করে নাই, বড় বাড়ীখানায় আছি বলিয়া এখনও লোকে মান্য করিয়া কথা কয়, যদি ভিটে বেচে একটা সামান্য বাড়ীতে গিয়া থাকি, তাহলে কি আর মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে! কি কথাই বল্লেন, “সুরা আর নিতম্বিনী সর্ব্ব অনিষ্টের মূল।” যদি মদই খেতে পেলেম্ না, আর প্রাণের প্রতিমাকেই বিসর্জ্জন দিলেম, তা হলে আর বেঁচে থাকায় সুখ!—“বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং” যে বলে, সে পাগল। বুড়োরা কি ভাল মন্দ বুঝ্‌তে পারে! ওঁরা না কি বুড়ো হয়ে সকল বিষয়ে বঞ্চিত হয়েচেন, সেই

জন্য পৃথিবী শুদ্ধ লোককে ওঁদের মত হতে বলেন। আমি ভেবেছিলেম যে, হয় ত প্রাচীন লোকটা এমন একটা উপায় বের কর্‌বে, যাতে মহাজনদের টাকাগুলো ওড়াতে পার্‌বো; বৃদ্ধ পরামর্শ দিলেন কি না, বাড়ী বেচে ঋণ পরিশোধ কর। আঃ কি বুদ্ধিই দিলেন!

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি বৃদ্ধকে কহিল,—"আচ্ছা মহাশয়, বিবেচনা করিয়া দেখি, আমি আপনার নিকট আর এক দিবস আসিব।" এই কথা বলিয়া তিনি বিষণ্ণবদনে বাটী প্রস্থান করিলেন। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, পূর্ব্বকথিত নীতিগর্ভ মহাবাক্যের বিধানানুসারী বৃদ্ধ সমাগত ব্যক্তিকে সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন কি না? তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলে ঐ বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির উপকার হইত কি না? "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং," এই মহাবাক্য অবশ্য সারগর্ভ, তাহাতে আর সংশয় নাই। বৃদ্ধও সমাগত ব্যক্তিকে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী উত্তম পরামর্শই দিয়াছিলেন; কিন্তু সে পরামর্শ ঐ সমাগত সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির হৃদয়গ্রাহী হইল না; কারণ, যে যাহা ভাবিতে পারে না, সে সে বিষয় কি প্রকারে কার্য্যে পরিণত করিবে? সে ব্যক্তি আজন্মকাল অসৎপথের পথিক, একদিনের জন্যও সৎপথে প্রবৃত্ত হয় নাই, কেবল দিনযামিনী সঞ্চিতার্থ নষ্ট করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিয়া থাকিত; অতএব তাহার সেই অতুলানন্দ হইতে এককালে নিরানন্দ হওয়ার—সেই ঘোর কুপ্রবৃত্তি হইতে এককালে নিবৃত্তি হওয়ার—সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। সে কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছে,

এ সময়ে কি তাহার কর্ণে বৃদ্ধের নীতিগর্ভ কথা ভাল শুনাইতে পারে? সে যদি কুপ্রবৃত্তির উপক্রমেই পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিত, তাহা হইলে, বৃদ্ধের সারগর্ভ কথা সে একেবারে অগ্রাহ্য করিত না। পতনোন্মুখ প্রকাণ্ড মহীরুহকে কি এক বংশের ঠেকা দিয়া রাখা যায়?—কখনই নহে। যে ব্যক্তির পতনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, সে কি আর নীতিগর্ভ কথায় কর্ণপাত করে? এক্ষণে ঐ সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির এক মৃত্যু ব্যতিরেকে আর চিত্তসংশোধনের উপায়ান্তর নাই। যখন মরিবে, তখনই সংসারের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিস্তার লাভ করিবে। ঈদৃশী অবস্থায় যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন ধৈর্য্যের সহিত সংসারে উগ্রতাপ সহ্য করিবে, তথাপি চৈতন্য হইবে না।

দৃষ্টান্ত অনুকরণের প্রথা চিরকালই প্রচলিত আছে। পুরাকালে যৌবনে বিদ্যার্জ্জন, মধ্যসময়ে বিষয়ভোগ ও শেষদশায় তপস্যাচরণ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া, সকলেই সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিত। এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি যার পর নাই লোভের বশবর্ত্তী হইয়াছে। সেই লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য চাটুকার হইয়া পড়িয়াছে। যে জাতি কোন কালে বিলাসী ছিলেন না, কালপ্রভাবে তাঁহারাও বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন। যেখানে বিলাস প্রবিষ্ট হইবে, সেই স্থানেই অধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্ হইয়া দাঁড়াইবে। বিলাসের এক প্রধান সহচর অভাব। যখন প্রতিক্ষণেই আমরা অভাব দেখিতেছি এবং সেই অভাব মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছি, তখন আর কিরূপে সুনীতি প্রতিপালন

করা যাইবে? অভাবের সঙ্কোচ করিয়া আন, তাহা হইলে বিলাস আর তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। বিলাসের অভাব হইলেই ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য বুঝিতে পারিবে, কুনীতি ও সুনীতির প্রভেদ অনুভব করিতে পারিবে। এই যে সমু্‌দ্র ভূমণ্ডলেই মধ্যে মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া এক একটি অঞ্চল ছার খার করিয়া যাইতেছে, ইহার মূল কারণ, বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইতিহাসাদি পাঠে অনুভব হয় যে, ভিন্ন দেশের বিষয় বিভব লুণ্ঠন করিব, উর্ব্বরা ভূমি আয়ত্তে আনিব ও আত্মীয়-বান্ধবগণকে উন্নত করিয়া তুলিব, স্বদেশের ও স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিব, এই সকল কারণেই রাজায় রাজায় যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হয়। উর্ব্বর ক্ষেত্র ভারতবর্ষকে আপনাদিগের অধীন করিবার জন্য কতশত সম্রাট্ সমূলে নিপতিত হইয়াছেন। কোটী কোটী লোকের প্রাণান্ত হইয়াছে, তথাচ এক্ষণকার বলবান্ ভূস্বামিগণ ভারতের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সম্রাট্‌গণের বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য এই উর্ব্বর ক্ষেত্র ভারতবর্ষের প্রজাপুঞ্জকে দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে। রাজ্যভোগ করিব বলিয়া, সর্ব্বতোভাবে মনের অভিলাষ পূর্ণ করিব বলিয়া, ভূপালেরা না করিয়াছেন এমত কার্য্য নাই। সহোদরভ্রাতৃবর্গের নয়নোৎপাটন করা, বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করা, নিতান্ত আত্মীয়গণকে কৌশলে বিনষ্ট করা, কিসের জন্য হইয়াছিল? মুসলমান ধর্ম্মে কি নীতি নাই? যবনজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তারা কি পরস্বহরণ, পরস্ত্রীহরণ ও পরপীড়নকে ঘৃণিত পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই? যবন

ভূপালদিগের মধ্যে কি একজনও শাস্ত্রদর্শী লোক ছিলেন না ? তবে তাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের পদে পদে অবমাননা করিয়াছিলেন কেন ? ইহার প্রকৃত কারণই এই যে, যবন রাজ-কুমারেরা যেরূপ দেখিতেন, সেইরূপই শিখিতেন। যবনজাতি যেরূপ বিলাসী, সেরূপ আর কোন দেশে কোন রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সকল বিলাস চরিতার্থ করিতে গিয়া তাহাদিগকে পদে পদে নীতি-বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইত। "আপনার ন্যায় সকলকে দেখিও, দুর্ব্বলের প্রতি দয়া করিও," এ কথা কোন্ ভাষার কোন্ শাস্ত্রে না লিখিত আছে। পরের প্রতি দয়া করা দূরে থাকুক, কোন কোন যবন সম্রাট্ আপনার সহোদরের প্রতি, আপনার জনকের প্রতি, অন্য কি কথা, আপন গর্ব্ভধারিণী জননীর প্রতিও নীতিশাস্ত্রানুয়ায়ী ব্যবহার করিতে পারিতেন না কেন ? তাঁহাদের সহোদরের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারের কারণ কি ? পাছে সে যৌবনে বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করে, তাহা হইলে তাঁহার মনের ভোগাভিলাষ পূর্ণ হইবে না, ইন্দ্রালয়-তুল্য দিল্লীর রাজপ্রাসাদে শত শত সুরূপা কামিনী লইয়া ক্রীড়া কৌতুক করা হইবে না, আপনার নশ্বর শরীরকে মণি-মুক্তায় বিভূষিত করা হইবে না ; সহোদর যখন এই সকল ভোগ-বিলাসের প্রতিবাদী, তখন তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতে যে নীতিশাস্ত্র বিরোধী হইতেছে, সে নীতির সম্মান আমি কি প্রকারে রাখিব ? পিতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কিন্তু

কি করি, পিতাকে কারারুদ্ধ না করিলে আমার ত সাম্রাজ্য-ভোগের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না; নীতির বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে এই সময়ে কোন মতেই সম্পূর্ণ আমোদ আহ্লাদ হইবে না; মনের মানস পূর্ণ হইবে না। নীতি যখন পদে পদে আমাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছার অনুযায়ী কার্য্য করিতে নিষেধ করে, তখন সে নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কে চলিবে? অতএব বোধ হয়, এই জন্যই যবন সম্রাটেরা ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতি প্রতিপালন করিতে না পারিয়া মনের সুখে বিলাস ভোগ করিতেন।

ইহ সংসারে ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে সর্ব্বতোভাবে নীতির বশ্য হইয়া কোন ক্রমেই চলিতে পারা যায় না। বিলাসপূর্ণ সংসারে কেবল এক সত্যের অনুরোধে এবং ধর্ম্মের অনুরোধে ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহই সে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন না। আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, উন্নত শিক্ষায় লোকের চিত্তশুদ্ধি হয় না, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও সময়ে সময়ে ভোগাভিলাষ বশতঃ নীতির মস্তকে পদার্পণ করিয়াছেন। শিক্ষিত লোক মাত্রেরই অবিদিত নাই যে, বিশ্ববিজয়ী বীরচূড়ামণি আলেক্‌জাণ্ডার যখন পরলোকগত হইলেন, তখন অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন তাহার চারিজন সেনাপতি পরস্পর বিরোধ করিয়া আলেক্‌জাণ্ডারের সাম্রাজ্য একেবারে ছারখার করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা চারিজনেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, তথাচ সামঞ্জস্যভাবে চারিজনে রাজ্যভোগ করিতে পারিলেন না। আমি রাজা হইব, তোমরা তিনজন আমার অধীন হও, এইমাত্র কলহের

কারণ। একথা কেহই প্রস্তাব করিলেন না যে, আইস, আমরা চারিজনে এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লইব ও যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে চারিজনে মিলিত হইয়া শত্রুদলন করিব। আমি সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইব, আমি সংসারের সমস্ত সুখ ভোগ করিব; আমার তুল্য আর দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকিবে না, এই অভিলাষই সত্যপথরোধের এক মাত্র কারণ হইয়াছে। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ব্যতিরেকে নরের অভিলাষ সিদ্ধ হইবার উপায় না থাকাতেই সর্ব্বসাধারণই সত্যপথ পরিত্যাগ করিয়াছে, নীতিকে কথার কথা বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণকার কালে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কেহই আপনার চরিত্র সংশোধন করেন না। কারণ, নীতি আমাদিগের স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধী। যদি কিয়ৎ পরিমাণেও সত্যের আদর থাকিত, তাহা হইলে নীতিশাস্ত্রের এতদূর অবমাননা হইত না। যাঁহারা বিষয়কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা যদি সত্যপথে বিচরণ করেন, প্রাণান্তেও নীতি-বহির্ভূত কার্য্য না করেন, তাহা হইলে অচিরকাল-মধ্যেই বিষম বিপদে পতিত হইবেন। প্রত্যক্ষ দেখা যাই-তেছে যে, কিছুকাল পূর্ব্বে যে সকল লোক সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেন, তাঁহারাই পুলীসাধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া নরাধমের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কি ইচ্ছাপূর্ব্বক অধার্ম্মিক হইয়াছেন?—না, তাঁহারা রাজবিধির বাধ্য হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা এবং পরপীড়ন শিক্ষা করিয়াছেন। সত্যের সহিত কার্য্য করিতে গেলে, পুলীসকর্ম্মচারীকে অতি অল্পদিনের মধ্যেই কর্ম্মচ্যুত হইতে হয়, তাহার কারণ

এই যে, যদি একজন উপরওলা তাঁহার অধীনস্থ থানায় অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন হে, তুমি সমস্ত রাত্রি রোঁদগস্ত করিয়া বেড়াইয়াছ? ইন্‌স্পেক্টর অম্লানবদনে বলিবেন, হাঁ; আমি সমস্ত রাত্রি আপন এলাকার পরিদর্শন করিয়া এই প্রত্যুষে আসিয়া শয়ন করিয়াছি। প্রত্যহ অবিচ্ছেদে সমস্ত রাত্রি রোঁদগস্ত করিয়া বেড়ান, মনুষ্যের সাধ্য নহে, তথাচ এ নিয়মের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হইলে, রাজ-নিয়মানুসারে পুলীস-কর্ম্মচারীকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদিগকে মিথ্যা কথা কহিয়া আপনাদিগের শরীর রক্ষা করিতে হয়, দশটি মিথ্যা কথা কহিয়া উপরওলা হাকিমের চিত্তবিনোদন করিতে হয়। কেবল পুলীস অধিকার কেন, অধুনা যিনি দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই সত্য কথাকে সংহারমুদ্রা দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ সম্প্রতি দাস্যবৃত্তি লোকের প্রধান উপজীবিকা, সহস্রের মধ্যে একজন পৈতৃক বিষয়বিভবের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আমার কোন বন্ধু মুক্তকণ্ঠে গল্প করিলেন যে, আমার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, মনে মনে ভাবিলাম, যদি সত্য কথা বলিয়া প্রভুর নিকট এক দিবসের অবসর লইতে চাহি, তাহা হইলে, প্রভু তিরস্কার করিয়া বিদায় করিবেন, সুতরাং পীড়ার ভাণ করিয়া একখানি ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠাইয়া দিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিলাম। সত্য কথা কহিলে এক দিনের জন্যও অবসর পাইতাম না, প্রবঞ্চনা করিয়া অনায়াসে তিন দিবস বাটী বসিয়া রহিলাম।

যেখানে সত্যের আদর নাই, নীতির আদর নাই, প্রতারণা প্রবঞ্চনা উপজীবিকার ব্রহ্ম-অস্ত্র হইয়াছে, সেখানে সত্যের ও নীতির জন্য কে আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে চাহিবে?

এক স্বার্থের জন্যই পৃথিবীনিবাসী নরনারী সত্যকে পরিত্যাগ করিয়াছে; কেবল বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কলহ প্রভৃতি নীতিবহির্ভূত কার্য্য করিতেছে। যাহারা বাল্যকালাবধি কেবল বিলাস ভোগ করিতেছে, যখন যাহা মনে করিতেছে, তাহাই সম্পাদিত হইতেছে, প্রকৃত অভাব কাহাকে বলে, তাহা কোনও কালে জানে না, তাহারা কি কৃত্রিম অভাব বৃদ্ধি না করিয়া থাকিতে পারে? যেখানে কৃত্রিম অভাবের আধিক্য, সেই স্থানেই সত্যের অবমাননা ও নীতির অবহেলা। যাহারা কেবল আত্মসুখে উন্মত্ত, আত্মসুখ ব্যতিরেকে আর কিছুই চিন্তা করিতে শিক্ষা করে নাই, তাহারা কি নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে পারে? কেবল আত্মস্বার্থের জন্য, অলীক আমোদের জন্য, আপনার নামের জন্য, অন্য কি কথা, বাহাদুরী দেখাইবার জন্যও, লোকে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে। পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, "অহিংসা পরম ধর্ম্ম", ইহার সকল শাস্ত্রেই উল্লেখ আছে, তথাপি কতকগুলি বলবান্ মূর্খ যুবকেরা দেবীপূজা উপলক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষের একাঘাতে শিরশ্ছেদন করিয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। যদিও তাহাদিগের সেই কার্য্যে এক বাহাদুরী দেখান ব্যতীত আর কিছুই লাভ নাই, তথাপি এই নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে

তাহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহে। যখন বিনা লাভে লোকে নীতিবহির্ভূত কার্য্য করিতে ক্ষান্ত নহে, তখন স্বার্থের জন্য কতদূর করিতে পারে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

কোন বিষয়ে বিমোহিত না হইলে আমরা স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারি না। যদি সত্যের প্রখর জ্যোতি দেখিয়া আমাদিগের মন আর্দ্র হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই সত্যের জন্য আমরা সর্ব্বত্যাগী হইতে পারি, ইহার শত শত প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমি একজনকে ভাল বাসিব না, দশজনে অনুরোধ করিয়া আমাকে সে ব্যক্তিকে কখন ভাল বাসাইতে পারিবে না। নিতান্ত অনুরোধে পড়িলে আমি মুখে বলিতে পারি যে, হাঁ, আমি অমুককে ভাল বাসিলাম; কিন্তু অন্তরের সহিত তাহা কখনই পারিব না। যতক্ষণ না আমি এক ব্যক্তির গুণে মুগ্ধ হইব, ততক্ষণ আমি কখনই তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে পারিব না। কখন কখন লোকে রূপে মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। যদি কেহ কখন কাহারও গুণে মুগ্ধ হয়, তাহা হইলে সে প্রেম কখনই বিলুপ্ত হয় না। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক জন এক এক ব্যক্তির গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিই তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। দেখ, যে ব্যক্তি সত্যের জন্য, কি নীতির জন্য একটি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে না, সেই ব্যক্তিই কোন গণিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া ধন মান অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছে। যদি কেহ সত্যের আশ্রয় লইতে চাহ, সুনীতির

পথে পরিভ্রমণ করিতে চাহ, তাহা হইলে, অগ্রে সেই সত্যকে ও নীতিকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাস। সত্য এবং নীতির প্রকৃত গুণ অনুসন্ধান করিয়া সেই গুণে মনকে মুগ্ধ কর, তাহা হইলেই সেই সত্যের অনুরোধে অনায়াসে সর্ব্ব-ত্যাগী হইতে পারিবে।

শিক্ষা এবং শিক্ষার ন্যায্য ও অন্যায্য ব্যবহার।

যে বিষয় জানি না, সেই বিষয়ের যিনি বোধ জন্মাইয়া দেন, তাঁহাকে গুরু বা শিক্ষাদাতা কহে; ও যে বিষয়ের যে বোধ জন্মে, তাহাকে সেই বিষয়ের শিক্ষা কহে। বাহ্যজগৎ হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাও একপ্রকার শিক্ষা। ন্যায়যুক্তি-প্রয়োগ ও ধর্ম্মরক্ষা করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার যে উপদেশ, তাহাই সৎশিক্ষা ও তাহার বৈপরীত্যই অসৎ শিক্ষা। বিদ্যা চৌষট্টি প্রকার, অর্থাৎ চৌষট্টি রকম বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। পূর্ব্বকালের নরপতিগণ শিক্ষার জন্য আপনাপন সন্তানগণকে অতি অল্প বয়সেই সদ্‌গুরুর গৃহে প্রেরণ করিতেন। তৎকালের গুরুগণ প্রায় সর্ব্ববিধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারদর্শী ছিলেন। শিষ্য গুরুগৃহে উপস্থিত হইলে শিক্ষাগুরু প্রথমতঃ তাঁহাকে রীতি ও ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, অর্থাৎ ছাত্রকে প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানের পর অদ্যকার দিবস নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিতে পারি, এই কামনায় ঈশ্বরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক হস্তমুখপ্রক্ষালনান্তে গুরু-পত্নীকে প্রণাম করিয়া অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে শিক্ষা দিতেন। দশবৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালকগণের প্রাতঃ-স্নান নিষিদ্ধ ছিল। ঐ সকল বালক প্রাতঃকৃত্যসমাপনান্তে গুরুর পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত হইত; কেহবা গুরুর পদ-

প্রক্ষালনের জন্য জল রাখিত, কেহ বা যে স্থানে গুরু আসিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাদি করিবেন, সেই স্থান ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া কুশাসন পাতিয়া রাখিত, কেহ বা হোমের কাষ্ঠ-গুলি কুণ্ডের পার্শ্বে আনিয়া রাশি করিত, কেহ কেহ আশ্রমপালিত পশুপক্ষীগুলিকে কুটীরের বাহিরে আনিয়া যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া দিত, কেহ বা তাহাদিগের জন্য তৃণপত্র আহরণ করিত। গুরু, ছাত্রেরা কে কি ভাবে কার্য্য করিতেছে, কে কতদূর মনোযোগের সহিত গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান রাখিতেন; এবং এইরূপে তাহাদিগের গুরুভক্তি, আজ্ঞাপ্রতিপালন, কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ ও ধৈর্য্য প্রভৃতি দেখিয়া উপযুক্ত সময়ে ককারাদি চৌত্রিশ বর্ণ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিতেন। যে বালক মেধাবী, সে এক দিবসেই শিক্ষা করিত, কেহ বা তৎপরদিবস শিক্ষা করিতে পারিত, কাহারও বা দুই এক দিবস বিলম্ব হইত। এইরূপ তাহাদিগের কার্য্য দেখিয়া গুরু বুঝিয়া লইতেন যে, কোনটির স্মরণশক্তি অধিক, কোনটার যদিও তাদৃশ স্মরণশক্তি নাই, কিন্তু সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী, দিনযামিনী আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরি-শ্রমের গুণে চৌত্রিশটি বর্ণ অভ্যাস করিয়াছে, অপর দুইটি পরিশ্রমীও নহে এবং তাদৃশ মেধাবীও নহে। যাহা হউক, প্রথমটির স্মরণশক্তি অধিক, যে বালকের স্মরণশক্তি প্রবল থাকে, সেই বালকই ব্যাকরণ, অভিধান, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিতে পারে; পুস্তক সকল বিশিষ্টবিধানে কণ্ঠস্থ করিতে না পারিলে সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি পাঠে

বিশেষ বুৎপত্তি জন্মে না। এইরূপ ভাবিয়া গুরুমহাশয় যাহার স্মরণশক্তি অধিক, তাহাকে ব্যাকরণ কাব্যাদির পাঠ প্রদান করিতেন। এইরূপে বালকগণের মেধা ও কাহার কোন্ বিষয়ে অনুরাগ, তাহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া, যাহাকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহাকে তাহাই শিক্ষা দিতেন।

একদা এক গুরুগৃহে দুইটি ব্রাহ্মণকুমার ও দুইটি ক্ষত্রিয় পুত্র শিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছিল। গুরু বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, একটি ব্রাহ্মণকুমারের সাহিত্য-বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ, সেই জন্য তিনি তাহাকে সাহিত্য, নাটক, কাব্য প্রভৃতি পুস্তকের পাঠ দিতে লাগিলেন, অপর ব্রাহ্মণকুমারটির বৈদিক কার্য্যে অর্থাৎ পূজা ও যাগযজ্ঞের প্রতি আস্থা দেখিয়া তাহাকে পূজাপদ্ধতি ও মারণ উচাটন প্রভৃতি মন্ত্রাদির শিক্ষাপ্রদানে তৎপর হইলেন, দুইটি ক্ষত্রিয় পুত্রের মধ্যে একটিকে ধনুর্বিদ্যা ও অপরটিকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কালে ঐ চারিটি ছাত্র আপনাপন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিল।

এক দিবস রজনীতে তাহাদিগের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ-কুমার বিষয় বিশেষের আলাপ করিতে করিতে অপর তিনটি সহাধ্যায়ীকে কহিল যে, আমি নৈষধচরিতে বিদর্ভাধিপতি নলরাজার দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব হারিয়া বনে গমন ও বিবিধ ক্লেশ ভোগের বিষয় অধ্যয়ন কালে গুরুকে দ্যূতক্রীড়া কিরূপ জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে তাহার মর্ম্ম অবগত করাইবার জন্য তিনখানি কাষ্ঠখণ্ডে পাশ্টি প্রস্তুত করিয়া ও ভূমিতে পাশার ঘর আঁকিয়া পাশাখেলার প্রকরণ

শিক্ষা করাইয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষাদানে অনুপম . . . বলিয়া ছিলেন যে, "এই পাপ পাশক্রীড়া সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া জানিবে, কখনও দ্যূতক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিবে না।" এই কথা শুনিয়া অপর তিনজন সহাধ্যায়ীর পাশক্রীড়া দেখিতে ও শিখিতে ইচ্ছা জন্মিল। তাহারা ব্রাহ্মণকুমারকে বলিলেন যে, ভাই দ্যূতক্রীড়ার প্রকরণ আমাদিগকে শিক্ষা করাও। যদিও দ্যূতক্রীড়া সর্ব্বনাশের মূল, তথাপি ভাল মন্দ সকল বিষয় শিক্ষা করাই মনুষ্যের উচিত; তাহা না হইলে কি জন্য বনবাসী ঋষিগণ দ্যূতক্রীড়ার প্রকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন? অতএব বন্ধু, যদিও গুরুদেব আমাদিগের ক্ষমতানুসারে আমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তথাপি ইহার মধ্যে তুমি যদি আমাকে কোন বিষয় শিক্ষা দেও, এবং আমি যদি তোমাকে কোন বিষয় শিক্ষা করাই, তাহা হইলে পরস্পরের ইষ্ট বই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মণতনয় সহাধ্যায়ীদিগের ব্যগ্রতা দেখিয়া কুটীরের বহির্ভাগে চন্দ্রকিরণসাহায্যে পাশার ঘর আঁকিলেন, ও পাষ্টি নির্ম্মাণ করিয়া অপর তিনজনকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে অপর তিন জনও বেশ পাশা খেলা শিখিল। মধ্যে মধ্যে চারি জনে বদরীফলের বাজি রাখিয়া মনের আনন্দে দ্যূতক্রীড়া করিতেন। সকলেই জানেন যে, যাহারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত হয়, তাহাদিগের মন কিরূপ ক্রোধ ও ঈর্ষ্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তাহারা যতক্ষণ বাজি শোধ দিতে না পারে, ততক্ষণ খেলা ছাড়িয়া উঠিতে চাহে না। ইহাদের মধ্যে মধ্যে দারুণ পাশার নেশায় কত

দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খেলা করিতেন। রাত্রি জাগরণ বশতঃ শরীর অলস হওয়ায় অন্যান্য কার্য্যও উপযুক্ত সময়ে সুসম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। এক রজনীতে বৈদিক কার্য্যে পারদর্শী অপর ব্রাহ্মণকুমার গল্পচ্ছলে বন্ধুবর্গের নিকট কহিল, গুরু আমাকে মারণ, উচাটন ও বশীকরণ বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছেন; আমি সেই বিদ্যাপ্রভাবে একজনকে উন্মত্ত করিয়া দিতে পারি; অন্য কি কথা, প্রাণে পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিতে পারি। গুরু একদিবস কহিয়াছিলেন যে, এই বিদ্যাপ্রভাবে বিদর্ভরাজ দময়ন্তীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই আকর্ষণী শক্তিতে মোহিত হইয়া ভীমসেন-সুতা স্বয়ম্বরসভায় আহূত ইন্দ্রাদি দেবগণকেও অবজ্ঞা করিয়া নলরাজার গলে বরমাল্য দিয়াছিলেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রথম ব্রাহ্মণকুমার কহিলেন, আমি নৈষধচরিতে পাঠ করিয়াছি, ভৈমী স্বপ্নে নলরাজার রূপ দর্শন করায় তাঁহার মনোমধ্যে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছিল; তিনি সর্ব্বদা বিরহ-বেদনায় অস্থির হইয়া কালযাপন করিতেন। ভাই, পূর্ব্বরাগ ও বিরহ-বেদনা কাহাকে বলে, তাহা আমি কিছুই জানিতাম না, কিন্তু এতদুভয়ের বিষয় আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিতাম। একদিবস আমি উপত্যকাভূমিস্থ জলাশয়ে স্নান করিতে যাই। ঐ জলাশয়ের অপর পারে একটি কন্যা স্নান করিতে আইসে। তাহাকে দেখিয়া অবধি আমার মন নলরাজার ন্যায় অত্যন্ত উন্মনা হইয়াছে; তাহাকে সর্ব্বদা দেখিবার ও তাহার সহিত সর্ব্বদা বাস করিবার ইচ্ছা আমার দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অদ্য স্নান

করিবার সময় তিনি যখন অপর পার হইতে দময়ন্তীর ন্যায় আমাকে দেখিয়া লজ্জাবনত হইলেন, ও ইঙ্গিত করিলেন, তখন আমি তাঁহার নিকট যাইবার জন্য সন্তরণে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারী দুইটি ক্ষত্রিয়-পুত্রের ভয়ে নিরস্ত হইলাম। সহাধ্যায়ীরা জিজ্ঞাসা করিল যে, কুমারদ্বয় কে বলিতে পার? প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণপুত্র বলিলেন, বোধ হয়, ঐ জলাশয়ের অপর পারে যে মুনি বাস করেন, উহারা তাঁহার শিষ্য হইতে পারে। দুই জনকেই মহাবলপরাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাধ্যায়িগণের মধ্যে যে ক্ষত্রিয়কুমার গুরুকৃপায় মল্লযুদ্ধে বিশারদ হইয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, ভাই, আমি কল্য অন্তরে দাঁড়াইয়া থাকিব, তুমি কন্যার দিকে অগ্রসর হইও। ইহাতে যদি তাহারা তোমাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে এক এক চপেটাঘাতে তাহাদিগকে ধরাতলশায়ী করিয়া দিব। অপর ক্ষত্রিয়পুত্র কহিল, ভাই, কলহে প্রয়োজন কি, আমি গুরূপদেশে কুজ্ঝটিকা অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, তদ্দ্বারা মুহূর্ত্তকাল মধ্যে উপত্যকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিব; এই সুযোগে তুমি কন্যাকে হরণ করিয়া চলিয়া আসিবে। অপর ব্রাহ্মণকুমার কহিল যে, ভাই, শত্রুর অধিকারে প্রবেশ করিতে নাই, আকর্ষণী বিদ্যার প্রভাবে কন্যাকেই এই পারে লইয়া আসিব।

তাহারা সেই পরামর্শ স্থির করিয়া পরদিবস চারিজনেই স্নানের সময় উপত্যকার জলাশয়ে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ

পরে দেখিলেন, কন্যাটি অপর পারে স্নানার্থ আসিয়াছেন। প্রথম ব্রাহ্মণকুমার এ পার হইতে সঙ্কেত করিলেন যে, তুমি আমাদের নিকট আইস, কোন শঙ্কা নাই। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ কুমার কন্যার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রপ্রভাবে কন্যাটি ক্ষণকাল মধ্যেই উন্মাদিনীর ন্যায় তাহাদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ দিকে অপর পার হইতে ঐ কন্যার সমভিব্যাহারী দুই জন ক্ষত্রিয় যুবক দেখিল যে, কন্যাটি অপর পারে গিয়া চারিজন অপরিচিত পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে; তদ্দৃষ্টে তাহারা ক্রোধে অন্ধ হইয়া মুদ্গর হস্তে কন্যার উদ্ধারসাধনার্থ ধাবিত হইল। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া এ পারের মল্লযুদ্ধ-বিশারদ ক্ষত্রিয়পুত্র একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ উৎপাটন করতঃ তাহাদিগের প্রতিকূলে ধাবিত হইলেন। তিনজনে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

এ দিকে প্রথম ব্রাহ্মণকুমার কন্যাটিকে লইয়া একটি গিরিগুহায় পলায়ন করিলেন; দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকুমার আস্তে আস্তে গুরুকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চারি শিষ্যের গুরু আশ্রমে একজন মাত্র শিষ্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উপত্যকা ভূমিতে যুদ্ধনাদ শুনিতে পাইতেছি, তোমার আর তিনজন সহাধ্যায়ী কোথায়? দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকুমার গুরুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। গুরু অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া উক্ত ছাত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপত্যকাভূমিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মল্লযুদ্ধ-বিশারদ শিষ্য অপর দুইজন বীরপুরুষের সহিত

ঘোর যুদ্ধ করিতেছে। গুরু ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া অপর ক্ষত্রিয় শিষ্যকে দেখিতে পাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রথম ব্রাহ্মণশিষ্য কোথায়? ক্ষত্রিয়পুত্র ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন যে, তিনি সস্ত্রীক গিরিগুহায় লুক্কায়িত হইয়া আছেন। গুরু ক্রোধ করিয়া কহিলেন, ওরে পাগল! তুই কি বিদ্রূপ করিতেছিস্? তোর মহাধ্যায়ীর বিবাহ কে দিল? ক্ষত্রিয়পুত্র কহিল, গুরো! আমি মিথ্যা কথা কহিতেছি না; তিনি এইমাত্র একটি স্বরূপা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। এ দিকে মল্লযুদ্ধবিশারদ শিষ্য মুষ্ট্যাঘাতে অপর মল্লদ্বয়কে ধরাতলশায়ী করিয়া গুরুচরণে আসিয়া প্রণাম করিল। গুরু আস্তে ব্যস্তে ঐ দুইজন পতিত মল্লের নিকটে যাইয়া তাহাদের মুখে জল সেচন করিতে লাগিলেন। এ দিকে কন্যাটির আশ্রয়দাতা মুনি তাহার কন্যার ও শিষ্যদ্বয়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও দেখিলেন, তাহার শিষ্যদ্বয় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। বহু যত্নের পর কিছু চৈতন্য লাভ হইবার উপক্রমে ঐ দুইজনের মধ্যে একজন ক্ষীণস্বরে কহিয়া উঠিল, প্রিয়ে, তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল। তবে হৃদয়ে এই আক্ষেপ রহিল যে, তোমার সহিত মিলন হইল না। দুই মল্লের গুরু, চারিজন শিষ্যের গুরু ও তাহার উপস্থিত তিনজন শিষ্য কেহই এইরূপ প্রলাপবাক্যের মর্ম্ম অবধারণ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চক্ষুতে ও মুখে জল সেচন করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে ঐ মল্ল পুনরায় কহিল, হা প্রিয়ে মণিমালিনি,

তুমি কোথায়? দুইজন মল্লের গুরু এইবার ভাব বুঝিয়া ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইয়া কহিলেন, এ বেটা বলে কি? এর আবার প্রিয়া কে? ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম! তুমি কি তোমার প্রিয়াকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলে?—গুরুর পালিতা কন্যা মণিমালিনীকে নহে?—হায় হায়! অসৎপাত্রে শিক্ষা দিয়া আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন যে, যুবা পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা সহবাস অতিশয় ভয়ঙ্কর। ষষ্টিবৎসর-বয়স্কা স্ত্রীলোকের সহিতও যুবা পুরুষের একত্র শয়ন নিষিদ্ধ। আমি এই দুই যুবার সহিত আমার পালিত কন্যাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়া কি নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্যই করিয়াছি। এই যুবকদ্বয়কে ও আমার পালিত কন্যাকে শকুন্তলা নাটক অধ্যয়ন করান ভাল হয় নাই। কারণ, তাহা হইতে ইহারা মন্দের ভাগই শিক্ষা করিয়াছে। যখন কন্যাটি নির্জ্জনে বসিয়া শকুন্তলার বিরহ-বর্ণন পাঠ করিত, তখন আমি পত্নীর সহিত অন্তরালে থাকিয়া বালিকার মুখের কথা অমৃততুল্য জ্ঞান করিতাম এবং ইহা দ্বারা যে অচিরে এরূপ কুফল ফলিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতাম না। যুবকদ্বয়ও যে ঐ পরমোৎকৃষ্ট কাব্য হইতে কেবল কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক ভাব গ্রহণ করিবে, তাহা কখনও বিবেচনা করি নাই। এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিলাম, 'শকুন্তলা' পাঠই উহাদিগের অধঃপতনের কারণ হইল। যাহা হউক, অতঃপর আমি আর উহাদিগের কাহাকেও আশ্রমে স্থান দিয়া পুণ্য আশ্রমের পবিত্র গুণ নষ্ট করিব না।

চারিজন শিষ্যের গুরু প্রথমেই দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকুমারের মুখে ঘটনার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি এক

জন মল্লকে প্রথম ব্রাহ্মণকুমার ও অপরপারবাসী মুনির কন্যাকে আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাহারা কিঞ্চিৎ বিলম্বে উপস্থিত হইলে, গুরু দেখিলেন যে, উভয়ের গলে দুই গাছি পুষ্পমালা রহিয়াছে। দুই জনকে দেখিবামাত্র অপর পারের মুনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কন্যাকে কহিলেন, ওরে পাপীয়সি, তুই এত শিক্ষা করিয়াও কি জন্য পরপুরুষে রতা হইলি? তোর কিছুমাত্র লজ্জা নাই, তুই এক্ষণেও উপপতির হস্ত ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছিস্? কন্যা তীব্রদৃষ্টি সহকারে মুনিকে কহিল, পিতঃ! আপনি যে কথা কহিলেন, অন্য কেহ হইলে আমি এই-ক্ষণেই শাপ দিয়া, আমি সতী কি অসতী তাহার প্রমাণ দর্শা-ইতাম। কি উপপতি! ইহার অপেক্ষা ঘৃণিত কথা আপনার মুখ হইতে আর কি বহির্গত হইতে পারে? আমি যাহার গলে স্ব-ইচ্ছায় বরমাল্য প্রদান করিয়াছি, তিনিই আমার ধর্ম্মতঃ পতি। তবে কি দুষ্মন্ত শকুন্তলার উপপতি ছিলেন, যযাতি কি শর্ম্মিষ্ঠার উপপতি ছিলেন? পিতঃ! আর এমন পাপ কথা মুখে আনিবেন না। অপর পারের মুনি দেখিলেন যে, কন্যাটিকে যেমন রাশি রাশি কাব্য, নাটক সাহিত্যাদি পুস্তক পড়াইয়াছি, তাহার উত্তম ফল ফলিয়াছে, কন্যাটি দ্বিতীয় শকুন্তলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আর অধিক বলিতে গেলে, অভিনয় আরও অধিক হইয়া পড়িবে, কাজ নাই, আপন কুটীরে প্রস্থান করি।

চারি শিষ্যের গুরু কর্কশ স্বরে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকুমার শিষ্যকে কহিলেন, ওরে গণ্ডমূর্খ, আমি তোকে কি জন্য

দুর্ল্লভ আকর্ষণী বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া ছিলাম? পাপ কর্ম্মের সহায়তা করিবার জন্য, না, এই বিদ্যাবলে কোন সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? বীরপুরুষের যুদ্ধশিক্ষা ন্যায়ানুগত শত্রু দমনের জন্য, না অকারণে বা সামান্য কারণে ঘরে ঘরে কাটাকাটি ও মারামারি করিয়া মরিবার জন্য? রে প্রথম ব্রাহ্মণকুমার! তোকে যে আমি কত শত ন্যায় যুক্তি ও ধর্ম্ম-সঙ্গত পুস্তক পাঠ করাইযাছি! নৈষধচরিত এক উৎকৃষ্ট কাব্য; তাহার উৎকৃষ্ট রচনাপ্রণালী ও উপদেশের প্রতি তুই মনোযোগী না হইয়া, গল্পচ্ছলে তন্মধ্য হইতে তোকে যে পাশক্রীড়ার প্রকরণ বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, তাহাই আপন সহাধ্যায়ীদিগকে শিক্ষা করাইয়াছিস্, আর নলের প্রতি দময়ন্তীর পূর্ব্বরাগ পাঠ করিয়া অনূঢ়া কন্যার হরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্? যা, তোদের আর আমি মুখ দেখিতে চাহি না, তোরা যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর্। রে ক্ষত্রিয় পুত্রদ্বয়, তোদের শিক্ষা করাইবার সময় আমি কি বলি নাই যে, তোরা ক্ষত্রিয় পুত্র; কালে অবশ্য তোদের যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু যখন শত্রুহস্ত হইতে আত্ম-রক্ষার আর অন্য উপায় না থাকিবে, তখনই কুজ্ঝটিকা অস্ত্র আবির্ভূত করিয়া আত্মগোপনের প্রয়োজন হইবে। এতদ্ভিন্ন, এ অস্ত্রের অন্য প্রয়োজন নাই। তোদের কি বলি নাই যে, আত্মরক্ষা ও আর্ত্তজনরক্ষার জন্য মল্লযুদ্ধের প্রয়োজন, পরপীড়নের জন্য নহে। কি পরিতাপের বিষয়, এই সকল বিশিষ্ট বিদ্যা তোরা অসৎপথে চালনা করিয়া কলঙ্ক ঘটাইলি! যা, আমার কুটীরে তোদের প্রবেশ নিষেধ করিলাম, এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন কর্।

উপরি উক্ত ছয়জন শিষ্য দুই গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিল। তাহার পর তাহাদিগের কি কি ঘটিল, তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই, তবে সস্ত্রীক প্রথম ব্রাহ্মণকুমারের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতেছি। সে লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর এক ব্রাহ্মণগৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণের সন্তান ছিল না; যজমান-যাজন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। প্রথম দিবস ব্রাহ্মণ অতিথিব্যবহারে তাহাকে ও তাহার পত্নীকে ভোজন পান করাইলেন। পর দিবস গৃহী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুমারকে কহিলেন, দেখিতেছি, তোমার কিছুই নাই, অথচ এক স্বরূপা কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছ; এক্ষণে ভরণ-পোষণের জন্য কি ব্যবসায় অবলম্বন করিবে? ব্রাহ্মণকুমার কহিল, আমার সংস্কৃত শাস্ত্রে ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে বোধাধিকার আছে, আপনি দয়া করিয়া আমাকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে চলিতে পারে। সেই সময় এক স্থানে বিরাটপাঠের প্রয়োজন ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে সেইখানে নিযুক্ত করিয়া দেওয়ায়, ব্রাহ্মণকুমার সস্ত্রীক নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে, এমন কিছু কিছু পাইতে লাগিল। এই ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে, সে একদিন নিকটবর্ত্তী কোন ধনশালী প্রতিবাসীর ভবনে দ্যূতক্রীড়ার সন্ধান পাইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কার্য্যে বহু পরিশ্রম, ও অল্প প্রতিদান; পক্ষান্তরে দ্যূতক্রীড়ায় বিনা পরিশ্রমে প্রচুর অর্থ লাভ; মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল এবং অচিরে দ্যূতক্রীড়ক-

দিগের সহিত মিলিত হইল। প্রথম হইতেই এই অনর্থ-করী ক্রীড়ায় তাহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। সুতরাং সে একেবারে ক্লেশকর ব্রাহ্মণের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিল এবং দ্যূতক্রীড়ায় অর্থলাভ করিতে লাগিল।

এইরূপে পাপ অর্থোপার্জ্জনে তাহার কয়েক দিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন রাজব্যবস্থাবিরুদ্ধ দ্যূতক্রীড়াকরণ ও তদানুষঙ্গিক অন্য অপরাধে ধৃত হইয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইল। এই দণ্ডভোগের অবস্থায় কারা-গারেই তাহার মৃত্যু হইল। তাহার সুরূপা পত্নীর ধর্ম্মানুরাগ কোন কালেই প্রবল ছিল না। সুতরাং সে এই অসহায় অবস্থায় নীচ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিল।

পাঠকগণ, আমরা যে সকল বিষয় পুস্তকে পাঠ করি, ও লোকের মুখে শ্রবণ করি, তৎসমুদায় হইতে অবশ্যই কিছু না কিছু সংশিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারা যায়; কিন্তু সেই সংশিক্ষাটুকু অসৎ হইতে বাছিয়া লওয়া ও তাহার ন্যায্য ব্যবহার করা বড়ই দুরূহ। কোন্ টুকু গ্রহণ ও কোন্ টুকু ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা ধার্য্য করিতে হইলে সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন। যাহার সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধি আছে, সে শৃগাল কুক্কুরের গল্প হইতেও সারবান্ উপদেশ বাহির করিয়া লইতে পারে, কিন্তু যাহার তাহা নাই, সে সেই সকল শৃগাল কুক্কুরের গল্প পাঠ করিয়া শৃগাল কুক্কুরের অধম হইয়া পড়ে। মহাকবি কালিদাস ও ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতির রসময়ী লেখনী প্রসূত যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহা অপরি-পক্কবুদ্ধি বালকের পাঠ করা অনুচিত; কারণ, সেই সকল

পুস্তক হইতে কি কি শিক্ষা করিতে হইবে, ও তাহাতে কিছু উপদেশ আছে কি না তাহা স্থির করা, অপরিণত-বুদ্ধি বালকের কার্য্য নহে। সুতরাং, তাহা পাঠ করিয়া তাহাদিগের কিছু মাত্র সংশিক্ষা হয় না, বরং সহজেই এ সকল পুস্তকে বর্ণিত আদিরসাদি তাহাদিগের মনো-মন্দিরে প্রবেশ করে। মহাকবি কালিদাস বা ভারতচন্দ্র রায়, তাঁহাদিগের স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিয়া লোকের মনে কুরুচি আসিবে, বোধ হয়, এ অভিপ্রায়ে আপনাপন রসময়ী লেখনী সঞ্চালন করেন নাই। তাহারা যে অভি-প্রায়েই পুস্তক প্রণয়ন করুন না কেন, আমরা কুরুচির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহা হইতে যদি সদুপদেশ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদিগের লাভ। কিন্তু কেহ যদি তাহা না করিয়া বিদ্যাসুন্দর পুস্তক পাঠা-নন্তর স্বয়ং সন্ন্যাসী সাজিয়া রাজদরবারে উপস্থিত হন, এবং সমস্ত অংশ অভিনয় করিতে গিয়া তাহার ফল স্বরূপ পরিশেষে রাজাজ্ঞা অনুসারে কোটালগণ কর্ত্তৃক মশানে আনীত হন, তাহা হইলে বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ পাঠক মাত্রে কেহই রায়ের অথবা তাঁহার প্রণীত পুস্তকের দোষ ধরিবেন না, অসার-গ্রাহী পাঠকেরই নিন্দা করিবেন। যাহা আমরা শ্রবণ করিয়া বা পাঠ করিয়া শিক্ষা করি, তাহার ন্যায্য ও সদ্ব্যবহার না করিলে বিপরীত ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে; বোধ কর, যদি কোন শিক্ষিত যুবাপুরুষ একটি নীচকুলোদ্ভবা সুরূপা কামিনীকে দর্শন করিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন, তাহা হইলে তিনি চাণক্যপণ্ডিতের—“বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি

কাঞ্চনং। নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥” এই নীতিগর্ভ শ্লোকের দোহাই দিয়া ঐ নীচকুলোদ্ভবা কামিনী-লাভে তৎপর হইবেন, কিম্বা “প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলম্।” এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া ঐ সুরূপা কামিনীর ধ্যান আপন মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দিবেন? তিনি যদি চাণক্যপণ্ডিতের নীতি-গর্ভ কবিতার দোহাই দিয়া নীচ-কুলোদ্ভবা সুন্দরীর লাভে তৎপর হন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহার ঐ অভ্যস্ত কবিতার ভাবার্থ অন্যায় পথে চালিত করি-লেন। কারণ, চাণক্যপণ্ডিতের উক্ত কবিতা কোন যুবকের কুপ্রবৃত্তির পোষকতার জন্য রচিত হয় নাই; পক্ষান্তরে কু-প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্যই “প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহা-ফলম্” মহাবাক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। পাঠক, তবেই আমরা যাহা পাঠ করিব, বা লোকের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিব, তাহা কি উদ্দেশে রচিত বা কথিত হইয়াছে, তাহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে চেষ্টা পাওয়া আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এক্ষণে পুঁথিগত বিদ্যা ও কার্য্যকারিতার বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞান জন্মে ও কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করা যায়, তাহাকেই আমরা পুঁথিগত বিদ্যা আখ্যা দিলাম এবং দেখিয়া শুনিয়া ও হাতে কলমে করিয়া যে জ্ঞান ও ক্ষমতা জন্মে, তাহাকেই কার্য্যকরী বিদ্যা বা বিষয়বুদ্ধি নাম দিতেছি। বহুসঙ্খ্যক পুস্তক পাঠ করিলেই যে মনুষ্য ইহ জগতে সমস্ত কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না। যে সকল স্থানের যে যে রীতি, নীতি ও কার্য্যপ্রণালী, তাহাও

শিক্ষা করা উচিত; তাহা না হইলে, কেবল পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা কখন কোন কার্য্যের সুপ্রতুল ঘটে না। যদিও কোন কোন লোক অসাধারণ বিদ্যাবান্, কিন্তু তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন রীতি, পদ্ধতি ও ব্যবহারপ্রণালীর জ্ঞান না থাকায় কখন কখন হিতে বিপরীত করিয়া থাকেন। বহুকাল পূর্ব্বে এই মহানগরীতে টেলার সাহেব—অক্সফোর্ড কালেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র এম, ডি, উপাধিধারী টেলার সাহেব—চিকিৎসা ব্যবসা করিতে আসিয়া ছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষতঃ শারীরস্থান বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই ইংরাজি ও বাঙ্গলা সংবাদপত্রে আপন পরিচয় দিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞাপনদৃষ্টে এই সহরের কোন কোন ধনাঢ্য লোক তাহাকে চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু ডাক্তার সাহেবকে যিনি একবার ডাকিতেন, দ্বিতীয়বার চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে, আর তাঁহার নামও মুখে আনিতেন না। ইহার কারণ অবগত হইতে পাঠকগণের অবশ্য কৌতুহল জন্মিবে সন্দেহ নাই, এইজন্য উক্ত সাহেবের চিকিৎসাপ্রণালী সংক্ষেপে বর্ণন করিতে বাধ্য হইলাম। উক্ত টেলার সাহেবকে, কেহ ডাকিলে তিনি শকটারোহণে আপন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যদি দেখিতেন যে, আহ্বানকারীর বাটী জঘন্য গলির ভিতরে অবস্থিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিতেন; গমন কালে বলিয়া যাইতেন যে, যাহারা এরূপ জঘন্য স্থানে বাস করে, তাহাদের রোগ আরোগ্য করা আমার সাধ্য নহে। যদি রোগীর

সৌভাগ্য বশতঃ বাটী খানি প্রকাশ্য রাজপথের উপর হইত, তাহা হইলে বাটী প্রবেশ করিয়াই ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেন; যদি দেখিতেন, সদর বাটীর উঠানে একটি গরু বাঁধা রহিয়াছে বা উঠানটি রীতিমত পরিষ্কার নহে, তাহা হইলে, বাটীর কর্ত্তাকে ডাকিয়া কহিতেন, অগ্রে এই গাভীটিকে অন্য স্থানে লইয়া যাও এবং উঠানটি সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার কর, তবে আমি রোগীকে দেখিতে যাইব, তাহা না হইলে, তোমার বাটীর চিকিৎসাকার্য্যে আমি কোনক্রমেই ব্রতী হইব না। কারণ, চিকিৎসাশাস্ত্রে যেরূপ বাটীতে রোগী রাখিবার বিধান আছে, তাহার অন্যথা ঘটিলে আমি কি করিয়া রোগীকে আরোগ্য করিয়া তুলিব। আর যদি কোন সূত্রে বহির্ব্বাটী অতিক্রম করাইয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করান হইত, তাহা হইলে, তিনি রোগীর গৃহে পদার্পণ করিয়াই সেই গৃহটি প্রশস্ত কি না, তাহাতে অনেক গুলি জানালা ও দরজা আছে কি না, রোগীর শয্যা উত্তমরূপ পরিষ্কার আছে কি না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেন। এইরূপে যদি গৃহ-স্বামীর সৌভাগ্যে গৃহশয্যা প্রভৃতি ডাক্তার সাহেবের মনোনীত হইত, তাহা হইলে, তিনি রোগীর শয্যার পার্শ্বে এক খানি চৌকিতে উপবিষ্ট হইয়া রোগীকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিতেন।

বোধ কর, কোন ধনাঢ্য লোকের সহধর্ম্মিণী জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; ঐ রোগ কি কারণে উৎপন্ন হইল, ডাক্তার সাহেব প্রথমতঃ তাহারই তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া বলিলেন,—"ভাল, বল দেখি, তোমার পিতা-মাতার

এই বয়সে কখন জ্বর হইয়াছিল কি না? তাঁহাদিগের শরীর তোমার ন্যায় কৃশ ছিল কি না? তোমার পিতা-মাতা গঙ্গাস্নান করিতেন, না তোলা জলে স্নান করিতেন? তাঁহাদের কি নিমন্ত্রণ খাওয়ার অভ্যাস ছিল? নিমন্ত্রণে যাইয়া অবশ্য তাঁহারা দধি খাইতেন?" এই কয়েকটি প্রশ্ন শুনিয়া রোগী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং মৃদুস্বরে কহিল, "আমার পিতা প্রত্যহ দধি না হইলে ভাত খাইতেন না।" এই কথা শুনিয়া ডাক্তার সাহেব সজোরে আপন উরুতে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "I now got the clue of this disease." "চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিয়াছে, পিতা-মাতা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে, গর্ব্ভস্থ সন্তানের তদ্দ্বারা ইস্ট বা অনিষ্ট হইবেই হইবে। ইহাঁর পিতা যখন প্রত্যহ দধিভোজন করিতেন তখন ইহাঁর শরীরে শ্লেষ্মার আধিক্য হইবে তাহাতে আর সংশয় কি?" তথাচ আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, "ইহাঁর জননীর গর্ব্ভাবস্থায় ইনি সেই স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছেন কি না?" রোগী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমার এত কালের কথা মনে নাই, সে কথা মা বলিতে পারেন।" ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "তবে তোমার মাতাকে ডাকিয়া পাঠাও, তাঁহাকে আমার আরো দুই একটা প্রশ্ন করিতে হইবে।" কন্যার পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্বামীর শাশুড়ী ঠাকুরাণী বাটী হইতে আসিলেন। তিনি দরজার অন্তরালে দাঁড়াইলে পর ডাক্তার সাহেব বাটীর কর্ত্তার মুখে রোগীর মাতা আসিয়াছেন, শুনিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি স্মরণ করিয়া আমার কয়েকটী কথার উত্তর

কর,—এই কন্যা যখন তোমার গর্ব্ভে ছিল, তখন হাজিরি খানার সময় তুমি অধিক পরিমাণ গোমাংস খাইতে না কুক্কুট-মাংস খাইতে?” এই কথা শুনিবামাত্র কন্যার মাতা বলিলেন, “মর্ হতভাগা; বিনোদের ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই কোথা থেকে একটা পাগল ডাক্তার ধরে এনেচে। যে কথা শুন্‌লে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়, সেই কথা আমাকে অনায়াসে বল্লে।” বিনোদ বাবু বিরক্ত হইয়া ডাক্তার সাহেবকে কহিলেন, “আপ্‌নি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখুন।” বাবুর কথা শুনিয়া ডাক্তার সাহেব কাগজ কলম হাতে করিয়া বসিলেন; কলমটা ঠোটে ধরিয়া দশ মিনিট চিন্তার পর কহিলেন, “বাবু, এ স্ত্রীলোকটি সধবা না বিধবা?” বিনোদ বাবু কহিলেন, “সাহেব তুমি কি বলিতেছ? ইনি আমার স্ত্রী।” সাহেব কহিলেন, “আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু ইঁহার পূর্ব্বে দুই এক বার বিবাহ হইয়াছিল, না এই প্রথম বিবাহ?” বিনোদ বাবু বিরক্তির সহিত হাস্য করিয়া কহিলেন, “ভাল, ইহার সহিত জ্বর রোগের কি সংশ্রব আছে?” সাহেব কহিলেন, “না থাকিলেই বা আমি জিজ্ঞাসা করিব কেন? মেডিকেল সায়েন্সে স্পষ্ট লেখা আছে যে, কেবল এক স্বামীর দোষে স্ত্রীর অনেক রোগোৎপত্তি হয়; রুগ্নস্বামীর সহিত সহবাসে স্ত্রীলোকেরাও রুগ্ন হইয়া পড়ে। তোমার শরীর নীরোগ, শারীরিক গঠন দ্বারা বোধ হইতেছে। এরূপ নীরোগ স্বামীর স্ত্রী হইয়া কি জন্য তোমার স্ত্রী এরূপ কৃশ হইয়াছে ও দীর্ঘকাল জ্বররোগ ভোগ করিতেছে, অবশ্য ইহার পূর্ব্ব স্বামীর রুগ্ন শরীর ছিল।” বিনোদ বাবু মনে মনে ভাবিলেন, আর এ

পাগলের সহিত অনর্থক তর্কের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কি করিয়া এ পাপকে বিদায় করি। পনর্ব্বার কহিলেন, "সাহেব প্রিসক্রিপসন লিখুন, আমার স্ত্রীর আর বিবাহ হয় নাই, এই প্রথম বিবাহ।" সাহেব কহিলেন, "তবে স্বামীর দোষে ইহার রুগ্ন শরীর হয় নাই; অবশ্য ইহার নিজের কোন দোষ আছে। আচ্ছা, আমি প্রিসক্রিপসন লিখিতেছি;" এই কথা বলিয়া পর্য্যায়ক্রমে চারখানি প্রিসক্রিপ্সন লেখা ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা হইল। পঞ্চমবার প্রিসক্রিপ্সন লিখিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "বাবু আমি এবেলা প্রেসক্রাইব করিতে পারিলাম না। কারণ, আমাদিগের চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রোগীকে দুইবার না দেখিলে বিশিষ্ট বিধানে রোগ নির্ণীত হয় না।" বিনোদ বাবু কহিলেন, "উত্তম কথা, আমি বৈকালে নিজে যাইয়া আপনাকে লইয়া আসিব, নচেৎ আসিবেন না," এই কথা বলিয়া ষোলটি টাকা দক্ষিণা দিয়া বিনোদ বাবু ডাক্তার সাহেবকে বিদায় করিলেন। এইরূপ চারি পাঁচটি ধনাঢ্য লোকের বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ডাক্তার সাহেবের নাম বাহির হইয়া পড়িল। আর কেহই তাঁহাকে ডাকিত না। কিন্তু ধনাঢ্য বাবুর বাটীতে কোন প্রকার কঠিন রোগ উপস্থিত হইলে পরামর্শস্থানে ডাক্তার সাহেবেরা টেলার সাহেবকে আনাইতে কহিতেন; পাছে ডাক্তার টেলার সাহেবের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয় এই জন্য ডাক্তার সাহেবেরা তাহার পরামর্শ লইয়া কিছু কিছু টাকার সুবিধা করিয়া দিতেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী ডাক্তার টেলার পরামর্শস্থলে

আসিয়া কাহারও কথা শুনিতেন না; আপনার মত বলবৎ করিবার জন্য ডাক্তারি পুস্তক সকল দেখাইয়া ভয়ানক বাক্‌-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। ক্রমে রাজধানীর কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ডাক্তার টেলার সাহেবের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, স্থতরাং চিকিৎসা বিদ্যা দ্বারা আর তাঁহার এক কপর্দ্দকও আয়ের সম্ভাবনা রহিল না। অবশেষে তিনি কিয়দ্দিবসের জন্য হিন্দুকলেজের সাহিত্য-অধ্যাপকের পদে চারিশত টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত হন। তিনি অসামান্য বিদ্যাবান্‌ ছিলেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় বালকগণকে কি প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হয়, তাহার কিছুই জানিতেন না। স্থতরাং তাঁহার অধ্যাপনাতে বালকগণ কিরূপ সন্তোষ লাভ করিতেন, তাহা বোধ হয়, পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া জানাইতে হইবে না। সাহেব নিজে ডাক্তার, এই জন্য বালকেরা বাটী যাইবার অভিপ্রায়ে বিরসবদনে সাহেবের নিকট কহিত, "মহাশয়! আমার বুকের ভিতর ধড়্‌ফড় করিতেছে, আর অত্যন্ত শিরোবেদনা উপস্থিত হইয়াছে।" শ্রুতিমাত্রই সাহেব তাঁহাকে পাল্কি করিয়া বাটী যাইতে আদেশ করিতেন। এক দিবস সাহেব স্কুলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসিয়া আপনার চৌকিতে উপবিষ্ট হইয়াছেন ও মনের আনন্দে সঙ্গীত করিতেছেন, বালকগণ তাহা শুনিতে পাইয়া ধীরে ধীরে পদসঞ্চালন করতঃ আপন আপন স্থানে বসিল, ক্রমে ক্লাসটি বালকে পূর্ণ হইল, কিন্তু তথাচ সাহেবের চৈতন্য নাই; তিনি চক্ষু মুদিয়া সঙ্গীত করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নোন্মীলন

করিয়া দেখেন যে, বালকগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার সঙ্গীত শুনিতেছে। তদ্দৃষ্টে সাহেব পরমাহ্লাদিত হইয়া বালকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন গো, তোমরা আমার মত সঙ্গীত করিতে পার ?" সাহেবের প্রশ্ন শুনিয়া কয়েকজন বালক অধোবদন হইল, ও কয়েকজন নির্লজ্জ বালক কহিল, "আজ্ঞে আমরা বাঙ্গালা গান গাইতে জানি।" সাহেব কহিলেন, "আচ্ছা আরম্ভ কর।" এই কথা শুনিয়া কয়েকজন নিতান্ত নির্লজ্জ বালক টেবিল বাজাইয়া বিদ্যা-সুন্দরের সঙ্গীত আরম্ভ করিল। সাহেব তাহাদিগের সঙ্গীত শুনিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমি এই কয়েকটি গান ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া লইব, তোমরা একজন লাইব্রেরিতে যাইয়া একখানি অভিধান লইয়া আইস।" অভিধান আসিয়া পৌছিলে পর সাহেব কাগজ কলম টেবিলের উপর লইয়া সঙ্গীত অনুবাদ করিতে বসিলেন। সেই কার্য্যেই সমস্তদিন অতিবাহিত হইল। এক দিবস পড়াইতে পড়াইতে সতরঞ্চ খেলার কথা উপস্থিত হইলে সাহেব ছাত্রগণকে কহিলেন, "তোমরা কেহ সতরঞ্চ খেলিতে পার ?" এক জন বালক অন্য এক জন বালককে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "মহাশয়! ইনি বেশ খেলিতে পারেন।" সাহেব কহিলেন, "উত্তম, আমি সতরঞ্চ লইয়া আসিব।" সাহেব তৎপরদিবস সতরঞ্চ আনিয়া টেবিলের উপর সাজাইলেন; চারিদিক হইতে বালকেরা ওপরচাল দিতে লাগিল; সাহেব দুই তিন বার ছাত্রদিগের নিকট সতরঞ্চ খেলায় পরাস্ত হইলেন।

প্রিন্সিপেল সাহেব এই সকল কাণ্ড দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তৎপর দিবস হইতে ডাক্তার সাহেবকে আর ক্লাসে যাইতে দিলেন না। ডাক্তার সাহেবের কতিপয় সম্ভ্রান্ত বন্ধু একত্র হইয়া ডাক্তারকে এতদ্দেশের রীতিনীতি ব্যব-হারের অনেক কথা কহিয়া, তিনি এখানে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন না, সেই বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ায়, ডাক্তার সাহেব বন্ধুগণের সাহায্যে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

কেবল এক পুঁথিগত বিদ্যা কোন কালে কার্য্যকরী হয় না। উপরি-উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল। আমাদিগের ইংরাজাধিকারে যিনি যে অধিকারের রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার অভিলাষ রাখেন, তাঁহাকে অগ্রে রীতিমত সেই বিদ্যার আলোচনা করিতে হইবে। অবশেষে নিম্ন পদ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য শিক্ষা করিতে করিতে উন্নত পদে উঠিতে পাইবেন। কিছুকাল পূর্ব্বে যাঁহারা হেনিবরি কালেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এতদ্দেশে সিবি-লিয়ন হইয়া আসিতেন এবং সিবিলিয়েনের সংখ্যা অল্প থাকায় একেবারে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়া জেলাকোর্টের এজ্‌লাসে যাইয়া উপবিষ্ট হইতেন, প্রাচীন লোকের মুখে তাঁহাদিগের বিচারের গল্প শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। একজন অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ, যিনি জেলাকোর্টের মহা-ফেজের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার মুখে শুনা গিয়াছে যে, তিনি দশ পনরটি সিবিলিয়নকে বহুকষ্টে বিচারকার্য্যে পরিপক্ক করিয়াছিলেন। তৎকালের যুবক সিবিলিয়নগণ

এজলাসে বসিয়া সেরেস্তাদারকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আমাকে এখন কি কার্য্য করিতে হইবে?" একদিন কোন সেরেস্তাদার কহিলেন, "হুজুর! অগ্রে দরখাস্ত লইবার প্রথা প্রচলিত আছে।" সাহেব কহিলেন, "আচ্ছা, তোমরা দরখাস্ত লও, আমি একবার খাস্ কাম্‌রা হইতে আসি।" সেরেস্তাদার কহিলেন, "হুজুর! আপনাকে সমস্ত দরখাস্ত গুলি শুনিয়া তাহার পৃষ্ঠে হুকুম লিখিত হইবে। একার্য্যে হুজুর ব্যতিরেকে আমাদিগের করিবার অধিকার নাই।" সেরেস্তাদারের কথায় সাহেব স্থির হইয়া আপন চৌকীতে বসিলেন। দরখাস্ত সকল পেশ হইতে লাগিল। ক্রমে পঞ্চাশখানি দরখাস্ত পেশ হইল তদ্দৃষ্টে হুজুর যার পর নাই বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এই সমস্ত দরখাস্ত শুনিয়া আমাকে নিজ হস্তে হুকুম লিখিতে হইবে, আর তোমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? আমি তোমাদিগের কারসাজি বুঝিতে পারিয়াছি; তোমরা নূতন লোক পাইয়া আমাকে খাটাইয়া লইবার পন্থা করিতেছ, আমি তোমাদের এ সব কথা শুনিতে চাহি না; তোমরা অবশ্য গাধার মত খাটিবে। আমি এক ঘণ্টামাত্র খাটিব, আর তোমাদের গাধার মত খাটাইয়া লইব।" সেই সকল যুবক সিবিলিয়ন দিগের বিশেষ কার্য্যকারিতাজ্ঞান না থাকায় জেলাকোর্টের আমলাগণকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হইত। তাঁহারা হেলিবরি কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেন সত্য, কিন্তু যে দেশের প্রজাপুঞ্জের সুবিচারের ভার তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইত, সে দেশের রীতিনীতি ব্যবহার বিশেষ অবগত না থাকায়, অন্ধের হস্তী-দর্শনের ন্যায়

এক এক জন সিবিলিয়ন এক এক প্রকারে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বসিতেন। কথিত আছে, কোন জেলা-কোর্টের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের এজলাসে একটি কাঁটাল চুরির মোকদ্দমা পেশ হইয়াছিল। মোকদ্দমা উঠিবামাত্রই মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেরেস্তা-দারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসামী কি চুরি করিয়াছে?" সেরেস্তাদার কহিলেন, "হুজুর এ ব্যক্তি দুইটা কাঁটাল চুরি করিয়াছে।" সাহেব পুনর্ব্বার কহিলেন, "কাঁটাল কি প্রকার দ্রব্য?" সেরেস্তাদার কহিলেন, "কাঁটাল সুমিষ্ট ফল, এক একটার মূল্য এক আনা হইতে অর্দ্ধমুদ্রা হইতে পারে।" বিচারপতি কহিলেন, "আচ্ছা, ইহাকে পাঁচ বৎসরের জন্য পায়ে বেড়ী লাগাইয়া জেলে পাঠাইয়া দাও।" সেরেস্তাদার করযোড়ে কহিলেন, "হুজুর! এ হুকুম আমি কেমন করিয়া লিখিব, আপনার পাঁচবৎসর মেয়াদ দিবার ক্ষমতা নাই।" তচ্ছ্রবণে সাহেব বিলক্ষণ কুপিত হইয়া কহিলেন, "তুমি এরূপ কথা পুনর্ব্বার কহিলে তোমাকে চাবুকপেটা করিব; আমার পাঁচবৎসর মেয়াদ দিবার ক্ষমতা নাই, এ কথা তোমাকে কে বলিল? আমি ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমি ইংরাজী আইন তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া বিচারকার্য্যের ভার পাইয়াছি, আমি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে আসিয়াছি; আসামীকে পাঁচবৎসর মেয়াদ দিয়াছি বলিয়া তোমার বুক ফাটিয়া গিয়াছে? তুমি আসামীর নিকট ঘুস খাইয়াছ; তোমরা যে ঘুসখোর, ইহা পূর্ব্ব হই-তেই আমি অবগত আছি।" সেরেস্তাদার করযোড়ে কহিল, "হুজুর, আপনি এক্ষণে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত

আছেন। আইনে লিখিতেছে, এ এজলাসে বসিয়া যিনি বিচার করিবেন, তিনি ছয় মাসের অধিক আসামীকে মেয়াদ দিতে পারিবেন না।” তদনন্তর আইনের পুস্তক খুলিয়া বলিলেন, “এই দেখুন, আইনে স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে যে, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ছয় মাসের অধিক মেয়াদ দিতে পারিবেন না। সাহেব আইন দেখিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, ও সেরাস্তাদারের প্রতি কিঞ্চিৎ ভক্তি হইল। কিন্তু ইংরাজ জাতির এরূপ প্রখর বুদ্ধি যে, যে যুবক সিবিলিয়ন, নথীর কোন্ দিকে সাক্ষর করিতে হয় তাহাও জানিতেন না, তিনিই সেরেস্তাদারের সহায়তায় এক বৎসরের মধ্যে বিচারকার্য্যের রীতিপদ্ধতি সমস্ত এরূপ বুঝিয়া লইতেন যে, যে সেরেস্তাদার সমস্ত কার্য্য তাহাকে হাতে ধরিয়া শিখাইত, তিনিই এক বৎসরের পর আর কখন তাহার কোন দোষ দেখিতে পাইতেন না। কেবল ইংরাজ সিবিলিয়ন কেন, যে সকল বঙ্গীয় যুবক ইংলণ্ড হইতে সিবিলিয়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং সর্ব্বাগ্রে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে আসিস্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন, তাঁহারাও ফেরারী বহি কাহাকে বলে, মৎফরেক্কা ও সরাসরির মোকদ্দমা কাহাকে বলে ও কি প্রণালীতে আসামীর জবানবন্দী লইতে হয়, হঠাৎ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যাঁহারা মেধাবী ও প্রখরবুদ্ধিশালী তাহারাই পুঁথিগত বিদ্যার সহায়তা লইয়া বহুকষ্টে কাজের লোক হইয়া উঠেন। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে সকল বঙ্গীয় যুবক পুলীসের নানা অধিকারে কার্য্য করিয়া ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নত ও এক একটি এলাকাখণ্ডের ভার প্রাপ্ত হন, তাঁহারা একজন কৃতবিদ্য যুবক সিবিলিয়নের অপেক্ষা শতগুণে অতি সুন্দররূপে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এ সংসারে অনেকের পুঁথিগত বিদ্যা আছে; তাঁহারা বহুসংখ্যক পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন, চিরকাল আপনি পড়িয়াছেন এবং ছাত্রবৃন্দকে পড়াইযাছেন, এতদ্ভিন্ন সংসারের সহিত আর কোন সম্বন্ধই রাখেন না। যেমন একটি পড়া পাখীর কাছে আর একটি পাখী সর্ব্বদা ঝুলাইয়া রাখিলে, সেই পড়া পাখীটি যাহা বলে অন্য পাখীটি শুনিয়া শুনিয়া তৎসমুদয় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে, সেই কথা সর্ব্বদা বলে, কিন্তু সে কথার ভাবার্থ কি তাহা অবগত নহে; পূর্ব্বকালে ও এক্ষণে বঙ্গদেশস্থ টোলের অধ্যাপকের ও ছাত্রগণের প্রায় সেইরূপ পড়া বিদ্যা জন্মিয়া থাকে। নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা চিরকাল অনুমানখণ্ড পড়িয়া জীবনের সারাংশ অতিবাহিত করেন ও শ্রাদ্ধ-সভায় যাইয়া ভয়ানক বাক্যুদ্ধে প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া আপনাদিগের অসাধারণ বিদ্যার পরিচয় দেন; কিন্তু সংসারিক জ্ঞানে তাঁহারা এতদূর অনভিজ্ঞ যে, জামাতাকে একখানি পত্র লিখিতে হইলে বিষম বিপদে পতিত হন। কথিত আছে, একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত নিত্যনৈমিত্তিক-পূজা-আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে একটি রক্তবর্ণ পাণিশঙ্খ রহিয়াছে। রক্তশঙ্খ দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনুমানখণ্ডের সাহায্য লইয়া বিস্তর অনুমান করিলেন; কিন্তু রক্তশঙ্খের কথা

কোন্ স্থলে লিখিত আছে তাহার কিছুই স্মরণ হইল না। অবশেষে চালি হইতে পুস্তক নাবাইয়া প্রত্যেক পুস্তকের পাত উল্টাইতে লাগিলেন; কিন্তু রক্তবর্ণ শঙ্খের কথা কোন খানেই পাইলেন না। অবশেষে পুঁথি লইয়া গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন। দিবা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া যায়, তথাচ অদ্য পিতার পূজা আহ্নিক শেষ হইল না কেন, এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পিতা পুঁথি কোলে করিয়া গাঢ় চিন্তায় মগ্ন আছেন, পূজার আয়োজন যেমন তেমনি রহিয়াছে; ভট্টাচার্য্যের কন্যা কোন বিপদ আশঙ্কা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ভাবনাযুক্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন কেন? বেলা যে আর নাই, কখন পূজা আহ্নিক শেষ করিবেন?" ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "বৎসে, তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর, ভবিষ্যৎ পুরাণে পড়িযাছিলাম যে, কলিতে সংসারের সমস্ত পদার্থ বিকৃত ভাব ধারণ করিবে, অদ্য তাহার একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম; আমি এই গৃহে প্রবিষ্ট হইতে হইতেই এই শ্বেত শঙ্খ রক্তবর্ণ ধারণ করিল, রক্তশঙ্খের কথা শাস্ত্রের কোন স্থলে উল্লেখ নাই।" কন্যাটি হাস্য করিয়া কহিল, "বাবা, তুমি যে বিষম ভ্রমে পড়িয়াছ, তোমার পুষ্পপাত্রে স্তূপাকারে রক্ত জবা রহিয়াছে, সেই রক্তপুষ্পের আভা লাগিয়া শ্বেত শঙ্খ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এই দেখ, আমি তোমার ভ্রম ঘুচাইতেছি," এই কথা বলিয়া পুষ্পপাত্রটি কিঞ্চিৎ অন্তরে রাখিবামাত্রেই পাণিশঙ্খ পুনর্ব্বার শুভ্রবর্ণ হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া ভট্টাচার্য্য কিয়ৎক্ষণ কন্যার

মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর—"মা! সরস্বতী, তুমি আমার কন্যা হইয়া নবদ্বীপে বাস করিতেছ, আমি এমন অজ্ঞান যে, ইহার কিছুই অবগত হইতে পারি নাই; কন্যাজ্ঞানে আমি তোমাকে কত তিরস্কার করিয়াছি, এক্ষণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আর অনুমানখণ্ডের যে কয়েকটি স্থলে আমার সংশয় আছে, এই রত্নশঙ্খের ন্যায় আমার সেই কয়েকটি সংশয় মোচন করিয়া দাও।" এই কথা বলিয়া গলবস্ত্রে সাষ্টাঙ্গে কন্যার চরণে প্রণিপাত করিল। ত্রিশ বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভট্টাচার্য্যের এইরূপ বিষয় বুদ্ধি জন্মিয়াছিল। এরূপ বিদ্যার প্রয়োজন কি, ইহা আমরা কিছুই অনুভব করিয়া উঠিতে পারি না।

একাল পর্য্যন্ত এরূপ বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই যে, পাঠশালা কি উন্নত শ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি একেবারে যে কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, সেই কার্য্যই সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে গুরুমহাশয়ের পাঠশালাই আমাদিগের দেশের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ কলেজ ছিল। গুরুমহাশয়ের নিকট ছাত্রগণ ককারাদি চৌত্রিশ বর্ণ পড়িতে এবং লিখিতে শিক্ষা করিত, পরে কদলীপত্রে অঙ্ক বিদ্যার চর্চ্চা হইত। সর্ব্বশেষে কাগজে জমিদারী সেরেস্তার পত্তন দিয়া ছাত্রগণ পাটয়ারি বিদ্যায় পারদর্শী হইতেন। বর্ত্তমান শিক্ষার সহিত তুলনায় তাহাকে যৎসামান্য শিক্ষা বলিয়া ধরিতে হয়; কিন্তু সেই সকল ছাত্রগণ পরে বিষয় কার্য্যে প্রবেশ করিয়া এক এক জন অসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্যকরী ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তবেই যে

বিদ্যা শিক্ষা করিলেই কাজের লোক হইবে, তাহার কিছু মূল নাই। একটি সাধারণ কথায় বলিয়া থাকে যে, "কর্ম্মণা বর্দ্ধতে বুদ্ধিঃ।" যাঁহারা সুচারু রূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সেই বিদ্যাকে ভিত্তি স্বরূপ ধরিয়া ও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আপনার কার্য্যকরী ক্ষমতার উন্নতি করিয়া লন এবং সাহসের সহিত বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই ক্রমে ক্রমে কাজের লোক হইতে পারেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একাল পর্য্যন্ত এরূপ বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই যে; তাহা শিক্ষা করিয়া একেবারে যে কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, সেই কার্য্যই সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন। যিনি যে অধিকারে প্রবেশ করিবেন, সেই অধিকারের কার্য্যপ্রণালী তাঁহাকে অবশ্য শিক্ষা করিতে হইবে। তাহা না করিলে তিনি যতদূর বিদ্যাবান্ হউন না কেন, বিপরীত ঘটাইয়া বসিবেন। যাঁহারা বাণিজ্যাধিকারে বিলক্ষণ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যদি অন্য কোন অধিকারে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে, হঠাৎ তিনি সে কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে কখনই পারিবেন না। আবার যাঁহারা দীর্ঘকাল আদালত সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিলে হয়তঃ তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া যাইবে। কোন এক জন পণ্ডিতকে যদি কোন জমীদারের সেরেস্তায় অতি উচ্চ পদ দেওয়া যায়, হয়ত তিনি তথায় মহামূর্খের ন্যায় কার্য্য করিবেন। ঐ বিষয়ের একটি গল্প স্মরণ হওয়ায় তাহা এইস্থলে লিখিতে বাধ্য হইলাম। একজন ন্যায় শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত কোন কারণ বশতঃ একজন ধনাঢ্য

লোকের বাটীর দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হন। একদিন দেওয়ানজী সেরেস্তাখানায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কোন মহল হইতে একজন পেয়াদা একখানি চালান আনিয়া দেওয়ানজীর হস্তে দিল। দেওয়ানজী কহিলেন,—"কস্ত্বং"। পেয়াদা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি চালান খানি খুলিয়া সর্ব্বাগ্রে "শ্রীশ্রীদুর্গা-স্মরনং" পাঠ করিয়াই বিরক্ত হইলেন; কারণ, চালানের প্রারম্ভেই নকারে ভুল হইয়াছিল। তাহার পর "চালান রুপেয়া" পাঠ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চিন্তা করিলেন ও আপনা-আপনি মৃদুস্বরে বলিলেন, ভাষাপরিচ্ছেদের মূলসূত্রে লিখি-য়াছে,—"দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম"—"চালান-রুপেয়া" ভাষা-পরিচ্ছেদের সূত্রানুসারে এ দুইটি কথার ত কোন অর্থ বোধ হইতেছে না। দেওয়ানজী এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন মুহুরি কহিল, "মহাশয়, কি দেখিতেছেন, এ যে জয়দেবপুরের খাজনার চালান আসি-য়াছে।" মুহুরির এতাদৃশ কথা শুনিয়া আমাদিগের ন্যায়ালঙ্কার উপাধিধারী দেওয়ানজী সরোষে কহিলেন, "তুই ত ভারি পণ্ডি-তের বেটা পণ্ডিত, অমরকোষ আন দেখি; চালান শব্দের অর্থ কি ?" দ্রব্যং গুণস্তথা—মুহুরি তাহার কবিতা পাঠে বাধা দিয়া কহিল, "মহাশয়, অকারণ আমার উপর বিরক্ত হইবেন না, আমি বহুকালাবধি এই সেরেস্তায় কার্য্য করিতেছি; আমরা দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, কোথা হইতে কি কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; আজ ত একখানি মাত্র চালান আসিয়াছে, শশমাহির সময়ে একেবারে স্তূপাকার চালান

আসিয়া পড়ে, সে সকল কার্য্য আমরা দুই এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করিয়া ফেলি। মহাশয়! আমাদের কাগচ পত্র যেরূপ ভাষায় লিখিত হয়, বোধ হয়, আপনি তাহা বিশেষ অবগত নহেন, এই জন্যই "চালান রুপেয়া" কথাটি লইয়া মনে মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। মহাশয়, কার্য্যশিক্ষা কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া হয় না; কার্য্যপ্রণালীর উপদেশ কার্য্যপটু লোকের নিকট শিক্ষা করিতে হয়।" দেওয়ানজী মনে মনে বুঝিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। এক্ষণে পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি কেহ সেতার-বাদন শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি সেতার-শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়া কখন সে বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন না; অবশ্য তাঁহাকে গুরূপদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ প্রায় সকল বিষয়েই শিক্ষার প্রয়োজন, গুরূপদেশ ভিন্ন কোন বিষয়ই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে ও শিক্ষা করিতে পারা যায় না।

কার্য্য করিতে করিতে এতদূর কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা হইয়া পড়ে যে, অতি সহজেই সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা জন্মে। যাহা অন্য লোকে দুই ঘণ্টায় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না, তাহা, যিনি যে বিষয় কার্য্যতঃ শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই সমাধা করিয়া ফেলিবেন। বোধ করুন, যদি কোন বিপণীতে একজন কৃতবিদ্য যুবককে দুই ঘণ্টা কালের জন্য বেচা কেনা করিতে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে হয়ত তিনি, যদি কেহ দুই পয়সার ঘৃত ক্রয় করিতে আসেন, তাহা হইলে, কি মাত্রায় ঘৃত দিতে হইবে

তাহা স্থির করিবার জন্য স্লেট পেন্‌সিল লইয়া অঙ্ক কসিতে বসিবেন। যখন তিনি ত্রৈরাশিক কসিতেছেন, যদি সেই সময়ে আর একজন এক পয়সার তৈল লইতে আইসে, তাহার পশ্চাতে আর একজন এক আনার চাউল ক্রয় করিতে আইসে, কৃতবিদ্য যুবকের ত্রৈরাশিক কসা শেষ না হইতে হইতে একেবারে তিনজন ক্রেতা উপস্থিত হইল দেখিয়া উক্ত যুবক মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিবেন এবং কি করিব ভাবিয়া দোকানদারকে ডাকিয়া কহিবেন, "ওহে, তুমি আপন দোকানে আসিয়া উপবিষ্ট হও, আমি হিসাব করিয়া দেখিব, না তোমার খরিদদারগণকে বিদায় করিব?" এই কথা শুনিয়া দোকানদার ঈষৎ হাস্য করত দোকানে আসিয়া দুই চারি মিনিটের মধ্যে সমস্ত খরিদদারদিগকে বিদায় করিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তুমি দুই পয়সায় কতটুকু ঘৃত বিক্রয় করিলে?" মনে করুন, দোকানদার কহিল, "মহাশয়, আমি দুই পয়সায় এই পরিমাণে ঘৃত বিক্রয় করিলাম।" তখন উক্ত কৃতবিদ্য যুবক কিছুক্ষণ ধরিয়া কসিয়া দেখিলেন যে, দোকানদার যথার্থ পরিমাণেই ঘৃত দিয়াছে। তিনি পুনরায় দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কতদূর লেখা পড়া শিখিয়াছ?" তাহাতে দোকানদার হাস্য করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি কেবল দিনকতক পাঠশালায় পড়িয়া ছিলাম, তাহার পর আটবৎসর বয়ঃক্রম অবধি এই দোকানের কাজ কর্ম্ম করিতেছি। সেই কাল অবধি পিতার নিকট বসিয়া তাঁহার খরিদ বিক্রয় দেখিয়া শুনিয়া এক্ষণে আমি সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করিতে উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছি।" এই

কথা শুনিয়া উক্ত কৃতবিদ্য লোকটি বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, কেবল বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কার্য্যকুশল লোক হইতে পারা যায় না; বিদ্যা শিক্ষা করাও চাই এবং সেই বিদ্যাকে ভিত্তি স্বরূপ রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ ক্রমে ক্রমে কার্য্যদক্ষ হইতে হয়।

উপসংহার কালে এইমাত্র বক্তব্য যে, যখন যে কোন বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, তখন তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ না করিলে কখনই তাহা সুচারুরূপে শিক্ষা করিতে পারা যায় না। সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল বালক পাঠশিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী না হয়, তাহাদিগের কখনই জ্ঞান লাভ হয় না। আবার যাহারা পুস্তক সকল কেবল মাত্র পড়িয়া যায়, অর্থবোধের দিকে দৃষ্টি রাখে না ও তাহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করে না, তাহাদিগের পাঠ করা কেবল কর্ম্মভোগ মাত্র। কোন কোন বালক মেধাবী বলিয়া পুস্তকের দুই চারি পৃষ্ঠা মুখস্থ বলিতে পারে, কিন্তু ভাবার্থ জিজ্ঞাসা করিলেই একেবারে চক্ষুঃস্থির হইয়া পড়ে; এরূপ পাঠের প্রয়োজন কি, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, যাহা পাঠ করা যায়, তাহার অর্থবোধ ও মর্ম্ম গ্রহণ করা এবং তাহা হইতে আমাদিগের যাহা যাহা শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা করা ও উপযুক্ত কালে কার্য্যতঃ ব্যবহার করা চাই। লোকের মুখে যাহা শুনিব বা পুস্তকে যাহা পাঠ করিব, তাহা সম্ভব কি অসম্ভব বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; তাহার মধ্যে কোন্‌টি বা কাল্পনিক গল্পমাত্র কোন্‌টিতে বা

কিছু ঐতিহাসিকতা আছে, কোন্‌টি কি উপদেশে পরিপূর্ণ এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বাছিয়া লইতে হয় ও তদনু-সারে শিক্ষা করিতে হয়। জাতিবিশেষের বা ব্যক্তিবিশে-ষের ইতিহাস পাঠ করিয়া তাহাদিগের সদ্‌গুণগুলি শিক্ষা করিতে হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমরা তাহা না করিয়া দোষের ভাগগুলি শিক্ষা করিয়া থাকি। ইংরাজজাতির কার্য্যকলাপ আচারব্যবহার আমরা এক্ষণে সর্ব্বদা দেখি-তেছি ও শুনিতেছি; কিন্তু তাহাদিগের একতা, স্বজাতির মঙ্গলচেষ্টা, সাহস, বীর্য্য ও কার্য্যকারিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের ভাগ আমরা ভ্রমেও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করি না; অথচ তাহাদিগের বিলাস, পানদোষ, অভক্ষ্য ভোজন, যাহা এ দেশের লোকের পক্ষে অনিষ্টকারক, সেই গুলিই আমরা শিক্ষা করিতেছি। অস্মদ্দেশীয় পুরাণাদি পাঠ করিয়া যথার্থ জ্ঞান লাভ ও সুনীতি শিক্ষা করা দূরে থাকুক, কোন কোন ব্যক্তির সম্ভব ও অসম্ভব বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি থাকাতে ভ্রম ও অলীক বিশ্বাস এতদূর জন্মায় যে, তাঁহারা একেবারে অন্ধ হইয়া পড়েন। এরূপ অলীক বিশ্বাসে তাঁহাদিগের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট ঘটে না। পুরাণে লিখিত আছে যে, এক সময়ে বৃত্রাসুরের দৌরাত্ম্যে দেবগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়া ছিলেন। দেবগণ অসুরভয়ে মহাভীত হইয়া নারায়ণের পরামর্শ গ্রহণ জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। নারায়ণ অনেক চিন্তা করিয়া দেবগণকে উপদেশ দিলেন যে, তোমরা দধিচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ কর, সেই অস্ত্রের আঘাতে বৃত্রাসুরের বিনাশ সাধন হইতে পারিবে। দেবগণ দধিচি মুনির নিকট

যাইয়া নানারূপ অনুনয়, বিনয ও স্তব স্তুতি করাতে দধিচি মুনি স্ব-ইচ্ছায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অমরকুল সেই অস্থি লইয়া দেবশিল্পকারকে অর্পণ করায় বিশ্বকর্ম্মা সেই অস্থি দ্বারা বজ্র অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া পুরন্দরকে দিলেন। ত্রিদশেশ্বর সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিবামাত্র বৃত্রাসুরের প্রাণসংহার হইল। এই গল্প পাঠ করিয়া ও শুনিয়া বহুকাল সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, "বজ্র আর কিছুই নহে, ইহা দধিচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত অস্ত্রমাত্র।" অদ্যাপি অনেক লোকের বিশ্বাস আছে যে, দেবরাজ কখন কখন বিশিষ্ট কার্য্যানুরোধে ও দুষ্টের দমনের জন্য এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি এই প্রকার বিশ্বাস অদ্যাবধিও সমস্ত লোকের থাকিত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও বৈজ্ঞানিকদিগের দ্বারা মেঘের ঘর্ষণে তাড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হয় ও আমরা যাহাকে বজ্রাঘাত বলি, তাহা কেবল তাড়িতপ্রবাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এরূপ প্রতিপন্ন না হইত; তাহা হইলে বোধ হয়, মহামঙ্গলকর ও কার্য্যোপযোগী তাড়িত বার্ত্তাবহের সৃষ্টি হইত না। পাঠকগণ! পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, আমরা পুস্তক হইতে বা লোকের মুখ হইতে যাহা কিছু শ্রবণ করি, ব্যক্তিবিশেষের রীতি চরিত্র দেখিয়া তাহার সারাংশ গ্রহণ করা উচিত এবং যাহা সদুপদেশ তাহাই শিক্ষা করা ও তাহার ন্যায্য ব্যবহার করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

জ্ঞানপ্রধান শ্রেণী ও কার্য্যপ্রধান শ্রেণী।

এই সংসারের লোক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক সম্প্রদায় জ্ঞানকেই প্রধান করিয়া ধরিয়াছেন এবং তাঁহারা কেবল শাস্ত্রালোচনা, পুরাণাদি পাঠ, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কালযাপন করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ কোন একটি শাস্ত্রের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে আহার নিদ্রা বিসর্জ্জন করিয়া আপনাপন পক্ষ সমর্থনের জন্য রাশি রাশি গ্রন্থের প্রমাণ সংগ্রহ করতঃ যখন অনর্গল বলিতে থাকেন, তৎকালে তাঁহাদিগের বিচারপদ্ধতি দেখিয়া তাঁহাদিগকে অসাধারণ বিদ্যাবান্ বলিয়া বোধ হয় এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কাহারও কাহারও দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতে হয়। কাহার কাহারও রচনা এরূপ উৎকৃষ্ট ও ব্যাকরণশুদ্ধ যে, তাহাতে কাহারও দন্তস্ফুট করিবার ক্ষমতা নাই। এইরূপ শ্রেণীকেই জ্ঞানপ্রধানশ্রেণী কহা যায়। তাঁহাদিগের সংসার বা বিষয়কার্য্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই; তাঁহারা অর্থকে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ জ্ঞান করেন। অন্য শ্রেণীর লোকেরা বিষয়কার্য্য এবং অর্থকেই প্রধান বলিয়া ধরেন; এই জন্য ইহাঁদিগকে কার্য্যপ্রধানশ্রেণী বলিয়া উল্লেখ করা গেল। এই শ্রেণীর লোকেরা যে কার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংসারের ব্যবহারোপযোগী কোন একটি কার্য্য হইবে,এবং যদ্দারা অর্থাগম

হইবে, সেই চিন্তায় সর্ব্বদা রত থাকেন। তাঁহারা বিজ্ঞান-প্রভাবে স্বভাবকে ভৃত্যের ন্যায় খাটাইবার চেষ্টায় থাকেন, এবং যাহাতে অর্থোপার্জ্জন হইবে, যাহাতে ঐহিক সুখসমৃদ্ধি বা বলবৃদ্ধি হইবে, তাহারই চেষ্টায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন।

জ্ঞানপ্রধান সম্প্রদায়ের সহিত কার্য্যপ্রধান সম্প্রদায়ের এতদূর প্রভেদ যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সহিত কিয়ৎক্ষণ একত্র বাস করিতেও ভালবাসেন না। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। কোন সময়ে একজন জ্ঞানপ্রধান লোকের বাটীতে তাঁহার গুরু আসিয়া উপস্থিত হন। গুরুজী একজন কার্য্যপ্রধান-সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিলেন। তিনি, যাহাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়েই সর্ব্বদা মনোযোগ করিতেন, এবং তাহাতে বিপুল অর্থও উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিলেন। উপর্য্যুপরি দুই বৎসর বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষিকার্য্যের সুপ্রতুল হইল না; এই জন্য তিনি একটি তুলার কল বসাইবার মানসে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহের জন্য শিষ্য সেবকের বাটীতে যাতায়াত করিতেছিলেন। তিনি উক্ত জ্ঞান-প্রধান শিষ্যের বাটীতে উপস্থিত হইলে শিষ্য তাঁহাকে যথাসাধ্য সেবাশুশ্রূষা করিল। তাহার পর আহারান্তে যখন গুরুজী আপন শয্যায় উপবিষ্ট আছেন, তখন শিষ্য গুরুজীর শয্যার নিকট উপ-বিষ্ট হইয়া কহিল, "প্রভু! আপনাকে আমার একটি সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, লোকে অগ্রে কর্ম্মকাণ্ড না করিলে জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হয় না।

এ বিষয়ে আপনার কি মত, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে।” যে সময় শিষ্য এই প্রশ্ন উপস্থিত করিল, গুরু সে সময়ে কৃষিকার্য্যের বিষয় ভাবিতে ছিলেন। তিনি হঠাৎ কহিলেন, “চানা তো হবে না কর্ব্বে।” শিষ্য কহিল, “প্রভু, ও সকল কথা ছাড়িয়া দিউন, এক্ষণে তত্ত্বকথায় মনোনিবেশ করুন।” গুরু কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া কহিলেন, “গহুঁ থোড়া হোয়েগা।” শিষ্য মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “প্রভু! ঐহিকের কথা লইয়া কি জন্য আপনার মন কলুষিত করিতেছেন? তত্ত্বকথায় মনোনিবেশ করুন; এ সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর; ঐহিক সুখ, বেদের বাজীর ন্যায়; আমি অনেক গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, তত্ত্বকথায় যেরূপ তাপিত হৃদয় শীতল হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না।” গুরুজী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “আরে কেয়্যা রে তত্ত্বকথা, তত্ত্বকথা; উস্‌মে ক্যা পেট ভরেগা, না, রোপেয়া পয়্‌দা হোগা; কেতাব পড়্‌কে ক্যা হোগা; কুচ্ কাম করো জিস্‌মে রোপেয়া হোয়; এ বরষ্ দুচার ভুট্টা হুয়া; ওই সে তো লেড়্‌কা বালা কা জীউ হ্যায়; এ বরষ্ তো এক মুটী চানা ঘর্‌কে নেহি গিয়া।” শিষ্য গুরুকে নিতান্ত বিষয়ী লোক জানিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কার্য্যপ্রধান সম্প্রদায় বলেন যে, আমরা যে বহুদিবসাবধি কেবলমাত্র রাজায় রাজায় যুদ্ধের ইতিহাস, কবির কল্পনা, পৌরাণিক গল্প, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিয়া আপনাদিগকে কৃতবিদ্য মনে করি, তাহাতে এক আত্মশ্লাঘা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এদেশের উপাধিধারা

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহারা যে অসহ্য কষ্টভোগ করিয়া চতুষ্পাঠীতে কেহ বা বিংশতিবর্ষ কেহ বা তাহা অপেক্ষাও অধিক কাল যে বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছেন, এইক্ষণে তাহার পুরস্কার একখানি পিতলের থাল এবং নগদ অর্দ্ধ মুদ্রা ভিন্ন আর কিছুই নয়। অর্দ্ধমুদ্রার জন্য যজমান-গৃহে তিন চারি ঘণ্টাকাল অনর্গল মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, উদরান্নের জন্য ধনীর দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের স্তব স্তুতি করিতেছেন, তাঁহাদিগের মনঃতুষ্টির জন্য নানাবিধ ছন্দোযুক্ত শ্রাব্য গভীরভাবাত্মক কবিতা পাঠ করিতেছেন, তথাপি সুখস্বচ্ছন্দে, স্ত্রীপুত্রপরিবারগণের ভরণপোষণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এরূপ বিদ্যায় গৌরব প্রকাশ এবং কতক পরিমাণে নৈতিক উন্নতি (অর্থাৎ) Moral improvement ভিন্ন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৈষয়িক উন্নতি অর্থাৎ Material improvement কিছুই নাই। কার্য্যপ্রধান সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন যে, তাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্যাপ্রভাবে সংসারে কার্য্যোপযোগী তাড়িতবার্ত্তা-বহ ও নানা প্রকার কল প্রভৃতি আবিষ্কার করিতেছেন, এবং তদ্দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন; ব্যবসায়ী লোকের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা স্বহস্তে হল চালনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদেরও অনেকের পর্ণকুটীর ঘুচিয়া ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদি হইতেছে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারগণের অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার উঠিতেছে, অন্য কি কথা, যাহারা সমস্ত দিন মাথায় করিয়া মোট বহন করে, তাহারাও সন্ধ্যার সময় কেহ বা অর্দ্ধমুদ্রা কেহ বা তদপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিয়া

গৃহে প্রত্যাগমন করে, কিন্তু কেরাণীদলের মধ্যে কেহ বা রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দ্বাদশটি রৌপ্যমুদ্রামাত্র বেতন পাইয়া থাকেন। কেবল রাশি রাশি পুঁথি পড়িয়া বিদ্যা-লাভ করিলে এক অহঙ্কার ও গৌরবলাভ ভিন্ন আর কোন ফল দর্শে না। অতএব গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া মানব-চরিত্র, সংসারশিক্ষা প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করতঃ আপনার চরিত্র গঠন কর এবং কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া যে কার্য্যে ধন ও মান লাভ হইবে এরূপ কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া লও। এই পৃথিবীতে কেবল জ্ঞানলাভের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না, কার্য্যক্ষেত্রের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

কার্য্য করিবার কল্পনা ও কার্য্যকারিতা।

আমরা যখন কোন একটি কার্য্যের সূত্রপাত করিবার অভিলাষ করি; তাহার পূর্ব্বে আমরা সেই কার্য্যটি কিরূপে নির্ব্বাহ করিব, তাহার একটি মতলব স্থির করিয়া থাকি। ইংরাজীতে যাহাকে Theory বলে, কার্য্য করিবার মতলবকে আমরা সেই ভাবেই গ্রহণ করিতেছি। মনুষ্যের চিন্তার অবধি নাই; সুতরাং কল্পনা প্রভাবে আমরা অনেক বিষয়ের মতলব স্থির করিতে পারি, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি না। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, কার্য্য করিবার কল্পনা এবং কার্য্যকারিতা অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে Practical Theory বলে, ইহাদের উভয়ের মধ্যে কত দূর প্রভেদ আছে। যখন যুবরাজ রাসেলাস, উপত্যকা ভূমি হইতে কি প্রকারে পলায়ন করিবেন তাহার উপায় চিন্তায় মগ্ন আছেন, সেই সময়ে একজন পণ্ডিত যুবরাজের মনোগত ভাব অবগত হইয়া যুবরাজকে কহিলেন, "রাজনন্দন! আপনার যদি নিতান্তই এস্থান হইতে পলাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই।" রাসেলাস মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং পণ্ডিতবরকে তৎকার্য্য সাধনের উপায় শীঘ্র উদ্ভাবন করিতে বলিলেন। পণ্ডিতবর কিছু দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিবস রাজপুত্রকে কহিলেন, "দেখুন, যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, বৃহৎ বৃহৎ পক্ষিগণ দুইখানি পক্ষ সঞ্চালন

করিয়া অনায়াসে গগনমার্গে উড়িয়া বেড়াইতেছে, তখন আমরাও যদি নানা উপকরণ-সংযোগে সেইরূপ পক্ষ প্রস্তুত করি, তাহা হইলে অনায়াসে বাতাসের উপর ভর দিয়া এই উপত্যকা ভূমি অতিক্রম করিতে পারিব।" রাসেলাস সে সময়ে একপ্রকার বুদ্ধিহারা হইয়াছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ এ কথা বিশ্বাস করিলেন। বিশেষতঃ পণ্ডিতবর এই কার্য্য নির্ব্বাহের প্রণালী Theory দ্বারা রাসেলাসকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, এই-রূপে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে আকাশে উঠিতে পারিবেন। অব-শেষে তাঁহারা দুইজনে নানা উপকরণে দুইখানি পক্ষ প্রস্তুত করিলেন এবং যখন তাঁহাদের স্থির বিবেচনা হইল যে, পক্ষদ্বয়ের সাহায্যে তাঁহারা উড়িতে পারিবেন, তখন প্রথমত পণ্ডিতবর আপনার দুই পার্শ্বে দুইখানি পক্ষ বাঁধিয়া একটি উন্নত ভূমির উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সেই স্থান হইতে উড়িবার জন্য পক্ষ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যেমন উপত্যকা ভূমি হইতে পদদ্বয় ছাড়িয়া দিয়া উড়িতে যাইবেন, অমনি নিম্নস্থ জলাশয়ে পতিত হইলেন, আর উড্ডয়ন হইল না। জলাশয়ে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রাণরক্ষা হইল। পাঠকগণ! বিবে-চনা করিয়া দেখুন, যদিও পণ্ডিতবর কল্পনা দ্বারা উড্ডয়ন কার্য্য সম্বন্ধীয় প্রক্রিয়া একরূপ স্থির করিয়াছিলেন এবং রাসেলাসকে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; রাসেলাসও তাহা শুনিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, এরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা নিশ্চয়ই আকাশমার্গে উঠিতে পারা

যাইবে; কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিল না। কারণ, Theory দ্বারা যাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, সময়ে সময়ে একটু সামান্য ত্রুটি বশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না।

মনুষ্য-বুদ্ধিতে কোন কার্য্যের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিতে পারে, সমস্ত বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক চিন্তা ঘটিয়া উঠিতে পারে না। যদিও আমরা দেখিয়া শুনিয়া কোন একটি কার্য্য করিবার মতলব ও প্রক্রিয়া স্থির করি বটে, কিন্তু আমরা কার্য্যে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, যাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই সেই সকল ঘটনা এই কার্য্যের ভিতরে আছে। Theory র অভ্যন্তরে যে কতকগুলি ভ্রম প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাহা আমরা কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ততদূর বুঝিয়া উঠিতে পারি না; কার্য্যে প্রবেশ করিয়া সেই গুলি ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাই। বোধ কর, দুইজন ধনাঢ্য যুবক ব্যবসায়-কার্য্যকে আপাততঃ সহজ জ্ঞান করিয়া মনে মনে ইচ্ছা করিলেন, আমরা দুইজনে ব্যবসায়-কার্য্য করিব। এ বৎসর চাউল অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, এই সময়ে যদি দশ হাজার মণ চাউল খরিদ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দুই মাসের মধ্যে দেড়া দরে বিক্রয় করিতে পারিব। আমাদের টাকা আছে, বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, তবে কেন না আমরা লাভ করিতে পারিব? পুঁজির উপর রীতি মত চোক রাখিয়া ব্যবসায়-কার্য্য করিলে লাভের ভাবনা কি? এইরূপে দুইজনে ব্যবসা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর অনেক কল্পনা হইল এবং ধার্য্য হইল যে, এখন পঞ্চাশ হাজার টাকার চাউল খরিদ হউক, চাউলের দর না চড়িলে

বিক্রয় করিব না; যত দিন না দর বাড়িবে তত দিন না হয় দোকানে ধরিয়া রাখিব—আমাদের ত আর হাঁড়ি ঠন্‌ঠন্‌ করিতেছে না, যে, ব্যবসায়ের আয় হইতে গুজরাণ নির্ব্বাহ করিতে হইবে। চাউলের মূল্য দেড়া না হইলে চাউল গুদামজাত করা থাকিবে। অল্পপুঁজি লোকেরাই ব্যবসায়-কার্য্য করিতে গিয়া মারা যায়। আমাদের ভয় কি? আমরা মাল এইরূপে ধরিয়া রাখিব, তাহাতে এ বৎসর কিছু লোকসান ঘটে, সহ্য করিব। এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া উভয় বন্ধু মহাজনপটীতে একটি নূতন আড়ত করিলেন। দুই তিনটি প্রশস্ত গুদাম ভাড়া লওয়া হইল। তাহার পর উপর্য্যু-পরি সপ্তাহকাল তণ্ডুল ক্রয় করিয়া দুই তিনটি গুদাম পরি-পূর্ণ করিয়া রাখিলেন; আড়তেও অল্প স্বল্প খরিদ বিক্রয় চলিতে লাগিল। বাবুরা দুই জনেই সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান; বাক্স কোলে করিয়া আড়তে বসিতে লজ্জা বোধ হয়; বিশে-ষতঃ, যাঁহাদিগের সর্ব্বক্ষণ উচ্চ গদির উপর শয়ন ও উপবেশন করা অভ্যাস, তাকিয়ার উপর শরীরের ভর না রাখিলে সোজা হইয়া বসিতে পারেন না, তাঁহারা কি চাউ-লের দোকানে মাদুরের উপর বসিয়া থাকিতে পারেন, না থেলো হুঁকায় দা-কাটা তামাকু খাইয়া তাহাদের তৃপ্তিবোধ হয়? দুই দশ দিবস আড়তে আসিয়া বাবুদিগের বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। ব্যবসায়স্থলে অনেক চতুর লোক অব-স্থান করে, তাহারা দেখিল যে, দুইজন যুবক আসিয়া চাউলের কার্য্য আরম্ভ করিল; কি সূত্রে লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়, তাহা তাহারা বিলক্ষণ অবগত আছে। এক

দিবস এক জন এক মুটা চাউল হস্তে করিয়া বাবুদের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহাশয়! আপনারা এই চাউল কতক পরিমাণে কিনিয়া রাখুন, ইহার দর খুব সুলভ আছে; কি করিব, পূর্ব্বে আপনাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ছিল না, তাহা হইলে কি আপনাদিগকে বালাম চাউল কিনিয়া গুদাম পূরিতে দিতাম? আপনারা নূতন ব্যবসায়কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন, এখনও ইহার হাটহদ্দ বুঝিতে পারেন নাই। বালাম চাউল কেবল সহরের লোকই ক্রয় করিয়া থাকে; মোটা চাউল চারিদিকে ব্যবহার হয়। আপনারা যে টাকায় বালাম চাউল ক্রয় করিয়াছেন, ইহাতে দ্বিগুণ পরিমাণে মোটা চাউল ক্রয় করা হইত; লাভও মোটা চাউলে হইয়া থাকে। মহাশয়, বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন, দাদখানি চাউল শালিয়ানা এই মহাজন পল্লীতে কত মণ বিক্রয় হইয়া থাকে, আর খেয়ারি চাউলই বা কত লক্ষ মণ বিক্রয় হয়? না বুঝিতে পারিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আর কথা নাই, কিন্তু বিক্রয় করিবার সময় একটু সাবধান হইয়া চলিবেন; তাহা না হইলে আসল টাকা তোলা ভার হইয়া পড়িবে।"

এইখানে একটা কথা বলিতে বাধ্য হইলাম যে, যে, যে কার্য্যে পারদর্শী, সে, সে কার্য্যের কথা উত্থাপিত হইলে তর্কের দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়া লয়; অনভিজ্ঞ লোকেরা যার তার কথায় আস্থা করে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পণ্ডিতেরা তার্কিক আর মূর্খেরা ভক্তিমান্। নিতান্ত একটা অমূলক কথাও সাজাইয়া গুজাইয়া বলিতে পারিলে

তাহারা সেই কথায় বিশ্বাস করে; কিন্তু পণ্ডিতেরা কখন অমূলক ও অলীক কথায় বিশ্বাস করেন না। যদি কেহ কোন ইতর লোকের কাছে আসিয়া গল্প করে যে, "অমুক গ্রামে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া এক চতুর্ভুজা কালী-মূর্ত্তি আভির্ভূতা হইয়াছেন, একজন কৃষকের প্রতি তিনি এইরূপ স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন যে, তুই যাহাকে যাহা হস্তে করিয়া দিবি, তাহাতেই সে উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবে।" এই কথা শ্রবণ মাত্রই মূর্খলোকেরা সেইখানে ছুটিতে আরম্ভ করিবে; সত্যাসত্যের কিছুই অনুসন্ধান লইবে না; কিন্তু পণ্ডিতেরা কখনই হঠাৎ সে কথায় বিশ্বাস করিবেন না।

যে দুইজন বাবু চাউলের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার আছে; কিন্তু তাঁহারা ব্যবসায়কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এ দিকে যে ব্যক্তি তাঁহাদিগের নিকট এক মুটা চাউল হস্তে করিয়া আসিয়াছে, তাহার বিদ্যাসাধ্য কিছুই নাই, কিন্তু সে ব্যবসায়কার্য্যের ভাব গতিক বিলক্ষণ বুঝিতে পারে ও অনভিজ্ঞ ব্যবসায়দারগণের মন ভুলাইবার নানা ছাঁদের কথা রচনা করিতে জানে। বাবুরা বালাম চাউল কিনিয়া ভাল করেন নাই, ঐ ধূর্ত্তলোকের কথায় তাঁহাদিগের একেবারে বিশ্বাস হইয়া গেল। তাঁহারা ঐ ধূর্ত্তলোককে "কহিলেন, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, গদির উপর উঠিয়া বসুন; আপনার নিকট ব্যবসায় কার্য্য সম্বন্ধে দশটা উপদেশ গ্রহণ করি।" ধূর্ত্ত মনে মনে বিবেচনা

করিল, আমি তাহারই জন্য আসিয়াছি, প্রকাশ্যে কহিল, "এ কি কথা মহাশয়, আপনারা ভদ্রলোক, ব্যবসায়কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগের যাহাতে মঙ্গল হয়, আমি সাধ্যানুসারে তাহা অবশ্য করিব, একেবারেই কি ব্যবসায়-কার্য্যে লোকে ঘুণ হইয়া পড়ে? আমি যখন এই বাণিজ্য সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া ছিলাম, তখন ইহার কিছুই বুঝিতাম না; এক্ষণে দেখিয়া দেখিয়া এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি যে, প্রত্যুষে মহাজনপটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া দিতে পারি যে, আজ কাল কোন্ জিনিস কতদরে বিক্রয় হইবে।" বাবুদ্বয় ঐ ধূর্ত্তের বচন-চাতুর্য্যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এবং বলিলেন, "মহাশয়, না বুঝিতে পারিয়া যে বালাম চাউলগুলা ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে কি আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে?" ঐ ধূর্ত্ত কহিল, "আপনারা উতলা হইবেন না, যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, আমি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিব। আর একটা কথা বলিতেছি, আপনারা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন, যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা আপনারা একা এক করিয়া উঠিতে পারিবেন না। উপযুক্ত দেখিয়া একজন গোমস্তা নিযুক্ত করুন; তুইটি ভাল মুহুরি সেই গোমস্তার সহকারী নিযুক্ত করিয়া দিউন। ব্যবসায় কার্য্যের খাতা পত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখা উচিত, কারণ, ধার ধোর দেওয়া ব্যতিরেকে ব্যবসায় চলে না, অনেক সময়ে তুষ্টলোকের নিকট হইতে নালিসের দ্বারা টাকা আদায় করিতে হয়; আইন আদালত করিতে গেলে, ব্যবসায়দারের পক্ষে খাতাই

সর্ব্বস্ব—মহাশয়, কিছু মনে করিবেন না, আমি ভাল কথাই বলিতেছি। শুনিতে পাই আপনারা ন্যূন্যাধিক পঞ্চাশ হাজার টাকার চাউল ক্রয় করিয়াছেন; কিন্তু আমাকে দেখান দেখি, কোন্ কোন্ মহাজনের নিকট কি কি দরে তণ্ডুল ক্রয় করা হইয়াছে ও তণ্ডুল গুদাম জাত করা অবধি সমস্ত ব্যয় খতাইয়া মনকরা কত পড়তা হইতেছে।" এই সকল কথা শুনিয়া বাবুরা বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহারা চীনাবাজার হইতে দুই খানি বাঁধান পুস্তক আনিয়া ইংরাজীতে আপনারাই খরিদ বিক্রয় লিখিয়া রাখিতেন। কোন্ কোন্ মহাজনের নিকট চাউল ক্রয় করিয়াছিলেন, খাতায় তাহা স্পষ্ট লিখিয়া রাখেন নাই; চাউলে মণকরা কত পড়তা হইয়াছে, তাহাও ঠিক বলিতে পারিলেন না, সুতরাং লজ্জায় অধোবদন হইলেন। সেই ধূর্ত্ত ব্যক্তি মনে মনে ভাবিল, আর কোথায় যাও, কায়দায় আনিয়াছি ; এক্ষণে তারের পুতুলের ন্যায় নাচাইব। কিন্তু এখানে আর অধিক বিলম্ব করা হইবে না ; আমি যে অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলাম, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ চিন্তার পর প্রকাশ্যে কহিল, "মহাশয়, আমি আর বসিতে পারি না; এই চাউলগুলি রহিল, যদি যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় তো কিছু ক্রয় করিয়া রাখিবেন।" বাবুদ্বয় কহিলেন, "বলিতে পারি না, কৃপা করিয়া যদি প্রত্যহ এক একবার আমাদের আড়তে পদধূলি দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হই।" ধূর্ত্ত কহিল, "একি কথা মহাশয়, সাবকাশ মতে আমি অবশ্য আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব; কিন্তু দেখিবেন, মহাশয়, সময় বড় মন্দ, সাবধানতা

ও সতর্কতার সহিত কার্য্য করিবেন।” এই কথা বলিয়া ধূর্ত্ত সে দিবস স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ধূর্ত্ত প্রস্থান করিলে পর বাবরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, লোকটি যাহা বলিয়া গেল, এ কথা গুলি নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত; আমাদিগের খাতাপত্র রীতিমত রাখা হইতেছে না; আর একজন কাজীকামি লোককে গোমস্তা না রাখিলে চলিবে না। ভাল একজন গোমস্তা কোথায় পাইব? কল্য ঐ ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করা যাইবে। এইরূপ নানা কথার পর উভয়ে স্নানাহারের জন্য আপনাপন বাটিতে চলিয়া গেলেন। বৈকালে দুই বাবুতে পুনর্ব্বার গদিতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলে প্রাতের সেই ধূর্ত্ত আর এক জন চরকে পাঠাইয়া দিল। সে গদিতে আসিয়া বলিল, “মহাশয়েরা বালাম তণ্ডুল বিক্রয় করিবেন কি?” বাবুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজকাল বালামের দর কি?” সে কহিল, “তিন টাকা এক আনা।” বাবুরা কহিলেন, “গত কল্য তিন টাকা তিন আনা ছিল।” আগন্তুক হাস্য করিয়া কহিল, “কল্য প্রাতে কেন, অদ্য প্রাতেও তিন টাকা দুই আনা করিয়া খরিদ বিক্রয় হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে এক আনা বাজার পড়িয়া গেল। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, দুই চারি দিবসের মধ্যে বালামের বাজার মাটী হইয়া যাইবে। যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বালাম চাউল আর ধরিয়া রাখিবেন না, ইহার পর ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।” এই কথা শুনিয়া বাবুরা মনে মনে ভয় পাইলেন। একজন বাবু অন্য জনকে কহিলেন, “দেখ, প্রাতে সেই

লোকটি যাহা বলিয়া গিয়াছে, তাহাই ঘটিল। চাউল গুলা বিক্রয় করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য।” বাবুরা চুপি চুপি এই পরামর্শ করিতেছেন, সেই সময় আগন্তুক কহিল, “মহাশয়! চাউল বিক্রয় করিবেন কি না বলুন, আমাকে আবার অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে হইবে।” বাবুরা কহিলেন, এ কথার উত্তর আমরা কল্য দিতে পারি।” আগন্তুক “তাহাই দিবেন,” বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। তাহার হাসি দেখিয়া বাবুদিগের মনে আরও ভয় হইল। এইরূপে সে দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। পর দিবস প্রাতে বাবুরা আড়তে আসিয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব্বদিনের সেই ধূর্ত্ত দালাল তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারা দেখিবামাত্র ব্যস্ত হইয়া চীৎকার স্বরে কহিলেন, “ওগো মহাশয়, একবার আসিতে হইবে, ওগো মহাশয়, একবার এদিকে আসিলে ভাল হয়।” কিন্তু সেই ধূর্ত্ত ব্যক্তির মুখ ফিরাইতে অবকাশ হইল না, পশ্চাৎ দিকে হাত নাড়িয়া কহিল, “এক্ষণে পারিব না, বড় ব্যস্ত।” এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সে ব্যক্তি না আসাতে বাবুরা কিছু দুঃখিত হইলেন। পরন্তু দুই তিন ঘণ্টা পরে সেই ধূর্ত্ত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল ও কহিল, “মহাশয়, কিছু মনে করিবেন না, তৎকালে বড় ব্যস্ত ছিলাম, সেই জন্যই নিতান্ত অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি।” বাবুরা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, “বসুন, বসুন” বলিয়া মহাসমাদরের সহিত তাহাকে বসাইলেন; সেই ধূর্ত্ত ব্যক্তি সুস্থ হইয়া বসিলে পর বাবুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “অদ্য বালাম চাউলের কিরূপ

বাজার দেখিলেন ?” ধূর্ত্ত কহিল, “বাদামের বাজার দিন দিন পড়িয়া যাইতেছে, গতিক বড় মন্দ।” বাবুরা কহিলেন, “এক্ষণে উপায় ?” ধূর্ত্ত দালাল কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিল, “আমার বিবেচনায় কিঞ্চিৎ লোকসান সহ্য করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলাই যুক্তি।” বাবুরা কহিলেন, “মহাশয়, আপনি থাকিয়া চাউল গুলার কিনারা করিয়া দিতে হইবে। আর একটা কথা বলিতে ছিলাম, আপনি গতকল্য যে একজন গোমস্তা ও দুইজন মুহুরি রাখিবার কথা বলিয়াছিলেন, আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, তাহা না হইলে কোন ক্রমেই কাজ চলিবে না, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই তিনটি লোক মনোনীত করিয়া দেন, তাহা হইলে, আমাদের যথেষ্ট উপকার করা হয়।” দালাল মনে মনে ভাবিল যে, লোক কল্যই স্থির করিয়া রাখিয়াছি; গোমস্তা আমার শ্বশুর ও দুই মুহুরি আমার দুই ভাগিনেয; তাহারা কয়েক মাস বেকার বসিয়া রহিয়াছে, এমন সুখের চাকুরি তাহাদিগকে ভিন্ন আর কাহাকে দিব। প্রকাশ্যে কহিল, “মহাশয় আপনারা নূতন ব্যবসায়দার, কাজকর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারেন না, আপনা-দিগকে লোক দিতে হইলে একটু বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে; এই কথা বলিতে বলিতে যেন হঠাৎ স্মরণ হইল, এইরূপ ভাণ করিয়া দালাল কহিল, “হা হা, বটে বটে, অভয়চরণ নন্দী শ্রীমানীদের ঘর ছাড়ুবো ছাড়ুবো কচ্চে; কিন্তু সে ত মাহিনার চাকর হইবে না, যদি তাহাকে চার আনা অংশ দিতে স্বীকৃত হন, তা হলে এ কথা তাহার কাছে আমি উত্থাপন করি। আপনি আর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা

কোর্‌বেন, অভয়বাবু হতেই শ্রীমানীদিগের শ্রী।” বাবুরা বোল্লেন, “আপ্‌নি কি আর মিথ্যা কথা বোল্‌চেন,আমরা আবার কাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌বো ?” ধূর্ত্ত দালাল কহিল, “দেখিবেন, অভয় বাবু চার পাঁচ মাস কাজ কোর্‌লে আপনাদিগের কিরূপ উন্নতি হয়।” এইরূপে সেই চতুর দালালের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া বাবুরা অভয়কেই গোমস্তাগিরি পদে নিযুক্ত করিলেন, পূর্ব্বকথিত দালালের দুই জন ভাগিনেয় আসিয়া মোহরের হইল। অভয় গদীতে বসিয়াই বালাম তণ্ডুল গুলা দিন কয়েকের মধ্যে সমুদয় বিক্রয় করিয়া ফেলিল। ছয় মাস বেকার ছিল, বাটিতে এক কড়াও পাঠাইতে পারে নাই; বাবুদের বালাম তণ্ডুল নাড়াচাড়া করিয়াই অভয়ের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দূর হইল। দালালের প্রস্তাবানুসারে বালামের পরিবর্ত্তে অভয় মোটা চাউল কিনিয়া গুদাম্‌ পরিপূর্ণ করিল। দুইজন মুহুরি খাতা পত্র লিখিতে লাগিল। অভয়ের কার্য্যদক্ষতা দর্শনে বাবুরা সন্তুষ্ট হইলেন। দুই এক মাস কার্য্য করিয়া অভয় বাবুদিগকে কহিল, “মহাশয়, দুই একটা মোকাম না করিলে কাজ কর্ম্মের সুবিধা হইবে না। আপাততঃ কাল্‌না হট্টতে আমি কতকগুলি মুগী চাউল কিনিবার মনস্থ করিয়াছি, এই সময়ে আপনাদিগকে কিছু টাকা বাহির করিতে হইবে,আমি স্বয়ং কাল্‌নার গঞ্জে বসিয়া সওদা করিতে থাকিব।” বাবুরা এক্ষণে অভয়-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, সুতরাং কাল্‌নার গঞ্জে ও চূর্ণী নদীর উপকুলস্থ হাঁসখালি নামক প্রধান বন্দরে দুইটি মোকাম হইল। অভয় কখন বা কাল্‌নায় কখন বা হাঁসখালিতে কখন বা কলিকাতায়, এইরূপ নাটাই

ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুহুরিরা খাতাপত্রে বিলক্ষণ লাভ দেখাইতে লাগিল। অমুকের নিকট বালাম চাউলের দরুণ খাতায় লাভ হইল; কিন্তু পুঁজি কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, বাবুদের সাধ্য কি যে তাহা বুঝিয়া উঠেন। কাল্না মোকামের খাতায় লাভ, হাঁসখালিতে লোক্সান, কখন বা কলিকাতার খাতায় লাভ, কাল্নায় লোক্সান, এইরূপ হইতে লাগিল। এদিকে অভয় ইঁদুরের মাটী ফেলা করিয়া পুঁজির প্রায় এক চতুর্থাংশ আপনার বাটীর সিন্দুক জাত করিল। তিন্ন মোকামের বাসায় গড়ে তুইবেলা পঞ্চাশখানা করিয়া পাত পড়িতেছে। কলিকাতার বাসায় মুহুরিদিগের কুটুম্ব এক দিবস ছাড়া নাই। কার্য্য আরম্ভ হইয়া অবধি ব্যবসায়-কার্য্যের তহবিল হইতে বাবুরা একদিবসের জন্যও এক কপর্দ্দকও খরচ করেন নাই। অভয় কেবল মধ্যে মধ্যে খাতায় লাভ দেখাইয়া দিতেছে। একবার অভয় পঞ্চাশ হাজার মণ মোটা চাউল একজন ইংরাজ বণিক্‌কে বিক্রয় করিল, পনর দিবসের পর টাকা দিবার কথা ছিল; কিন্তু সেই এক পক্ষের মধ্যেই সে হাউসটি ফেল হইল। বাবুরা সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। অভয় কহিল, "মহাশয়, আপনারা ভয় পাইবেন না। দ্বিতীয়বারে সুদে আসলে তুলিয়া লইব।" এই দুর্ঘটনার তুই চারি মাস পরে সংবাদ আসিল যে, হাঁসখালির বন্দরে আগুন লাগিয়া বন্দর একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে। এই তুই ঘটনায় বাবুরা যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, কিন্তু তখনও ব্যবসায় করিবার সাধ মিটে নাই; অভয় তখনও মূলধনে টান

দিবার চেষ্টা দেখিতেছে। সে সময় বাবুদের একজন নিতান্ত আত্মীয় এই সকল সংবাদ পাইয়া তাহাদিগের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল ও আনুপূর্ব্বিক ঘটনা তাঁহাদিগের নিকট শুনিয়া কহিল, "একেবারে সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ! এক্ষণে ক্ষান্ত হও, এখনও ক্ষান্ত হও। যাহারা চিরকাল কেবল সুখভোগ করিয়াছে, টাকার সুদ ও বাটীর ভাড়ায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে, তাহাদিগের ব্যবসায়কার্য্য কেন?" বৃদ্ধের কথা শুনিয়া বাবুরা বলিলেন, "বুঝিতে না পারিয়া একটা কার্য্য করা গিয়াছে, এক্ষণে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করি। বাজারে অনেক লহনা পড়িয়াছে, সে গুলা গুটাইয়া না লইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিতে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।" বৃদ্ধ কহিল, "ক্ষতিগ্রস্ত হইতে আর বাকি নাই; এখনও যদি কার্য্য পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে, আরো ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। যাহা লহনা পড়িয়াছে, তাহা নালিশ করিয়া দাও, ব্যবসায় চালাইয়া আদায় করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা যাঁহাদিগের নিকট ঋণী আছ, কড়ায় গণ্ডায় অগ্রে তাহা পরিশোধের চেষ্টা দেখ। আর বিলম্ব করিও না; ইহার পর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও কিছু থাকিবে না। আমার কথা শুনিয়া কল্যই প্রাতে আড়তে যাইয়া খাতা পত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, ভিতরে ভিতরে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিবে। ব্যবসায়ের রীতি এই, পাওনা শীঘ্র আদায় হয় না; কিন্তু ভদ্রলোককে শির অবনত করিয়া দেনা পরিশোধ করিতে হয়। তোমরা যদি নির্ধন ও ছোট লোক হইতে, তাহা হইলে, ইন্‌সল্‌ভেণ্ট আইনের প্রশ্রয় পাইতে

পারিতে; কিন্তু সে ভরসা তোমাদিগের একেবারে নাই। আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, আড়ত তুলিয়া দিয়া পৈতৃকধনের উপস্বত্ব ভোগ কর।” বাবুদ্বয় বৃদ্ধের কথা মত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যবসায়-কার্য্যে ন্যূনাধিক লক্ষমুদ্রায় জল দিয়া ঘরে আসিয়া বসিলেন। লক্ষ টাকা নষ্ট করিয়া তাহাদিগের এই শিক্ষা হইল যে, “মনে মনে যাহা কল্পনা করা যায়, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। সেই কল্পনা মত কার্য্য করিবার সময় অনেক বিঘ্ন ঘটে, ইহা আমরা পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখি নাই; এক্ষণে কার্য্যগতিকে তাহা শিক্ষা করিলাম। যে সময় ব্যবসায়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, সে সময় ভাবিয়াছিলাম যে, দশ হাজার টাকার চাউল কিনিয়া রাখিব; মহার্ঘের বাজারে দেড়া দরে নগদ টাকা লইয়া বিক্রয় করিব। নগদ টাকা দিয়া চাউল খরিদ করে, এমন ব্যবসায়দার যে বাজারে অতি অল্পই আছে, ব্যবসায়ের ভিতরে যে এত প্রতারণা আছে—অগ্নি ভয় আছে, ভরাডুবী আছে, চাউল অধিক দিন ভিজে মাটীতে থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়, কীটাদিতে ধ্বংস করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ দ্রব্য কিনিয়া মূল্য দেয় না, মনুষ্যের স্বভাব ও লোক চিনিবার আবশ্যক রাখে—এ সকল একবারও ভ্রমেও ভাবি নাই। এখন একটি প্রবাদ কথা আছে যে, ‘আটে পিঠে দড়, তো ঘোড়ার উপর চড়।’ সেটি সত্য কথা। কেবল কার্য্যপ্রণালীর কল্পনা মাত্রে বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অতি অন্যায়।”

———

কৰ্ত্তব্য।

কৰ্ত্তব্য শব্দের প্রকৃত অর্থ উচিত কার্য্য। এক্ষণে দেখা যাউক, উচিত কার্য্য কাহাকে বলে। যাহা ন্যায়, যুক্তি ও ধৰ্ম্ম সঙ্গত, যে কার্য্য করিতে আমাদের মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না বরং স্ফূর্ত্তি জন্মে, যে কার্য্য আমাদিগের সদ্বিবেচনাশক্তির অনুমোদিত, তাহাই উচিত কার্য্য। এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মনুষ্যের আপনাপন অবস্থা ও অধিকার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য আছে। মনুষ্য এই জগতে জন্মগ্রহণ করিলেই জগতের সহিত তাহার একটি সম্বন্ধ ঘটনা হয়। পৃথিবীতে যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তাহার প্রতি সেইরূপ উচিত ব্যবহার করাকেই কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম বলা হয়। আমাদিগের যে কোন কার্য্য উপস্থিত হউক না কেন, আমরা মনে মনে সংক্ষেপে তাহার হেতুবাদ করিয়া কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য স্থির করিয়া লই। কোন একটি গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে আমরা কতকগুলি বুদ্ধিমান্ লোকের পরামর্শের অপেক্ষা করিয়া থাকি। তাঁহারা সেই কার্য্যটির উপর বিশিষ্ট বিধানে হেতুবাদ করিয়া কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য স্থির করেন; অর্থাৎ সে কার্য্যটি করা উচিত কি না, তাহারই মীমাংসা করিয়া থাকেন। সেই হেতুবাদ দ্বারা যাহা বিবেচনাসিদ্ধ হয়, তাহাই কৰ্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে প্রকৃত কৰ্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সুনীতিসম্বন্ধীয় কৰ্ত্তব্য প্রায় সকলের পক্ষে সমান;

আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে, সর্ব্বতোভাবে শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কুপ্রবৃত্তির মনে উদয়মাত্রই তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা দেখিবে, পিতা-মাতার সেবা করা কর্ত্তব্য, সৎলোকের ও গুরুজনের উপদেশানুসারে কার্য্য করা উচিত, এই সকল কর্ত্তব্য সুনীতিসম্বন্ধীয়, ইহাতে মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য জাতিভেদে কাল-ভেদে অবস্থাভেদে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে ও একটি কর্ত্তব্যের অনুরোধে অপরটি বৃত্তিবিরুদ্ধ হইলেও তাহা প্রতি-পালনের ব্যাঘাত জন্মে; এরূপ স্থলে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠে।

বোধ কর, একজন কুলীনের তিন চারিটি কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। তাহাদিগের বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে কুলীনপুত্র বহু অন্বেষণ করিয়াও উপযুক্ত ঘর পাইতেছেন না। কন্যার বয়ঃক্রম প্রায় একাদশ উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এক দিকে শাস্ত্র বলিতেছে, অষ্টম বৎসরই কন্যাদানের মধ্য কাল, নয় দশ বৎসরের কন্যা দান করিলেও ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয় না; কিন্তু একাদশবর্ষীয়া কন্যা যদি পিতৃগৃহে রজঃস্বলা হয়, তাহা হইলে সেই বংশের সপ্ত পুরুষকে নরকগামী করিবে। অন্যদিকে সমাজ বলিতেছে, অপাত্রে কন্যা দান করিও না; স্বঘরের পাত্র যত দিন না পাইবে, তত দিন অবিবাহিতাবস্থায় কন্যাকে গৃহে রাখিয়া দাও। নিম্ন ঘরে কন্যা দান করিলে কৌলীন্য-মর্য্যাদার হানি হইবে। এরূপ অবস্থায় কুলীনপুত্র কি করিবেন? সর্ব্বদা দেখা যাইতেছে যে, কুলীনকন্যারা সঙ্গোপনে না করিতেছেন

এমন কার্য্যই নাই, তাহাতে কুলমর্য্যাদার কিছুমাত্র হানি হইতেছে না; কিন্তু নিম্ন ঘরে কন্যা দান করিলেই একে-বারে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে, কুলের মস্তকে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সেই ভয়ে কুলীনপুত্র ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না; কেবল সমাজের অনুরোধে কন্যাগুলিকে দীর্ঘকাল অবিবাহিতাবস্থায় রাখিয়া দিলেন। এ স্থলে উক্ত কুলীন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মনীতি রক্ষা করিতে না পারিযা সামাজিক নীতির প্রতিপালনই কর্ত্তব্য বোধ করিলেন।

কোন এক ব্রাহ্মণ অশীতিবর্ষবয়স্কা জননীকে গঙ্গা-তীরস্থ করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ একাদশীর দিবস বৃদ্ধার মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যুর তিন চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে বৃদ্ধা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে কহিলেন, "পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছে, একটু জল দাও, খাইব।" পুত্র বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, "মা! পুত্র হইয়া আজ তোমার মুখে আমি কেমন করিয়া জল দিব? আজ যে একাদশী।" বৃদ্ধার আসন্নকাল উপস্থিত, মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন, পুত্রের মুখে একাদশীর কথা শুনিয়াও পুনর্ব্বার কহিলেন, "হউক একাদশী, তুমি জল দাও, প্রাণ যায় একটু জল দাও।" জননীর মুখে পুনর্ব্বার এই কথা শুনিয়া উপযুক্ত পুত্র সমভিব্যাহারী কয়েক জন শাস্ত্রব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্যের মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কহিলেন, "তাহা কি হইতে পারে, একাদশীর দিন বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখে জল দিবার ব্যবস্থা আমরা দিতে পারিব না; তোমার জননী চিরকাল ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিলেন, অনেক

ব্রত নিয়ম করিয়াছেন, একাদশীর দিনে জল খাইয়া কি সমস্ত পুণ্য নষ্ট করিবেন?” বৃদ্ধার পুত্র পুনর্ব্বার কহিল, “তবে কি না দেওয়াই বিধি?” ভট্টাচার্য্যগণ কহিলেন, “ধর্ম্মানুসারে না দেওয়াই বিধি।” ব্রাহ্মণপুত্র তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। এরূপ কর্ত্তব্যকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কহিয়া থাকে। এরূপ কার্য্যের সহিত নৈতিককার্য্যের কতদূর সংশ্রব, পাঠকগণ, একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

এক প্রকার কর্ত্তব্য সকলের পক্ষে সমান নহে। বিবেচনা করুন যে, প্রায় গতাসু অতিবৃদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যা মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আপনার গর্ভজ পুত্রের নিকট একাদশী বলিয়া একগণ্ডূষ জল প্রার্থনা করিয়া পাইল না। যদি একজন ইউরোপীয়ের জননী মৃত্যুকালে তাহার পুত্রের নিকট জল প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলে তিনি তৎকালে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচার করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে যাইতেন না, প্রার্থনামাত্রই জলদানে জননীর পিপাসার শান্তি করিতেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে এক বিষয় এক স্থলে যুক্তিসঙ্গত হইলেও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা অকর্ত্তব্য প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু অন্য স্থলে সেই কার্য্য এতদূর ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত যে, তাহার আর হেতুবাদের প্রয়োজন হয় না। একজন ধনবান্ লোকের নিজ ধন দ্বারা দরিদ্রের দুঃখমোচন করা কর্ত্তব্য। তিনি কিম্বা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবেই হউক বা অদৃষ্ট প্রসন্ন বলিয়াই হউক, বিপুল ধনের অধীশ্বর

হইয়াছেন। তাঁহার অপর্য্যাপ্ত ধন আছে বলিয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহার পক্ষে কতকগুলি কার্য্য নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যথা, ধনবানের বাটী হইতে যাচক বিমুখ হইলে সমাজের লোক তাঁহাকে নিন্দা করিতে থাকে। পিতৃমাতৃবিয়োগ হইলে, তিনি যদি আপন ক্ষমতানুসারে ধনব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধশান্তি না করেন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে কৃপণ ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় বলিবে। কোন ধনবান্ যদি ভূম্যধিপতি হন, তাহা হইলে তাঁহার এলাকাভুক্ত কোন জমিদারীর মধ্যে যদি জলকষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সাধারণে কহিবে যে, এতদূর জল কষ্ট আর চক্ষে দেখিতে পারা যায় না, এখানে একটি জলাশয় খনন করাইয়া দেওয়া জমিদারের পক্ষে কর্ত্তব্য। জমিদারের কতকগুলি ধন আছে বলিয়া তাঁহার অধিকারের মধ্যে বিদ্যালয় ঔষধালয় প্রভৃতি যে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হউক না কেন, জমিদারের পক্ষে তৎসমুদয়ের উচিতমত সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করা রহিয়াছে। যদি সেই জমিদারের একজন জ্ঞাতি বিষয়কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, অর্থাৎ দুইশত টাকা মাসিক বেতনে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উপরি উক্ত সদনুষ্ঠান গুলির সহায়তা করা সাধারণে কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিবে না। তাঁহার মাসিক যে আয় আছে, তদ্দ্বারা স্ত্রীপুত্রগণের ভরণপোষণই সুন্দররূপে হইয়া উঠে না, তিনি কি প্রকারে ঐ সকল অর্থসাপেক্ষ সৎকার্য্যের সাহায্য করিবেন? তবে তিনি লিখিতে

পড়িতে ভালরূপ জানেন, উপরি উক্ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে লিখন পঠন বা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য করা ঐ জমিদারের জ্ঞাতির পক্ষে কর্ত্তব্য। এ স্থলে একবংশীয় দুইজনের পক্ষে অবস্থাভেদে এক কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করিল। একজন অর্থের দ্বারা অন্য জন শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা সেই কর্ত্তব্য সাধন করিবেন।

বোধ করুন, কোন নদীর তীরে কতকগুলি রাখাল গরু চরাইতে আসিয়া ক্রীড়া কৌতুক করিয়া বেড়াই-তেছে। দৈবাৎ একটি বালক নদীর তীর হইতে জলে পড়িয়া গেল। সেই সময়ে ঐ ঘটনাস্থলের কিঞ্চিৎ দূরে একটি সাহেব পক্ষী শিকার করিবার জন্য বন্দুক হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, একটি শিশু উচ্চ তঠ হইতে নদীগর্ভে পড়িল, সেখানে অধিক জল না থাকায় একেবারে ডুবিয়া গেল না; কিন্তু পঙ্কে তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ পুতিয়া যাওয়ায় সে চীৎকার করিতে লাগিল। সাহেবের সম্মুখে এই কাণ্ড উপস্থিত হওয়ায় তিনি সেই বালকটির প্রাণরক্ষা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিলেন; কিন্তু সেই উচ্চ তট হইতে সাহেব যদি লম্ফ দিয়া নদীগর্ভে পড়েন, তাহা হইলে বালকের প্রাণরক্ষা করা দূরে থাকুক আপনার প্রাণরক্ষা করা ভার হইয়া উঠিবে, সেই জন্য তিনি তাঁহার পঙ্কে ঝম্প দিয়া পড়া অকর্ত্তব্য বিবেচনা করি-লেন এবং কি উপায়ে বালকের প্রাণরক্ষা করিবেন তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে দেখিতে পাই-লেন এক ব্যক্তি গোশকট চালাইয়া তাঁহারই দিকে

আসিতেছে; শকটখানি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সেই শকটখানি ধরিলেন ও শকটচালককে কহিলেন, "তুমি যদি কাদায় নামিয়া ঐ বালকটিকে শুষ্ক জমিতে তুলিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে দুইটি টাকা পুরস্কার দিব।" শকটচালক প্রথমতঃ স্বীকার করিল না। তাহার পর সাহেব যখন আরক্তনয়নে ও কর্কশ স্বরে তাহাকে বলিলেন, "ওরে, একটি বালক মরিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার প্রাণরক্ষা করা কি তোর কর্ত্তব্য নহে? তাহার উপর আমি তোকে আবার পুরস্কার দিতে চাহিতেছি, একার্য্য তোকে অবশ্যই করিতে হইবে, যদি সহজে না করিস্ তাহা হইলে আমি তোকে বলপূর্ব্বক ফেলিয়া দিব, তখন জানিতে পারিবি যে, ক্ষুদ্র শিশুটি কর্দ্দমে পড়িয়া কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছে।" শকটচালক সাহেবের রুক্ষ কথায় ভীত হইয়া কি করা কর্ত্তব্য, মনে মনে স্থির করিতেছে, এমন সময়ে কয়েকজন রাখাল ছুটিয়া শকট চালকের নিকট উপস্থিত হইল এবং শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "মামা! তোরই ছেলে কাদায় পড়ে গেছে।" এই কথা শ্রবণমাত্রেই "আঃ, কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে," বলিয়া সে এক লম্ফে নদীগর্ভে যাইয়া পড়িল এবং প্রাণপণযত্নে আপন পুত্রকে কর্দ্দম হইতে তুলিয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। সাহেব যখন শুনিলেন যে, কর্দ্দমাক্ত শিশুটি তাহারই পুত্র, তখন তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন, "ওহে শকট চালক! আমি তোমাকে চারি টাকা পুরস্কার দিব, তুমি ঐ শিশুটিকে পুনর্ব্বার কর্দ্দমে ফেলিয়া দাও।" শকটচালক

কহিল, "ধর্ম্মাবতার তুমিই আমার ছেলেটির আজ প্রাণ বাঁচাইলে। তুমি যদি বলপূর্ব্বক আমাকে না ধরিতে, তাহা হইলে আমি গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়া যাইতাম, ছেলে কর্দ্দমে পড়িয়াছে এ সংবাদ কিছুই জানিতে পারিতাম না। আমি আর পুরস্কার চাহি না, তোমার উত্তেজনায় যে আমার ছেলে বাঁচিল, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার হইয়াছে।" শকট চালকের কথা শুনিয়া সাহেব মনে মনে ভাবিলেন, ছেলেটির প্রাণরক্ষা করা আমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু নিজে পারিব না বলিয়া অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সেই সময় শকটচালকও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। যদিও ছেলেটির প্রাণ বাঁচান সকলের পক্ষে সমান কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিতে হয়, কিন্তু শকটচালকের সে কর্ত্তব্য বোধ কিছুমাত্র ছিল না, এই জন্য আমি তাহাকে কেবল পুরস্কারের প্রলোভন দিয়া কর্দ্দমে নামাইতেছিলাম। সে সময়ে শকটচালক মনে মনে ভাবিয়াছিল যে, ছেলেটাকে কাদা থেকে তুলে দিয়ে যদি দুটি টাকা পাই, তা, হইলে এ কাজ করা আমার কর্ত্তব্য। এইরূপ স্বার্থের অনুরোধে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সে যখন কর্দ্দমে নামিবার উপক্রম করিতেছে, সেই সময়ে তাহার স্বার্থ এক নূতন ভাব ধারণ করিল। সে জানিতে পারিল যে, কর্দ্দমাক্ত শিশুটি আমারই পুত্র, ইহার প্রাণরক্ষা করিতে যদি আমার প্রাণ যায় তাহাও কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া সে পুত্রস্নেহবশতঃ একলম্ফে কর্দ্দমে যাইয়া পড়িল। শকটচালকের কর্ত্তব্য বোধ অপেক্ষা আমার কর্ত্তব্য বোধ অধিক ছিল; কেননা,

আমি যদি বলপূর্ব্বক তাহাকে না ধরিতাম, তাহা হইলে সে শকট চালাইয়া আপনার কার্য্যের দিকে ছুটিত, কর্দ্দমে-লুণ্ঠিত বালকটিকে দেখিয়াও তাহার উদ্ধার সে কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিল না, তাহার পর অর্থের লোভে যখন বালকের উদ্ধার আত্মস্বার্থের জন্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিল, সেই সময় আপন সন্তান কর্দ্দমে পড়িয়া মারা যাইতেছে জানিতে পারিয়া স্বার্থের জন্য যে কার্য্য সাধনে তৎপর হইতেছিল তাহাই নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করা নৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্মাধিকারের কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিতে হয়, কিন্তু শকট-চালক প্রথমেই এই তিন প্রকার কর্ত্তব্য বিষয়ে বিমূঢ় হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার পর যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপন শিশুকে উদ্ধার করিতে গেল, সে কর্ত্তব্য এ তিন অধিকারের অন্তর্গত নহে। সে, নীতির অনুরোধেও যায় নাই, সমাজের ভয়েও কর্দ্দমে লম্ফ দিয়া পড়ে নাই এবং ছেলেটিকে বাঁচাইলে ধর্ম্ম হইবে এরূপ ভাবিয়াও এই কষ্টসাধ্য কার্য্যে অগ্রসর হয় নাই। যে সময়ে, আমার পুত্র কর্দ্দমে পড়িয়াছে, এই কথাটি তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, সে সময়ে যেমন চুম্বক প্রস্তর লৌহ-শলাকা আকর্ষণ করে, সেইরূপ ঐ কর্দ্দমে লুণ্ঠিত বালকটি তাহার পিতাকে মায়া দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইল। এখানে আর একটি কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে. রাখালদিগের মধ্যে একজন নদীগর্ভে পতিত, তাহারা সর্ব্বাগ্রে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল; তৎপরে সহচরের প্রাণরক্ষা করা কর্ত্তব্য, ইহা মনে মনে সকলেই ভাবিয়াছিল,

কিন্তু আপনাদিগের তাদৃশ শক্তি নাই বলিয়া সেই ভয়াবহ কার্য্যে অগ্রসর হওয়াকে তাহারা অকর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়াছিল। তাহার পর ঐ ঘটনাস্থলে সাহেবকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল যে, সাহেব আমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে। সাহেব ভাবিয়াছে যে, ছেলেটিকে আমরা কাদায় ফেলিয়া দিয়াছি। অতএব এ সময় আমাদিগের পক্ষে পলাইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। এই জন্যই তাহার পর যখন দেখিল যে, সেই শিশুটির পিতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহারা সাহস পাইয়া তৎকালের কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হইয়াছিল। তবেই কর্ত্তব্যবোধ এই ঘটনাস্থলে অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে কতরূপ ভাব ধারণ করে, তাহা উক্ত গল্পের দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

একপ্রকার কার্য্য অবস্থাভেদে দুইজনের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করে। বোধ কর, কোন সময়ে দুই সহোদরের এককালীন স্ত্রীবিয়োগ হইল; কনিষ্ঠের দুইটি পুত্র সন্তান ছিল, জ্যেষ্ঠের সন্তান-সন্ততি কিছুই হয় নাই। উভয় ভ্রাতারই পত্নীবিয়োগ হওয়ায় গুরুজনেরা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন, "তোমার পক্ষে বিবাহ করা কর্ত্তব্য হইতেছে না, যে হেতু, শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং।' অতএব তোমার যখন দুইটি পুত্রসন্তান রহিয়াছে, তখন আর গলগ্রহ ঘটাইবার প্রয়োজন কি? এ বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে স্ত্রৈণ দোষ ঘটিতে পারে, তাহা হইলে, মাতৃহীন দুইটি শিশুর

কষ্টের আর অবধি থাকিবে না, অতএব তোমার পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করা অকর্ত্তব্য; তোমার জ্যেষ্ঠের সন্তান-সন্ততি হয় নাই, তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করুন।” দুই ভ্রাতাই গুরুজনের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। কিছুদিন পরে কনিষ্ঠের সন্তান দুইটি গতাসু হইল। যে সকল গুরুজনেরা ছয়মাস পূর্ব্বে কনিষ্ঠকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার কনিষ্ঠের পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। তবেই স্ত্রীবিয়োগ হইলেই লোকের বিবাহ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কর্ত্তব্য সকলের পক্ষে সমান নহে; অবস্থা বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সাধারণকর্ত্তব্য সকল সময়ে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য বলিয়া ধরা যায় না। নিম্নে তাহারই একটি সামান্য উদাহরণ প্রদত্ত হইল। কোন একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে কতকগুলি সামান্য গৃহস্থ লোকের বাস ছিল। হঠাৎ সেই গ্রামে দস্যুভয় উপস্থিত হইল; প্রায় প্রতিরজনীতেই চোরেরা সিঁধ কাটিয়া এক একটি গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়া যাইতে আরম্ভ করায় গ্রামশুদ্ধ লোক অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। কি প্রকারে দস্যুহস্ত হইতে বিষয়বৈভব রক্ষা করিব, ইহারই একটা সদ্যুক্তি স্থির করিবার মানসে গ্রামশুদ্ধ লোক একটি প্রকাশ্য স্থানে একত্র সমবেত হইল। কি প্রকারে দস্যুদমন করা যাইবে, সেই সভায়, এই প্রসঙ্গের নানা কথা চলিতে লাগিল। অবশেষে সকলে ধার্য্য করিলেন যে, চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুইজন বলবান্ পাইক

নিযুক্ত করা যাউক। তাহারা মশাল লইয়া সমস্ত রাত্রি গ্রামের মধ্যে রোঁদগস্ত করিয়া বেড়াইবে, এই যুক্তি সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন। তৎক্ষণাৎ চাঁদার খাতা বাহির হইল, সকলেই যথাসাধ্য চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন; কিন্তু একজন নাপিত ও দুইজন কাঠুরিয়া বলিয়া উঠিল যে, "আমরা এক পয়সাও চাঁদা দিব না, যেহেতু আমরা চোরের ভয়ে ভীত নহি।" নাপিত কহিল, "আমার দুই খানি ক্ষুর ও একটি নরুণ আছে, রাত্রিকালে বালিসের নিচে রাখিয়া পরম সুখে নিদ্রা যাই, এই গ্রামে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করি, তাহাতে স্ত্রীপুরুষের উদরান্ন হয় এইমাত্র; অদ্যাপি একটা জলপাত্র কিনিয়া উঠিতে পারি নাই, কদলীপত্রে আহার করি, মৃণ্ময় পাত্রে জল পান করি, এরূপ অবস্থাপন্ন লোক বিষয়বৈভব রক্ষার জন্য পাইক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য বলিয়া ধরে না।" কাঠুরিয়া দুইজনও নাপিতের ন্যায় আপনাপন অবস্থা বর্ণন করিয়া চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইল না। তাহাদিগের এই অর্থ-পরিপূরিত কথা শুনিয়া গ্রামবাসীরা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। সেই সময় একজন বৃদ্ধ বলিলেন, "যাহাদিগের ধন আছে, সাধারণে পাইক রাখিয়া দস্যুহস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা, তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য; আমাদিগের সকলের পক্ষে যাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে, নির্ধন নাপিত ও কাঠুরিয়াদ্বয়ের পক্ষে তৎসম্বন্ধে চাঁদা দেওয়া অকর্ত্তব্য বলিয়া ধরিতে হয়। কারণ, প্রথমতঃ ধন নাই, সুতরাং পাইক নিযুক্ত করা তাহাদিগের নিষ্প্রয়োজন,

বিশেষতঃ, ঐ চাঁদায় সাহায্য করাও তাহাদিগের ক্ষমতাতীত হইতেছে।”

ইউরোপখণ্ডের লোক, সাধারণ-মঙ্গলজনক ব্যাপারে সাধ্যানুসারে সাহায্য দান করা আপামর সাধারণে নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন। ইংরাজজাতির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমাদিগের দেশের লোক কেবল মুখে বলিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যে তাহার কিছুই পারেন না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন, এক ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে স্বজাতির পক্ষসমর্থন জন্য ইংরাজজাতি কত দূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরাজের নিকট ইংরাজের বিচার হয়, এই তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা। ইংরাজ অধিকারের প্রারম্ভাবধি যেরূপ প্রণালীতে ইংরাজজাতির ফৌজদারি মোকদ্দমা হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে না দেওয়া ইংরাজ জাতির পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। সেই কর্ত্তব্য ক্ষুদ্র ভদ্র সকলের পক্ষে সমান জ্ঞান হওয়ায়, তাঁহারা কি কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা, কি ধনের দ্বারা, কি লিখন পঠনের দ্বারা, যাহার যেরূপ সাধ্য, তিনি তাহাই করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অস্মদ্দেশীয় কতিপয় দেশহিতৈষী যুবক একটি জাতীয়-ফণ্ড সংগ্রহের নিমিত্ত কয়েক মাস কায়মনে যত্ন করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহারা একটি সাধারণ সভা করিয়া জাতীয়-ফণ্ড সংগ্রহ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অনেকেই একতান-স্বরে ‘অবশ্য কর্ত্তব্য’ বলিয়া সাধারণ সভায় বসিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাহাদিগের একজনকেও

দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আমরা যেটিকে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। যেহেতু অস্মদ্দেশীয় লোক কর্ত্তব্য শব্দের প্রকৃতার্থ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ইতিপূর্ব্বে বিধবার বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্দ্ধাংশ লোক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, অল্পবয়স্কা বিধবা রমণীগণের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। যখন শাস্ত্রে ইহার শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তখন এক লৌকিক ব্যবহারকে প্রবল করিয়া কেন আমরা কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া থাকিব? আইস, আমরা সকলে মিলিত হইয়া এই শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করি। কথায় এইরূপ অনেকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে কেহই অগ্রসর হইতে পারিলেন না। বিধবা-বিবাহ দেওয়া যে কর্ত্তব্য, ইহা বঙ্গীয় সন্তানগণ কেবল আমোদে পড়িয়া মুখে বলিয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরের সহিত কর্ত্তব্য বলিয়া ধার্য্য করেন নাই। যখন বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তুমুল বাক্‌যুদ্ধ, লেখনীযুদ্ধ আরম্ভ হয়, সে সময়ে নিতান্ত ধর্ম্মভীরু লোকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যাহাদিগের বিধবা কন্যা আছে, তাহারা ঐ সকল বিষয় তর্কবিতর্ক করুক, আমাদিগের ও কথায় কথা কহিবার প্রয়োজন কি? যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তখন আমরা নিরপেক্ষভাবে থাকিব। ধর্ম্মভীরু ও অজ্ঞানান্ধ লোকেরা এইটি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না 'যে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে আমাদিগের জাতিসাধারণের অনেকাংশে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে।

যে কার্য্যে স্বজাতির মঙ্গল হইবে, সে কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের একমত হইয়া যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পুরাণাদি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, কোন কোন মহাত্মা কর্ত্তব্য কার্য্য অত্যন্ত দুষ্কর হইলেও তাহা সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই; কিন্তু স্বার্থের অনুরোধে তিনিই আবার নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যকেও কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রঘুকুলপতি রাজা দশরথ আপন চরমকাল সমাগত জানিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আপনি রাজকার্য্য হইতে অবকাশ লইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তিনি দিন নির্দ্ধার্য্য করিয়া যে দিবস রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন, তাহার পূর্ব্ব রজনীতে মহারাজের কনিষ্ঠা রাজ্ঞী কৈকেয়ী এক ভয়ানককাণ্ড উপস্থিত করেন। মহারাজ দশরথ এক সময়ে কৈকেয়ীর সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইটি বর দান করিতে চাহিয়াছিলেন। তৎকালে রাজমহিষী বলিয়াছিলেন, আমার এক্ষণে কোন বিষয়েরই প্রয়োজন নাই, প্রয়োজনমতে আমি আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিব। কৈকেয়ী এক্ষণে তাঁহার একজন বৃদ্ধা ধাত্রীর পরামর্শানুসারে রাজা দশরথকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার স্মরণ আছে যে, বহুকাল পূর্ব্বে আপনি আমাকে দুইটি বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অদ্য সেই বর গ্রহণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি যদি এক্ষণে আমি যাহা চাহিব, তাহাই দিতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করেন ও স্বীকৃত হন, তাহা হইলে, 'আমি বর যাচ্ঞা করি, নতুবা আমার বর গ্রহণের অন্য কোন আবশ্যক

নাই।" সরল-হৃদয় রাজা দশরথ, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ঐ রাজ্ঞীর মনস্তুষ্টির জন্য হাস্যবদনে কহিলেন, "তুমি কি বলিতেছ; ইহজগতে তোমাকে আমার কি অদেয় আছে যে, তজ্জন্য আবার আমাকে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতে হইবে। আচ্ছা, যাহা তুমি প্রার্থনা করিবে, তাহাই তোমাকে আমি দিতে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলাম।" কৈকেয়ী, রাজাকে এইরূপে ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া, পুনরায় কহিলেন, "মহারাজ! রঘুবংশীয়েরা প্রতিজ্ঞার অনুরোধে আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন, এটি যেন আপনার স্মরণ থাকে। আমার প্রথম প্রার্থনা এই যে, রামচন্দ্রের বিনিময়ে ভরতকে রাজ্যভার অর্পণ করুন; দ্বিতীয়তঃ, চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রামচন্দ্রকে বনবাসের আজ্ঞা দান করিয়া আপনার দুইটি সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হউন।"

পাঠকগণ! এইখানে বিবেচনা করিয়া দেখুন, মহারাজ দশরথ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিতে হইবে; কিন্তু অকৃতাপরাধ রামচন্দ্র হেন পুত্রকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য তাহাকে বনপ্রস্থানের আদেশ করা কিরূপ উচিত কার্য্য তাহার মীমাংসা করা অত্যন্ত দুষ্কর। বোধ হয়, নিরপেক্ষ হইয়া বিবেচনা করিতে গেলে, ইহা যে উচিত কার্য্য হইয়াছে এরূপ কেহই বলিতে পারেন না। যাহা হউক, মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া একেবারে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণের পর সংজ্ঞালাভ

করিয়া বিনীত ভাবে রাজ্ঞীকে কহিলেন, “কৈকেয়ি! তুমি এরূপ নিদারুণ কথা কহিবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। আমি কেমন করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্য-ধনে বঞ্চিত করিব এবং কি রূপেই বা রামচন্দ্রের ন্যায় পুত্রকে বনে যাইতে আদেশ করিব! পিতৃবৎসল রামচন্দ্র এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তদ্দণ্ডে পিতৃসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, “পিতঃ! কি জন্য আপনি এতদূর উতলা হইয়াছেন? ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি আপনার উপযুক্ত পুত্র; পিতাকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করা কি আমারই কর্ত্তব্য নহে? যখন দুই কর্ত্তব্য একত্র মিলিত হইয়াছে, তখন সে কর্ত্তব্য যত কেন কঠোর হউক না, আপনার ন্যায় মহানু-ভবের ও আমার ন্যায় পুত্রের তৎপ্রতিপালনে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করাও কর্ত্তব্য নহে। পিতঃ! আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এক সত্যরক্ষার জন্য কতদূর কষ্টভোগ করিয়াছিলেন! পত্নীপুত্র বিক্রয় করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে রাজ্যদানের দক্ষিণা দিয়াছিলেন, তথাচ কর্ত্তব্যবিমুখ হন নাই। আপনার পূজ্যপাদ পিতামহ মহারাজ ভগীরথ যখন জননীর মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কপিল মুনির আশ্রমে ব্রহ্ম-কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছেন, গঙ্গা-জল স্পর্শ ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই, তখন তিনি গঙ্গা আনিতে অগ্রসর হইলেন। সেই কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনের জন্য তিনি বাল্যাবস্থাতেই অকুতোভয়ে বনপ্রস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদিগের পক্ষে যে কর্ত্তব্য কার্য্য

উপস্থিত, তাহা পূর্ব্বপুরুষগণের কঠোর কার্য্য সম্পাদন অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, যে রাজ্যভোগ ইচ্ছা করে, শাস্ত্রানুসারে তাহাকে নরাধমের মধ্যে গণ্য করিতে হয়। আপনার ন্যায় পিতা আমাকে সেই নরাধমশ্রেণীতে ভুক্ত করিতে কখনই চাহিবেন না। আর আপনিও এই বৃদ্ধাবস্থায় কেবল আমাকে রাজ্যভোগ করাইবার জন্য সত্যভঙ্গ করিয়া নরকগামী হইবেন না। ক্ষত্রিয়েরা কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনের সময় আপনার প্রাণকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করে। অতএব আমি বনপ্রস্থান করি, আপনি ভরতকে আনাইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিতে তৎপর হউন।” এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য বলিয়াই রামচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি এরূপ ভাবিতেন যে, পিতা আমার বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রৈণ হইয়া পড়িয়াছেন, সেই জন্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। আমি ভীমরথীর কথায় আস্থা করিয়া কি জন্য বনপ্রস্থান করিব? তিনি যখন আমাকে রাজ্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে আমার অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন, তখন আর এ রাজ্যধনে তাঁহার কি অধিকার আছে? যদি দান করা ধন তিনি আর একজনকে দান করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে নরকগামী হইতে হইবে। এইরূপে রামচন্দ্র যদি পিতাকে ভীমরথী, বৃদ্ধ ও স্ত্রীবাধ্য বলিয়া বনগমনে বিরত হইতেন, তাহা হইলেও যে তিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ়

হইলেন, একথা বলা যাইতে পারিত না। কারণ, নীতি-শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাঁহারা যদি ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম বহির্ভূত কার্য্য করিতে বলেন, তৎপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া অকর্ত্তব্য নহে। রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা না করিয়া বনগমন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কর্ত্তব্যবিমূঢ় বলা যায় না; তিনি সত্যপাশ হইতে পিতাকে মুক্ত করিয়া অবশ্য গৌরবের কার্য্যই করিয়াছিলেন।

কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে যে রামচন্দ্র বনপ্রস্থানকালে পিতার মৌখিক অনুমতির অপেক্ষা করেন নাই, সেই রাম-চন্দ্রই অকৃতাপরাধ বালি রাজাকে চোরা বাণে বধ করা অন্য এক সময়ে কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। বালিরাজ রামচন্দ্রের বাণে আহত হইয়া যখন ধরাশায়ী হন, সেই সময়ে তিনি রাঘবকে সম্মুখে দেখিয়া কর্কশস্বরে কহিয়া-ছিলেন, "ওরে নরাধম! তুই কি জন্য আমাকে প্রাণে বিনষ্ট করিলি? আমি কোন কালে কোন বিষয়ে তোর্ নিকট অপরাধী নহি।" তদুত্তরে রামচন্দ্র কহিয়াছিলেন, "তোমার কনিষ্ঠভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিত্রতা করিয়াছি এবং সেই সময় এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, নিঃশত্রু করিয়া তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য সমর্পণ করিব।

"ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা-ধর্ম্ম বিদিত সংসারে,
সেই জন্য চোরা বাণে মেরেছি তোমারে।"

যথার্থ পক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে কেবল এক স্বার্থসাধনের জন্যই রাঘব অকৃতাপরাধ বালিকে বিনষ্ট

করিয়াছিলেন। তবে আমরা যখন যে কার্য্য করি, তাহা প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তব্যই হউক বা নাই হউক, আপনার পক্ষ-সমর্থনের জন্য তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। রামচন্দ্র যখন বালিরাজকে বলিলেন, "তুমি আমার সখার পরম শত্রু, সেই জন্য যে কোন প্রকারে হউক, তোমার প্রাণান্ত করাই আমার কর্ত্তব্য।" এ কথার উপর আর কোন কথাই চলিতে পারে না। কিন্তু, যদি ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রামচন্দ্র সুগ্রীবের উপকারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে, অকৃতাপরাধ বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য দান করা রামচন্দ্রের কর্ত্তব্য হয় নাই। তিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয় ভ্রাতার বিরোধ ভঞ্জন করিতে পারিতেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য অকৃতাপরাধ বালির প্রাণবধ করা পাপ বলিয়া বোধ করেন নাই, লোক-লজ্জার প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই, একটু স্থিরচিত্তে কার্য্য করিলে, তাহা না করিলেও চলিত। বালি-সুগ্রীবের অনায়াসে মিলন হইতে পারিত, ও সীতার উদ্ধার-সম্বন্ধে সুগ্রীব অপেক্ষা বালি রাজার দ্বারা অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শান্তপ্রকৃতি রামচন্দ্র বনিতা-হারা হইয়া এতদূর কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন যে, সুগ্রীবের সহায়তায় আপনার সহধর্ম্মিণীকে উদ্ধার করিতে পারিব, এই আশয়ে নির্ম্মল রঘুকুলে কলঙ্কারোপ করাকেও অকর্ত্তব্য বোধ করেন নাই।

যে জানকীর উদ্ধারসাধন জন্য রামচন্দ্র এতদূর কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিলেন, সেই জানকীকে পূর্ণগর্ভাবস্থায় হিংস্রজন্তু-

পরিপূরিত জনশূন্য অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে লক্ষ্মণকে অনায়াসে আদেশ করিয়াছিলেন। এই নৃশংস ব্যবহারও তৎকালে তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সীতাবর্জ্জনকালে লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র কহিয়াছিলেন যে, প্রজারঞ্জন করাই রঘুবংশীয়দিগের একমাত্র ধর্ম্ম। সেই প্রজারাই যখন সীতার কলঙ্ক কীর্ত্তন করিতেছে এবং সেই কলঙ্কিনী সীতাকে গ্রহণ করায় প্রজারা আমাকেও কাপুরুষ বলিয়া গণ্য করিতেছে, তখন এরূপ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। জানকী যে শুদ্ধাচারিণী, ইহা আমি বিশিষ্ট রূপেই অবগত আছি এবং তাঁহার শরীরে যে পাপের লেশ-মাত্র নাই, তাহাও দেবগণ-সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই পরীক্ষা লঙ্কায় না করিয়া যদি অযোধ্যায় আসিয়া করিতাম, তাহা হইলেই বুদ্ধির কার্য্য হইত। অবোধ প্রজাগণের সমক্ষে যদি জানকী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে, প্রজারা আর কেহই তাঁহার কলঙ্ক কীর্ত্তন করিতে পারিত না। যে কার্য্যের প্রারম্ভে ভ্রম ঘটিয়াছে, এক্ষণে তজ্জন্য আক্ষেপ করিলে আর কি হইবে? প্রজারা যখন রাজা ও রাজ্ঞীর প্রতি সর্ব্বতোভাবে পরিতুষ্ট নহেন, তখন জানকীকে পরিত্যাগ করাই নিতান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। ইহাতেও যদি অযোধ্যাবাসীরা আমাকে কর্ত্তব্য-বিমূঢ় বলে, তাহা হইলে আমিও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রস্থান করিব।

প্রজারঞ্জনের অনুরোধে রামচন্দ্র কিরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য করিলেন, পাঠকগণ, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন।

তিনি দেবগণসমক্ষে সীতার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া দেবগণের অনুরোধে তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন। সীতা-সম্বন্ধে তৎকালে তাঁহার মনে কিছুমাত্র মালিন্য ছিল না। তাহার পর স্বদেশে আসিয়া দীর্ঘকাল জানকী-সহবাসে সুখে কালহরণ করিতেছিলেন। একদিন তাঁহার গুপ্তচর দুর্ম্মুখের মুখে এইমাত্র শুনিলেন যে, কতকগুলি প্রজা পরস্পর বলাবলি করিতেছে যে, আমাদিগের বর্ত্তমান রাজা সর্ব্বগুণসম্পন্ন, কিন্তু এই আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, কি বলিয়া তিনি রাক্ষসোপভুক্তা জানকীকে পুনর্গ্রহণ করিলেন? দুর্বৃত্ত দশানন বলপূর্ব্বক জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দশমাস কাল জানকী তাহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন। দশাননের সহিত সীতার কিরূপ ব্যবহার ছিল, তাহা কে বলিতে পারে? স্ত্রীলোক গৃহের বাহিরে গিয়া দাঁড়ালেই যখন কুলটা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন দীর্ঘকাল জানকী রাক্ষসগৃহে বাস করিয়া কি বলিয়া লোকসমাজে সাধ্বী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। যাহা হউক, যখন প্রজাপুঞ্জ রাজার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলে, তখন এইটি কি আমাদিগের সমাজে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া থাকিবে না? ফলতঃ, রাজা যখন নিজ স্ত্রীকে রাক্ষসগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিলেন, তখন আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা কলহ করিয়া দশ হস্ত অন্তরে দাঁড়াইলে, আমরা আর তাহাদিগকে একটি কথাও বলিতে পারিব না। অযোধ্যাধিপতি দুর্ম্মুখ-প্রমুখাৎ এই কয়েকটি কথা শুনিয়াই সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করা

কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি যদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে, সেই কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যেও আরও কতকগুলি কর্ত্তব্য ছিল, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। একে সহধর্ম্মিণী, তাহাতে পূর্ণগর্ব্ভা; পূর্ণগর্ব্ভাবস্থায় গৃহস্থেরা শৃগাল কুক্কুরকেও বাটী হইতে দূর করিতে পারে না। রামচন্দ্র রাজা হইয়া যেরূপ ধর্ম্ম ও নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণকার কালের মহামূর্খ জনেরাও করিতে সঙ্কুচিত হয়। যদি সীতাবর্জ্জন করা তাঁহার নিতান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছিল, তাহা হইলে কোন জনপদে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া এবং গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া দিয়া রাজ্ঞীকে পরিত্যাগ করা কি কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় নাই? তিনি যদি এরূপ কার্য্য করিতেন, তাহাতেও কি অযোধ্যাবাসী প্রজাপুঞ্জ রাজাকে অশ্রদ্ধা করিত? যদি এরূপ করিয়াও তিনি প্রজাপুঞ্জের সন্তোষ সাধন করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে, সে রাজ্য, সে প্রজা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। যে রাজ্ঞীর গর্ব্ভে তাঁহার ঔরসপুত্র ছিল, সেই রাজ্ঞীকে তিনি অনায়াসে নিবিড় অরণ্যমধ্যে সিংহ ব্যাঘ্রের সম্মুখে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আদেশ করিয়াছিলেন। এরূপ লোমহর্ষণ কার্য্যকে যদি কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে এমত আর কি নৃশংস কার্য্য আছে, যাহাকে আমরা অকর্ত্তব্য বলিয়া ধরিব। আমাদিগের পুরাণাদিশাস্ত্রে রামচরিত্র ও রামরাজত্ব একটি আদর্শস্থল হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া

দেখিলে, রাম যদি পূর্ণগর্ব্ভা, শুদ্ধাচারিণী সহধর্ম্মিণীকে বনবাস দিয়াও ইহসংসারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের অষ্টম হেন্‌রিকেই বা আমরা কি জন্য মন্দ বলিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। ফ্রান্সের অধীশ্বর প্রথম নেপোলিয়ন কোন কার্য্যের অনুরোধে রাজ্ঞীকে নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আমাদিগের রামচন্দ্রের ন্যায় কার্য্য করেন নাই। তিনি রাজধানীর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র আবাস নির্ম্মাণ করাইয়া এবং রাজ্ঞীর ভরণপোষণের উপযুক্ত বৃত্তিবৈভব দিয়া সেই প্রাসাদে রাজ্ঞীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেবল সম্রাটের সহিত রাজ্ঞীর সাক্ষাৎ হইত না; এতদ্ভিন্ন আর তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। এরূপ কার্য্য করিয়াও সম্রাট্ নেপোলিয়ন সদাশয় ব্যক্তিবৃন্দের তিরস্কারভাজন হইয়াছিলেন।

বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, কেবল এক আপন ভরণপোষণের অনুরোধে কি পুরাকালের কি এক্ষণকার অনেকানেক মহানুভব আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে আমি মহাভারতের দুই একটি আখ্যায়িকা অবলম্বন করিতেছি। শান্তনুনন্দন ভীষ্মের ন্যায় সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক, তৎকালে বোধ হয়, আর কেহই ছিলেন না, তিনি আপনি, পিতা শান্তনুকে সত্যবতী দান করিবার সময় যে সকল কঠোর প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, যাবজ্জীবন তৎপ্রতিপালনে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু যখন দুর্য্যোধন জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য দর্শনে কপট পাশাক্রীড়াচ্ছলে যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব হরণ করেন ও

পাণ্ডব-রমণী পাঞ্চালীকে সভাস্থলে আনাইয়া অপমানের একশেষ করিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে ভীষ্মদেব সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়াও তাহার কিছুমাত্র প্রতীকার করেন নাই। তিনি যদি সদর্পে দুর্য্যোধনকে কহিতেন "ওরে পাপাত্মা, তুই ক্ষান্ত হ, নতুবা তোকে রাজ্যচ্যুত না করিয়া ভীষ্মদেব জলগ্রহণ করিবেন না;" তাহা হইলে, দুর্য্যোধনের সাধ্য কি যে, কুলবধূ পাঞ্চালীকে রাজসভার মধ্যে বিবস্ত্রা করে। তিনি সত্যবাদী, পরদুঃখে কাতর ও আশ্রিত-প্রতিপালক বলিয়া সকলেই তাঁহার মর্য্যাদা করিত, কিন্তু দ্রৌপদী যখন করুণ-স্বরে পুনঃপুনঃ ভীষ্মদেবের নাম লইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তখন তিনি কেবল এক দুর্য্যোধনের মুখাপেক্ষায় কৃষ্ণাকে অভয় দান করিতে পারেন নাই; একজন হীনবীর্য্য নরের ন্যায় কুরুসভায় বসিয়া দ্রৌপদীর অপমান দর্শন করিয়াছিলেন। এই ভয়ানক বিপদের সময়, দ্রৌপদীর মান রক্ষা করা কি ভীষ্মের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় নাই? বোধ হয়, অবশ্যই হইয়াছিল, কিন্তু অন্নদাতা দুর্য্যোধনের অসন্তোষ জন্মাইতে বোধ হয় তিনি কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই দ্রৌপদীর পক্ষসমর্থন করিতে পারেন নাই। ভাল, ভ্রম প্রযুক্তই হউক আর অন্য কোন বিশিষ্ট কারণেই হউক, তিনি পাশাক্রীড়াস্থলে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারেন নাই। সেই একটি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়ায় পাশাক্রীড়ার দিবস হইতে তিনি যত দিবস জীবিত ছিলেন, পদে পদে তাঁহাকে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কার্য্য কবিতে হইয়াছে। দুর্য্যোধন নিতান্ত কাপট্য করিয়া

পাণ্ডবগণকে বনে পাঠাইয়াছিল, ভীষ্মদেব ইহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তথাচ তিনি কপটীর আশ্রয় ত্যাগ করা ও হীনবল পাণ্ডবগণের সাহায্যে প্রবৃত্ত হওয়া, এক অন্নদাতার অনুরোধে, কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। তিনি যদি পাণ্ডবদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনপ্রস্থানের উদ্যোগ করিতেন, তাহা হইলে, কুরুকুলাচার্য্য দ্রোণাচার্য্যও তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেন; মহাবীর অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যও তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেন। এই বীরচতুষ্টয় হস্তিনা পরিত্যাগ করিলে, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত বিরোধ মিটাইবার জন্য কায়মনে যত্ন করিতেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। তবেই বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, কেবল এক ভীষ্মদেব কর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়াতেই কুরুকুল নির্ম্মূল হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। তিনি যদি ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে, দুর্য্যোধন কখনই পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইত না।

পাশক্রীড়ার সময় কৌরবসভায় যেরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, দুর্য্যোধন কুলবধূর উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়া নিস্তার লাভ করিয়াছিল, ইদানীন্তন কোন সজ্জনসভায় সেরূপ কাণ্ড উপস্থিত হইলে, সদাশয় সাধু ব্যক্তিরা কখনই নতশিরে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। ভীষ্ম এবং দ্রোণ কুরুকুলের প্রধান অমাত্য ছিলেন। ঐ দুইজনের প্রশংসার অবধি ছিল না; কিন্তু কি গুণে যে তাঁহারা বড় বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা আমি সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অধুনাতন

বড়লোকের সভাতেও অনেক আশ্রিত লোক থাকেন; আশ্রয়দাতা তাঁহাদিগের সম্মুখে যত কেন গর্হিতাচরণ করুন না, আশ্রিতগণ সাহস করিয়া তাহার উপর একটি কথাও কহিতে পারেন না। আশ্রয়দাতার সম্মুখ হইতে উঠিয়া আসিয়া আপনাপনি তাঁহার দোষের সমালোচন করিবেন, তথাচ সম্মুখে বলিতে সাহস করিবেন না। এইরূপ লোককে আশ্রয় দিয়া কতশত ধনাঢ্য লোক সমূলে নিপাত হইয়াছেন। ভাল, ইদানীন্তন লোক, যাঁহারা ধনাঢ্যলোকের আশ্রয় লইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই নিঃস্ব; উচিত কথা কহিলে যদি আশ্রয়দাতা অসন্তুষ্ট হন, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ যাহা সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহা আর যদি না করেন, এই ভয়ে তাঁহারা আশ্রয়দাতাকে উচিত কথা কহিতে পারেন না। তাঁহারা মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া থাকেন, বড়লোক যাহা করিতেছে করুক, আমাদিগের সে কথার প্রতিবাদ করিয়া অপ্রিয় হইবার প্রয়োজন কি? সময়ে আপন কর্ম্মফল আপনি ভোগ করিবে; আমরা উহার তুষ্টি-বর্দ্ধন করিয়া আত্মকার্য্য উদ্ধার করিয়া লই, ধনাঢ্যলোকের সহিত আমাদিগের এইমাত্র সম্বন্ধ। তবে কি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কুরুসভার সদস্যেরাও সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন? দুর্য্যোধনের অন্নভোগী বলিয়া কি তাঁহাদিগের উচিত কথা কহিতে সাহস হইত না? ভীষ্ম দারপরিগ্রহ করেন নাই, সুতরাং, তাঁহার স্ত্রীপুত্রপরিবার কেহই ছিল না। কথিত আছে, তিনি সশস্ত্র থাকিলে, ত্রিলোকে কেহই তাঁহাকে জয় করিতে পারিত না। দ্রোণাচার্য্য জাতিতে ব্রাহ্মণ,

চিরকাল তপোবনে বাস করিতেন, মধ্যে কয়েক দিন কুরু-কুলের আচার্য্য হইয়া বিলাসী হইয়া ছিলেন, অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, দ্রোণাচার্য্যেরই কেবল বিলাসভোগের নিমিত্ত দুর্য্যোধনের নিকট আত্মশরীর বিক্রয়ের যৎকিঞ্চিৎ কারণ উপলব্ধ হয়; কিন্তু ভীষ্মের সে সম্ভাবনা কোথায় ?

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির গুরুজনকে অত্যন্ত মান্য করিতেন। গুরুবাক্য কস্মিন্ কালে অবহেলা করিতেন না। জ্যেষ্ঠপিতামহ ভীষ্ম ও শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য পাশক্রীড়ার প্রারম্ভে যদি যুধিষ্ঠিরকে নিষেধ করিতেন, তাহা হইলে, ধর্ম্মপুত্র কখনই দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন না। দ্রোণ ও ভীষ্ম সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াও উচিত কথা কহিতে পারেন নাই; কিন্তু বিদুর রাজার ভ্রাতা, তিনি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলে জীবনধারণ করিতেন, তথাপি তিনি পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে দুর্য্যোধনকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন এবং ভীষ্ম-দ্রোণকেও বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি সভায় বসিয়া রঙ্গ দেখিতেছ ? কুরুকুল অস্তগত হইবার উপক্রম হইতেছে, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তোমরা পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্যে নিষেধ করিতেছ না কেন ? যদি ঐ পাপাত্মা সহজে তোমাদিগের কথা না শুনে, তাহা হইলে, পাশ-অস্ত্রে উহাকে বন্ধন করিয়া রাখ, আমার কথায় কর্ণপাত কর, নতুবা এই সূত্রে ইহার পর সকলকেই কষ্টভোগ করিতে হইবে।" হীনবল বিদুর যদিও তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কর্ত্তব্যের

কেহই পৃষ্ঠপোষক হইল না বলিয়া, তাহার কিছুমাত্র ফল ফলিল না। দুর্য্যোধন ঘোর স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা মনে আসিল, তাহাই করিয়া গেল। ভীষ্ম, দ্রোণ সেই সকল অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিলেন এবং অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বকর্ণে শুনিলেন ও হীনবীর্য্যের মত সভাস্থলে নতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। পাণ্ডবেরা মান-মর্য্যাদা ও বিস্তীর্ণ রাজ্য শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে বনে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর ভীষ্ম, দ্রোণ সভাগার পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। বিদুর তখনও উচিত কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে যাইয়া কহিলেন, "মহারাজ কি করিলেন? সর্ব্বনাশ করিলেন, আপনি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়াতেই সভাস্থ সকলেই উচিত কথা কহিতে পারিল না। ভাল, পাশক্রীড়ার স্থলেই তাঁহারা কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম এবং দ্রোণ কি জন্য নিরপেক্ষ হইয়া রহিলেন না? যদি অন্নদাতার পক্ষ সমর্থন করাই কর্ত্তব্যজ্ঞান হইয়াছিল, তাহা হইলে, ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবকে কি জন্য আপনার মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিলেন? দ্রোণাচার্য্যই বা কি জন্য এক পুত্রশোকের ভাণ করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে অস্ত্র ত্যাগ করিলেন? এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে যে, কুরুসভার প্রধান অমাত্যদ্বয় কেবল এক কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য জ্ঞান হওয়ায় উভয় কুল বিনষ্ট হইয়াছিল। ভীষ্ম-দ্রোণ অপেক্ষা কর্ণকে বরং অধিক পরিমাণে প্রশংসা করিতে পারা যায়, কারণ,

তিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার ভ্রাতা, তথাচ তিনি আশ্রয়দাতা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বোধে প্রাণপণে কৌরবগণের সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন যখন চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক সম্মুখসমরে পরাস্ত হন ও গন্ধর্ব্বপতি তাঁহাকে রণক্ষেত্রে নিঃসহায় দেখিয়া কৌরব-বনিতাগণের সহিত বন্ধন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থানের উপক্রম করে, তখন এই সংবাদ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দূতমুখে শ্রবণ করিয়া পরম শত্রু দুর্য্যোধনকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করায় জগৎশুদ্ধ লোক তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। অধিক কি, যুধিষ্ঠিরের এইরূপ সদাচরণে দুর্য্যোধনের নিতান্ত আত্মীয়গণও অন্তরে অন্তরে পাণ্ডবের মঙ্গল কামনা করিত।

যদি সংসারে সমস্ত লোকের সমান কর্ত্তব্য জ্ঞান Sense of Duty থাকিত, অর্থাৎ যে অবস্থায় যাহা করা উচিত তাহার প্রকৃত বোধ থাকিত, তাহা হইলে, সংসারের লোকের এতদূর দুর্গতি হইত না; আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, পরপীড়ন প্রভৃতি গর্হিতকার্য্য সকল লোকের মনে অবস্থা ও সময়ের উচিত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইত না। অহো কর্ত্তব্য! তুমি কখন কি ভাবে লোকের মনে উদয় হও, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারা যায় না। যে সময়ে অগষ্টস্ সিজর রোমান সম্রাট্ হইয়া আপনার ভুজদম্ভে ধরা কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সময়ে পেট্রিসিয়ানদিগের সর্ব্বাগ্রগণ্য

রাজনীতিজ্ঞ ও সামরিক-বিদ্যা-বিশারদ মহাবীর কেটো সিজরকে দূরীভূত করিয়া রোমরাজ্যে সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন করিবার জন্য দীর্ঘকাল তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি সিজর কর্ত্তৃক পদে পদে পরাস্ত হইয়া অবশেষে নিউমিডিয়ার যুবরাজ যুবার সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করেন; তাহাতেও কিন্তু সিজরের বীরগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অসমর্থ হইয়া, পাছে তিনি সিজর কর্ত্তৃক বন্দী হন, পাছে সম্রাট তাঁহাকে অপমান করে, পাছে তিনি সাধারণের নিকট ঘৃণাস্পদ হন, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া, আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করাই তাঁহার তৎকালের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে মনে ধার্য্য করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য, রে কর্ত্তব্য! তুমি তৎকালে কেটোর মনে কি ভাবে উদিত হইয়াছিলে? যে ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিবলে বিস্তীর্ণ রোমরাজ্য শাসনের ক্ষমতা ধরিত, স্বহস্তে আত্মপ্রাণ নাশ করা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া যাহার এক সময়ে বোধ ছিল, যিনি জীবনে কত শত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও পালন করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনিই কি না তুচ্ছ অপমানের ভয়ে আত্মহত্যারূপ গর্হিত কার্য্যকে তৎকালের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন? রে কর্ত্তব্যবোধ! তুমি তৎকালে কেটোর মনে রাজ্যভোগের আশা পরিত্যাগ করিয়া অতি দূরদেশে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য, এইরূপে উদিত হইলে না কেন? যদিও বীরপুরুষের মনে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করা নিতান্ত ঘৃণা ও লজ্জাজনক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, রে কর্ত্তব্যজ্ঞান! তুমি তাঁহার মনে বরং সিজরের সহিত একক সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া

সমরশায়ী হওয়া কর্ত্তব্য, এই ভাবে উদিত হইলে না কেন? বোধ হয়, তাহা হইলে, তোমাকে ভর্ৎসনা করিবার আমরা কোন হেতু প্রাপ্ত হইতাম না।

মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য বোধ কখন কিরূপ ভাব ধারণ করে, তাহা মনে করিতে গেলেও সময়ে সময়ে আমাদিগের শোণিত শুষ্ক হইয়া থাকে। কোন প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, কোন একটি গণ্ডগ্রামে এক ধনবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ব্রাহ্মণটির স্বভাব অতি উগ্র ছিল। তিনি সামান্য দোষে আত্মীয় পরিবারগণকে কটুকাটব্য বলিতেন ও কেহ কোনরূপ কৌলিন্য-মর্য্যাদার হানিকর কার্য্য করিলে, তাহার প্রতি উৎকট দণ্ডবিধান করিতেন। এক কথায় বলিতে হইলে, কৌলিন্য-মর্য্যাদার অনুরোধে তিনি না করিতে পারিতেন, এমন কার্য্যই নাই! আমি কুলীনপুত্র, আমার ন্যায় বড়লোক এই অঞ্চলে আর কেহ নাই, আমার কুল নিষ্কলঙ্ক, সর্ব্বদা এইরূপ মদগর্ব্বেই মত্ত হইয়া থাকিতেন; কিন্তু কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে প্রকৃত পক্ষে মর্য্যাদা রক্ষা হইবে তাহা এক দিনের জন্যও ভাবিয়া দেখিতেন না। সামান্য দোষে দলাদলি ঘটাইয়া প্রতিবাদিগণের মর্ম্মপীড়া দেওয়া তাঁহার একটি স্বভাবসিদ্ধ দোষ ছিল। সেই ব্রাহ্মণের তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা। কন্যাগুলি সকলেই বয়স্থা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কৌলিন্যমর্য্যাদার অনুরোধে তাহাদিগের মধ্যে একটিরও বিবাহ দিতে পারেন নাই। কিছুকাল পরে মধ্যম কন্যাটি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় কুলীনপুত্র জানিতে

পারিয়া দুশ্চারিণী কন্যার প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য, পুত্রগণের সহিত এক রজনীতে তাহাই স্থির করিতে বসিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর, ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার এত বড় নাম, এক দুশ্চারিণী কন্যা হইতে ডুবিবার উপক্রম হইয়াছে, আমি অদ্য রজনীতে উহাকে গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলিব ও অধিক রজনীতে চটের ভিতর পুরিয়া চারি পিতাপুত্রে যাইয়া নদীর জলে ডুবাইয়া দিয়া আসিব, মর্য্যাদা রক্ষার অনুরোধে আমি ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম, এক্ষণে তোমাদিগের অভিমত প্রকাশ কর।" পিতার এই ভয়ানক প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া পুত্রত্রয় অধো-বদনে বসিয়া রহিলেন, কি উত্তর দিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রত্রয়কে নিরুত্তর দেখিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "তোরা এই ভাবে এই খানে বসিয়া থাক্, আমি কার্য্য শেষ করিয়া আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া দুরাত্মা বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং দেখিল, ঐ কন্যা আপন গৃহে নিদ্রা যাইতেছে। দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সেই দুহিতার গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলিল। পুত্রত্রয় সেই সংবাদ অবগত হইয়া ভয়ে অভিভূত হইল; তথাচ লোকলজ্জার ভয়ে সেই দুর্ব্বৃত্ত পিতার সহায়তা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া গভীর রজনীতে সেই মৃত দেহটি সকলে মিলিয়া নদীর জলে ডুবাইয়া দিয়া আসিল। কর্ত্তব্য! তুমি সেই নরপিশাচের মনে দুশ্চারিণী কন্যাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য, এই ভাবে উদয় হইলে না কেন? তাহা

হইলে, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কেবল এক লোকলজ্জার অনুরোধে স্ত্রীহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হইত না।

সময়ে সময়ে কেবল এক সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভের অনুরোধে ভূস্বামীরা কতশত অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। তখন নিতান্ত অকর্ত্তব্য কার্য্য সকল তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। যখন জর্ম্মণবাহিনী ফরাসী সৈন্যকে পদে পদে পরাস্ত করিয়া রাজধানী অভিমুখে আসিতে লাগিল, সে সময় ফরাসীরা উপায় না দেখিয়া অগত্যা রাজধানীর চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং শত্রুগণকে বিমুখ করিবার মানসে সেই রাজধানীর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। জর্ম্মণবাহিনী যদিও সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হইয়াছিল, তথাপি সুন্দর প্যারিস নগর অধিকার না করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। এই জন্য জর্ম্মণেরা নগরের চারি দিকে তোপ সাজাইয়া অবিরত গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন; তদ্দ্বারা কতশত আবালবৃদ্ধবনিতার অকারণ প্রাণ নষ্ট হইতে লাগিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জর্ম্মাণ সম্রাটের এরূপ জঘন্য কার্য্য কি কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছিল। সামরিক বিধানানুসারে শত্রুপক্ষীয়কে সর্ব্বতোভাবে হীনবল করাই তৎকালে তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছিল। গোলাবৃষ্টি দ্বারা অজস্র দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ ও দুর্ব্বল নারীগণের হত্যা হইতেছে হউক, তাহাতে সম্রাটের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; তিনি সসৈন্যে প্যারিস নগরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাই করিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে আমা-

দিগের ব্রিটীশবাহিনীও উপরি উক্ত বিধানানুসারে প্রাচীন নগর আলেকজাণ্ড্রিয়া গোলাবৃষ্টি দ্বারা একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এখনকার কথা দূরে থাকুক, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন দশরথাত্মজ রামচন্দ্র, মন্ত্রিচূড়ামণি জাম্ববানের মন্ত্রণায় লঙ্কানগরী একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন ; সেই অগ্নি-কাণ্ডে কতশত বামা ও বালক নিহত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এরূপ কার্য্য করা, কি বলিয়া রামচন্দ্রের কর্ত্তব্য হইয়াছিল ? রাবণকে বধ করিয়া তাঁহার প্রাণপ্রতিমা জানকীকে উদ্ধার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠায়, যে কোন প্রকারে হউক, সেই কার্য্যের অনুরোধে রক্ষঃকুলপতিকে নিপাত করাই তাঁহার একটি কর্ত্তব্য উপ-স্থিত হয় ; সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে রামচন্দ্রের ন্যায় শান্ত-প্রকৃতির লোক একবারে দয়া-মায়া-পরিশূন্য হইয়া বেড়া আগুণে লঙ্কাবাসিগণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। স্বকার্য্য উদ্ধা-রের সময় লোকের নিতান্ত অকর্ত্তব্য কার্য্যকেও কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।

নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানে আমরা যে সকল বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করি, অনেক সময় মন সে সকল কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া থাকে। বোধ কর, কোন ব্যক্তির প্রিয় পুত্র সিবিলিয়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল ; পিতা সেই কৃতবিদ্য পুত্রকে কেবল এক সমাজের অনুরোধে সহসা গৃহে আনিতে পারি-লেন না। কারণ, তাঁহার পুত্র স্বদেশে আসিতেছে, কুটুম্ব বান্ধবেরা এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই তাঁহাকে ভয় ও

মিত্রতা দেখাইতে লাগিলেন। নিতান্ত আত্মীয়েরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, এক অর্থের সাহায্য ব্যতিরেকে ম্লেচ্ছান্নভোজী পুত্র দ্বারা তোমার আর কি উপকারের সম্ভাবনা আছে? যদি স্নেহ বশতঃ পুত্রকে গৃহে আনয়ন কর, তাহা হইলে, চিরকালের জন্য সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইবে; অন্যান্য পুত্রকন্যাগণের বিবাহ দিতে পারিবে না। কেবল এক ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছের সহিত সম্মিলিত হইও না, তাহা হইলে, চরমে দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে। যে, কেবল এক ধনের লোভে জাতিকুল পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার প্রতি আর মমতা কি? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে তোমার পুত্রকে কুলাঙ্গারের মধ্যে গণনা করিতে হয়। যে, পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধ-তর্পণের অধিকারী হইল না, তাহাকে আর পুত্র বলিয়া গণনা করা যায় না। আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম, এক্ষণে তুমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির কর। জ্ঞাতি কুটুম্বের তাড়নায় পিতা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রাণসম প্রিয়পুত্রের সহিত একত্র না থাকাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন; কিন্তু তাঁহার মন সে কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য জ্ঞান করিল—মন নিয়তই পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিল। শয়নে স্বপনে পিতা প্রিয় পুত্রকে ভাবিতে লাগিলেন। তিনি সময়ে সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া এই সম্বন্ধে মনের সহিত পরামর্শ করিতেন। মন সাহসের সহিত পরামর্শ দিত যে, কেবল দোষাকর দেশাচারের অনুরোধে সর্ব্বগুণসম্পন্ন সাধু পুত্রকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

তুমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, যাহারা প্রকাশ্যভাবে হোটেলে যাইয়া মদ্যমাংস খাইতেছে, যবনানী বেশ্যার সহিত আহার ব্যবহার করিতেছে, পাপের দাস হইয়া পৈতৃক ধন নষ্ট করিতেছে, এরূপ শত শত নরাধম পুত্রেরাও সমাজচ্যুত হইতেছে না। তোমার বহুগুণাকর পুত্রটি বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে ম্লেচ্ছদেশে গিয়াছিল বলিয়া একেবারে সমাজচ্যুত হইল, এরূপ সমাজের অনুরোধ রক্ষা করিয়া চলা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যদিও মন সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে এইরূপ পরামর্শ দিত, তথাপি তিনি কর্ত্তব্য কার্য্যকে সমাজের অনুরোধে অকর্ত্তব্য জ্ঞানে পুত্রটিকে সাহস করিয়া গৃহে আনিতে পারিলেন না। তিনি পুত্র অপেক্ষাও সমাজ রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিলেন। কি জন্য ধরিলেন, তাহা বিস্তারিত লিখিতে গেলে, অনেক কথার উল্লেখ করিতে হয়। অনেক স্থলে বলা হইয়াছে যে, কেবল স্বার্থই লোকের কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবার মূল কারণ। বিলাতাগত পুত্রের পিতা কি জন্য পুত্রটিকে গৃহে না আনাই কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন, আবার মনে মনে কি জন্যই বা অনুতাপ করিতে লাগিলেন, ইহার প্রকৃত কারণ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

বিলাতাগত পুত্রের বিষয়ে পিতা প্রথমতঃ এইরূপ ভাবিলেন, জ্ঞাতি বন্ধুরা পুত্রটিকে গৃহে আনিতে নিষেধ করিতেছেন; তাঁহাদিগের কথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। যদি পুত্রটি দীর্ঘকাল জীবিত না থাকে, তাহা হইলে, কেবল আমার জাত হারাণই সার হইল; কন্যাপুত্রের বিবাহ দিতে পারিব

না ও কুটুম্ব বান্ধবও গৃহে আসিবে না। অতএব এরূপ অবস্থা-পন্ন হওয়া অপেক্ষা অর্থের লোভ সম্বরণ করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে লিখিয়াছে, পিণ্ডের জন্যই পুত্রের প্রয়োজন, আমি পরলোক গত হইলে, পুত্র যত শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবেন, এখন হইতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছি, তবে একমাত্র ধনের জন্য জাতি-ভ্রষ্ট হইয়া থাকা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আর পুত্রটি যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, ইহাতে তাহার নিজের ব্যয় কুলান হওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিবে, সে যে অর্থ দিয়া আমার সমস্ত দুঃখ মোচন করিবে, ইহাও সর্ব্বতো-ভাবে বিশ্বাস হয় না। তবে যদি কর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া পিতামাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাহা হইলে, সে যেখানেই থাকুক, অর্থের দ্বারা আমার সাহায্য করিতে পারিবে। আর এখানে আসিতেও নিষেধ নাই; অনেক খৃষ্টানও লোকের বাটীতে যাওয়া আসা করিয়া থাকে, সে বিষয়ে সমাজের লোক কোন কথা উত্থাপন করে না। সুতরাং পুত্রটিও আমার বাটীতে আসিতে পারিবে ও আমিও মধ্যে মধ্যে তাহাকে দেখিয়া আসিতে পারিব অথচ সমাজ-চ্যুত হইতে হইবে না, এরূপ সুবিধা থাকিতে তাহাকে গৃহে রাখিয়া সমাজচ্যুত হইবার প্রয়োজন কি? এইরূপ মনে মনে নানা তর্ক বিতর্কের পর বিলাতাগত পুত্রের পিতা, পুত্রের স্বতন্ত্র থাকাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন।

এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে যে, সেই বিলাতাগত পুত্রের পিতার যদি বিপুল বৈভব, দশ ঘর ধনাঢ্য লোক ও বশীভূত কুটুম্ব থাকিত,

তাহা হইলে, তিনি হয়তঃ মনে মনে এইরূপ স্থির করিতেন যে, আমি প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুত্রটিকে গৃহে আনিলে আমার কেহই কিছু করিতে পারিবে না। যদি দুই চারি ঘর নিঃস্ব কুটুম্ব ও বান্ধবেরা কেবল এক বংশ-মর্য্যাদার প্রভাবে মস্তক সঞ্চালন করে, তাহা হইলে, অর্থের দ্বারা তাহাদিগকে বশ করিয়া ফেলিব। আমার পুত্র যেরূপ ধনাঢ্য লোকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, সহসা তাহাকে সমাজভ্রষ্ট করিতে কাহারও সাহস হইবে না; অতএব পুত্রটিকে অকুতোভয়ে গৃহে আনয়ন করিব, দেখি, আমার কে কি করিয়া উঠে। সমাজের ভয়ে পুত্রকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আজ কাল আবার সমাজ কি? কাহার গৃহে কি না হইতেছে? এইরূপে সেই সম্পন্ন ব্যক্তি কেবল এক ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পুত্রকে গৃহে আনাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন; কিন্তু পূর্ব্বকথিত নিঃস্ব ব্যক্তির সেরূপ সাহস হইল না। তবেই দেখা যাইতেছে, অবস্থানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অবস্থাও স্বতন্ত্র ভাব ধারণ করে।

সমাজসঙ্গত কর্ত্তব্য প্রায়ই আমাদিগের হৃদয়গ্রাহী হয় না। আবার ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্ম সঙ্গত কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে, আজ কাল সংসার করাই দুষ্কর হইয়া উঠে। রাজনৈতিক কর্ত্তব্য সময়ে সময়ে যেরূপ ভীষণভাব ধারণ করে, তাহা মনে করিতে গেলেও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। ইতিহাসে পাঠ করা গিয়াছে, রাণা লক্ষ্মণসিংহ ভয়ানক ষড়যন্ত্রে পড়িয়া আপনার প্রাণসমা দুহিতা সরোজিনীকে চতুর্ভুজা দেবীর সম্মুখে বলিদান করা

কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। সে কর্ত্তব্য প্রথমতঃ তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হয় নাই; পরে মন্ত্রিগণ এই লোমহর্ষণ ব্যাপার নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল। রাজ্য-রক্ষার জন্য যদিও লক্ষ্মণসিংহ মন্ত্রিগণের মতেই মত দিয়া-ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মন একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই।

সূর্য্যবংশাবতংশ মহারাজ ভীমসিংহের কৃষ্ণকুমারী নাম্নী অলৌলিক রূপলাবণ্যসম্পন্না একটি কন্যারত্ন জন্মিয়াছিল। কন্যাটির রূপগুণের কথা ভারতবর্ষের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় দুই তিন জন প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি কৃষ্ণ-কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য পর্য্যায়ক্রমে ভীমসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করেন। যে সকল রাজা কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নীচকুলোদ্ভব। সূর্য্যবংশীয়েরা কোন কালে সে সকল রাজগণের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়েন নাই, সেই জন্য ভীমসিংহ তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। রাজগণ সৌজন্যতায় কৃষ্ণকুমারী লাভে হতাশ হইয়া ভীম সিংহের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিন দিক হইতে তিন জন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা সসৈন্যে অগ্রসর হই-তেছে শুনিয়া ভীমসিংহ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। শত্রুগণ রাজ্যের প্রায় নিকটস্থ হইল দেখিয়া, তিনি মন্ত্রি-গণের সহিত ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে বসিলেন। মন্ত্রিগণ কহিলেন, "মহারাজ! প্রবল শত্রুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এক কৃষ্ণকুমারীর জন্যই

রাজগণ অস্ত্রধারী হইয়া আপনার প্রতিকূলে আসিতেছে; সম্প্রতি রাজ্য রক্ষার একটিমাত্র উপায় আছে। যদি আপনি সম্মত হন, তাহা হইলে, রাজা প্রজা সকলেরই প্রাণ রক্ষা হইবে; কিন্তু সেটি বড় ভয়ানক কথা, সহসা সে কথা বলিতেও আমাদিগের সাহস হইতেছে না।” কি উপায়ে রাজ্য রক্ষা হইতে পারে, রাজা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় একজন মন্ত্রি শির অবনত করিয়া কহিল, “রাজ্য রক্ষার জন্য সূর্য্যবংশীয়েরা না করিয়াছেন কি? আপনার পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র কেবল এক প্রজারঞ্জনের জন্য পূর্ণগর্ব্ভা জানকীকে বনে পাঠাইয়াছিলেন। আপনি যখন সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন রাজকীয় কর্ত্তব্যের অনুরোধে অদ্য রজনীতে ঘাতুকের দ্বারা কৃষ্ণকুমারীর জীবনান্ত করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন রাজ্যরক্ষার উপায়ান্তর নাই।”

কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিযা রাজ্য রক্ষা করিবার কথা উপস্থিত হওয়ায় মহারাজ ভীমসিংহ অধোবদন হইলেন। চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল এবং সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। মহারাজকে এই অবস্থাপন্ন দেখিয়া মন্ত্রিগণ পুনর্ব্বার কহিল, “মহারাজ! আমরা রাজ্য রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া যে জঘন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি, পিতার পক্ষে এটি শ্রুতিকটু হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু মহারাজ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে আমাদের কি দশা ঘটিবে? নীচকুলোদ্ভব রাজগণ রাজ্য লুণ্ঠনের পূর্ব্বে কৃষ্ণকুমারীকে বলপূর্ব্বক শিবিরে লইয়া যাইবে, বন্দিনী হইবার পূর্ব্বে রাজকুমারী কুলমর্য্যাদা

রক্ষা করিবার জন্য আত্মঘাতিনী হইলেও হইতে পারেন। আমরা বিলক্ষণ বুঝিতেছি, কৃষ্ণকুমারীর প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর নাই। তবে একমাত্র বাৎসল্য স্নেহের অনুরোধে কি জন্য রাজ্যনাশ ও বনবাস স্বীকার করিবেন? মন্ত্রিগণের কথা শুনিয়া ভীমসিংহ অগত্যা কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। এই পৈশাচিক কার্য্য সমাধা করিতে রাজা তাঁহার সহোদর বলদেব সিংহের প্রতি ভারার্পণ করিলেন। যেমন ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে পূর্ণগর্ভা সীতাকে নিবিড় অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেইরূপ বলদেব সিংহ ভ্রাতার অনুরোধে শস্ত্রপাণি হইয়া কৃষ্ণকুমারীর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, দেখিলেন, রাজকুমারী খট্টার উপর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। বলদেব সেই রূপরাশির প্রতি একবার স্নেহ চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া শোকে অভিভূত হইলেন, হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় দেখিলেন যে, তাঁহার পিতৃব্য খট্টার নিকট দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি তরবারি পতিত রহিয়াছে, কৃষ্ণা আস্তে ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকা, তুমি রোদন করিতেছ কেন? আমাদের কি হইয়াছে?" বলদেব কাঁদিতে কাঁদিতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ কৃষ্ণকুমারীর নিকট বর্ণন করায়, কৃষ্ণা বিস্ফারিত লোচনে কহিলেন, "ইহার জন্য আবার রোদন কি! আমি মরিলে যদি রাজ্য রক্ষা হয় ও সর্ব্বাংশে পিতার মঙ্গল হয়,

তবে ইহা অপেক্ষা মরিবার উত্তম সময় আর কবে হইবে? আমি ক্ষত্রিয়-কন্যা হইয়া মরিতে কি ভয় করি? এই দেখ, মরিলাম।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণকুমারী ভূতল হইতে অস্ত্র খানি কুড়াইয়া লইলেন ও স্বহস্তে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রাজা ও রাণীর উন্মাদ দশা ঘটিল। শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইল কি না, সে সকল বিষয় বলিবার আর কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, কর্ত্তব্যই আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়। ফলতঃ পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশীয়েরা কেহ কেহ, যে কোন প্রকারে হউক রাজ্য রক্ষা করা, কেহ বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা, কেহ বা প্রজা-রঞ্জন করা সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য বোধে, দয়া-মায়া-পরিশূন্য হইয়া না করিতে পারিতেন এমন কার্য্যই নাই।

অধুনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন গৃহস্থের মাতা ও ঐ গৃহস্থের সহধর্ম্মিণীতে সর্ব্বদা কলহ চলিতে থাকে, তাহা হইলে, উপযুক্ত পুত্র সর্ব্বদা কলহ সহ্য করিতে না পারিয়া মনে মনে বিবেচনা করেন যে, প্রত্যহ এরূপ খিচি মিচি সহ্য হয় না, এরা যতদিন একত্র থাকিবে ততদিন তো সংসারে কিছুমাত্র সুখ নাই, এদের পৃথক্ করাই উচিত। বুড়া মাগীকে উহার ভ্রাতার বাটীতে পাঠাইয়া দিই, মাসে মাসে দুটাকা করে খোরাকী পাঠাইয়া দিলেই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করা হইবে; মায়ের জন্য ত আর স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করা যায় না। একজন গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন Man may leave his father and mother b .t cleave to his wife. এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি বৃদ্ধ

মাতাকে তাঁহার ভ্রাতার বাটী পাঠাইয়া দেওয়া ও তথায় দুইটি করিয়া টাকা মাসে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। বোধ হয়, এরূপ স্থলে "কর্ত্তব্য" শব্দের সৃষ্টি না হইলেই ভাল হইত। কারণ, অধিকার ও প্রয়োজন ভেদে লোকে বালহত্যা, বামাহত্যা প্রভৃতি নিতান্ত অকর্ত্তব্য কর্ম্মকেও কর্ত্তব্য বোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ইহ সংসার একটি কার্য্যক্ষেত্র, এই কার্য্যক্ষেত্রে, যাঁহারা ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মানুসারে কার্য্যকলাপ সমাধা করিতে পারেন, তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করা হয়। মনুষ্য মাত্রই জন্মগ্রহণ করিয়া চরমকাল পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরের সাহার্য্য অপেক্ষা করে, এই জন্যই জীবের সহিত জীবের সম্বন্ধ। আমাদিগকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কুটুম্ব, বান্ধব, দাস, দাসী, প্রতিবাসী প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। পরস্পর পরস্পরের প্রতি উচিত ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। পিতা মাতার সন্তানকে লালনপালন ও উপযুক্ত সময়ে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া এবং পুত্রের কার্য্যক্ষম হইলে, উপার্জ্জন করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণপোষণ ও সেবাশুশ্রূষা করা প্রভৃতি কার্য্যকে ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য, অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্য কহে। যদি কোন পিতা মাতা, উপযুক্ত পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা না করান, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করা হইল না। এইরূপ সকলেরই সকলের প্রতি উচিত কার্য্য আছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া তৎসমুদয় প্রতিপালন করা শ্রেয়ঃ এবং যাহাতে কর্ত্তব্য-

বিমূঢ় না হইতে হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, নানা কারণ বশতঃ আমরা সময়ে সময়ে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকি। পাঠ্যাবস্থায় কেবল আমাদিগের মনোযোগের সহিত পাঠ্যপুস্তক পাঠ করা, পিতা মাতার উপদেশানুসারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু কোন কোন বালক বালিকা সেই অবস্থা হইতেই কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, মনোহর ইতিহাসাদি পুস্তক পাঠ ও সহযোগীর সহিত বৃথা গল্প করিয়া সময় অতিবাহিত করে।

কোন কোন লোক যৌবনে পদার্পণ করিয়া উপার্জ্জন-ক্ষম হইলে, যৌবন-সুলভ বিলাস আসিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন তাহারা সেই বিলাসের অনুরোধে সময়ে সময়ে কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে না। বোধ কর, কোন যুবকের বৃদ্ধ পিতা আপনার উপযুক্ত পুত্রকে কর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া একদিন কহিলেন, "তুই সন্ধ্যার পর পাঁচ ছয় জন মাতাল নিয়ে ঘরের ভিতর গোলমাল করিস; আমার ঘরে দশ জন ভদ্রলোক আসে, তাদের খাতির যত্ন করে কে? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার শরীর তেমন ভাল নয় যে, আমি উঠে হেটে তাদের যত্ন করি। তৎশ্রবণে উপযুক্ত পুত্র মনে ক্ষোভ পাইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া বিবেচনা করিলেন, এত দূর কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে গেলে ত চলে না; সমস্ত দিন, পরিশ্রমের পর রজনীতে পাঁচ জন বন্ধু বান্ধবের সহিত পরিমিত সুরাপান করি ও যন্ত্র তন্ত্র লইয়া গীত বাদ্য করি, এ সব আমোদ ছেড়ে দিয়ে ওঁর কাছে দু পাঁচটা টীকিওলা কোঁটা কাটা, কখন আসবে

তাদের খাতির যত্ন করিগে, আঃ কি কথাই বল্লেন!—তা আমি পারবো না। যদি সকল কার্য্যেই কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ধরিতে হয়, তা হলে আর আমোদ আহ্লাদ বা সংসারে বাস করা চলে না। ঘুস নেওয়া, চুরি করা অকর্ত্তব্য তা কি আমি জানি না। মনিবের আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কি কোরবো, আমার মাসে একশত টাকা খরচ, যা মাহিনা পাই তাতে ত কুলায় না, কাজেই নানা কৌশলে অর্থশোষণ করিতে হয়। এক্ষণে যদি মনিবের আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করা, আর চুরি না করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করি, তা হলে, ভাল কাপড় চোপড় পরা, বাটীতে দোল দুর্গোৎসব করা, এ সব তো হয়ে উঠে না; আর মধ্যে মধ্যে মনিবকে ফাঁকি না দিলে ত গাধার মত খেটে মরতে হয়। আমার চলে না, কাজে কাজেই আমাকে কত অকর্ত্তব্য কার্য্য করিতে হয়, মনিবের কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া যে কার্য্যে দু পয়সা পাই, তাহাই করিতে হয়।

বোধ কর, কোন লোকের একজন আত্মীয়পাত্রের শঙ্কট পীড়া হইয়াছে। ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ স্বয়ং তাহাকে দেখিতে যাওয়া, আত্মীয়কে সাহস ও তৎকালোচিত পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু যদি ঐ লোক তাহা না করিয়া অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ প্রমোদ উপভোগে রত থাকেন। এবং আলস্য বা দীর্ঘসূত্রতার বশবর্ত্তী হইয়া আজ যাইব, কাল যাইব, ভাবিয়া কালাতিপাত

করেন, তাহা হইলে, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করা হইল না; তাঁহার তৎকালোচিত কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করা হইল। ঈশ্বরচিন্তায় ও তাঁহার প্রতি ভক্তি উপহার প্রদান করিবার জন্য দিবসের কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিতে হয়; কিন্তু যদি কেহ তাহা না করিয়া সমস্ত দিবস স্বার্থচিন্তায় বা অলীক আমোদ প্রমোদে যাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহারও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করা হইল না, অবশ্য বলিতে হইবে। যিনি শপথ পূর্ব্বক বিচারাসন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি আপনার কোন প্রিয় বন্ধুর অনুরোধ বশতঃ কোন একটি মোকদ্দমায় পক্ষপাত করেন ও যথার্থ দোষীকে উচিত শাস্তি দিতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, তিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কার্য্য করিতেছেন। যে কার্য্য অনুচিত অর্থাৎ ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ, তাহা জানিয়া শুনিয়াও যে ব্যক্তি সেই অনুচিত কার্য্য হইতে ক্ষান্ত না হয়, তাহার কর্ত্তব্য পালন করা হইল না। পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবে, এবং সম্ভবমত আপন বৃদ্ধ পিতামাতার স্ত্রীপুত্রপরিবারের ভরণপোষণ ও তাহা সম্পন্ন হইলে জ্ঞাতি; বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবাসী প্রভৃতিকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান ও আপন আমোদ প্রমোদের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করিবে, ইহাই সুনীতি। কিন্তু কোন কোন লোক আপনার ও আপন স্ত্রীপুত্রের বিলাস চরিতার্থতার জন্য এত ব্যস্ত যে, সমস্ত অর্থই তাহাতে ব্যয় করিয়া থাকেন। যিনি বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারও অবসর প্রাপ্ত হন

না,..তিনি যে তাঁহার পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছেন না, ইহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। কেবল যে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের ভরণ পোষণ দিলেই কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করা হইল এরূপ নহে, পিতামাতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা, স্ত্রীর প্রতি যত্ন ও মিষ্টালাপ, পুত্রের প্রতি স্নেহ ও সস্নেহ উপদেশ প্রদান, বন্ধু বান্ধব ও ভৃত্যাদিগের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার আলাপাদিও কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিতে হইবে। যদি কেহ আপন স্ত্রীকে অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি দিতে ত্রুটি না করেন; কিন্তু সুরাপান করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ ও বিনা দোষে সাধ্বী স্ত্রীকে কটু কাটব্য উক্তি ও প্রহারাদি করেন, তাহা হইলে, যথেষ্ট ভোজন পান দিতেছেন বলিয়া যে তাঁহার স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করা হইতেছে, এ কথা কে বলিতে পারে?

মনুষ্য হৃদয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই কয়েক রিপুর মধ্যে যে কোন রিপু হউক, প্রবল হইলে, তাহার আর কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি থাকে না। মনুষ্যহৃদয় সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ, বিলাস, উপভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। বিলাসাদি চরিতার্থের প্রধান সহায় অর্থ। অর্থের দিকে তীক্ষ্ণ চক্ষু থাকিলে পদে পদে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হয়। এইরূপে মনুষ্য কখন বা স্বার্থের জন্য, কখন বা বিলাসাদি উপভোগে রত হইয়া কখন বা আলস্য প্রযুক্ত কখন বা অনুরোধে পড়িয়া এবং সময়ে সময়ে ষড়্‌রিপুর উত্তেজনায় আপনাপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে করিয়া উঠিতে পারে না। অতএব হে পাঠকগণ! যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ইহ সংসারের

কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সমাধা করিয়া মনুষ্য নামের সার্থকতা লাভ করিতে চাহ; তাহা হইলে, সত্যধর্ম্মকে ভিত্তি স্বরূপ ধরিয়া অবস্থা বিশেষের কর্ত্তব্য অবধারণ কর। হৃদয়ে স্থির কর যে, কর্ত্তব্য কার্য্য যত দূর কঠিন হউক না, অবশ্য সমাধা করিব। কি স্বার্থের অনুরোধে, কি লোভ প্রভৃতি ষড়্‌রিপুর উত্তেজনায়, কি ভোগ বিলাসাদি প্রবৃত্তি বশতঃ, কি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে, কি প্রিয়তমার চিত্তবিকলকারী মধুর বাক্য-কৌশলে, কি ধূর্ত্তগণের কৌশলপূর্ণ বাক্‌চাতুর্য্যে, কি কাহারও স্তব স্তুতিতে, কি কোন লোকের কাতরোক্তি শ্রবণে মায়া বশতঃ যদি হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে কিম্বা হৃৎপিণ্ড ব্যথিত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবার উপক্রমও হয়; তথাচ কখনই আপন কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিচলিত হইবে না; সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, কর্ত্তব্য কার্য্য যত কেন কঠিন হউক না, তাহা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।

কলিকাতা: গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫: নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। সন—১২৯৬।
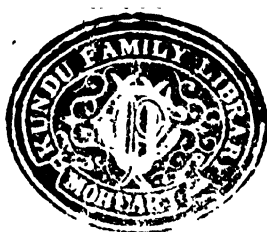
পূর্ব্বভাস।

নীতিই ইহ সংসারে সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রী শক্তি। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকল আকারেই এই মহতী নিয়ামিকা শক্তি জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। নীতির সহিত ধর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কোনও কালে কোনও মানব নীতি-বিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্ম-পথের বা প্রকৃত সুখশান্তির পথের পথিক হইতে পারিয়াছে, এরূপ কুত্রাপি কাহারও দর্শন বা শ্রবণ গোচর হয় নাই। দুর্য্যোধন হইতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির জীবনী এই একই কথার সাক্ষ্যপ্রদান করিবে। ব্যষ্টির সম্বন্ধে যে নিয়ম, সমষ্টির সম্বন্ধেও অবিকল তদনুরূপ। সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কালের ইতিহাস আলোচনা করিলে কোথাও এই নিয়মের ব্যভিচার লক্ষিত হয় না। কবে কোন্ জাতি দীর্ঘকাল নীতির অবমাননা করিয়া আপনাকে উন্নতি-উপলের উচ্চশিখরে অবস্থিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে? অনৈতিক ব্যক্তির ন্যায় নীতি-বিরহিত জগতের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। কোনও জাতি কখনও পাশব বলে সাম্রাজ্য জয় করিতে পারে সত্য, কিন্তু সেই বিজিত সাম্রাজ্য রক্ষা বিষয়ে জাতির অন্তর্নিহিতা শক্তি কেবল নীতি। নীতি বিসর্জ্জন আর অধঃপতন যেন জগতে গণিত শাস্ত্রের কার্য্য কারণ নিয়মে অখণ্ড্য; একে, অপরের অনুসরণ করিয়া

থাকে। হিন্দু-জাতির কথা, প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতির কথা ছাড়িয়া দি, ভারতে সেদিনকার মুসলমান সাম্রাজ্যের অ… …ন কি সেই পুরাতন শিক্ষা আর একবার নূতন করিয়া দিয়া গেল না? মুসলমান জাতি পরাক্রান্ত ছিল না কে বলিবে? যাহাদিগের সাম্রাজ্যের এক একটা ভগ্নাংশ পরাজয় করিতে বিশ্ববিজয়ী বৃটিশজাতিকে যত্ন ও আয়াসের চরম সীমায় যাইতে হইয়াছে, তাহাদিগের শৌর্য্যের অন্য পরিচয়ের প্রয়োজন কি? এ হেন মুসলজাতিও আপন বীরত্ব-জিত ভারতসাম্রাজ্য দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারিল না। উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এবং ১১৯৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের মধ্যেই বর্দ্ধিত তরু একেবারে ধ্বংসের বিষময় ফল উৎপন্ন করিল।

তবেই কোনও ব্যক্তি বা জাতির স্থায়িভাবে উন্নতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নীতি-প্রতিপালনের প্রয়োজন। নীতি সকল উন্নতির ভিত্তি। নীতি-ভিত্তির উপরি প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিজ্ঞান-দর্শন আপনাপন লোক-হিতকর প্রভাব প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, নীতির এইরূপ প্রত্যক্ষ মঙ্গলময় ফল, মানবজাতি এখনও চিনিতে পারিল না। জগতের ধর্ম্মশাস্ত্রের ধর্ম্মসংস্থাপকগণ ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, ধর্ম্মপরায়ণ মনীষিগণ স্বীয় স্বীয় জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তদ্বারা লোকশিক্ষা দিতেছেন, জগতের মহাকাব্য সকল মধুর ভাষায় সুনীতি ও দুর্নীতির সদসৎ পরিণাম

ঘোষণা করিতেছে, পুরাণ ও ইতিহাস পরিণামের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু হায়! সাধারণ মানবমনে কিছু উদ্বোধিত হইল না, কিছুতেই ধর্ম্মের মোহিনী মূর্ত্তির মোহন আকর্ষণে আকৃষ্ট হইল না।

মানব-হিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, নীতি মনুষ্যের অশেষ মঙ্গলের মূলীভূত হইলেও মানবসাধারণ এখনও ইহার উপযুক্ত সমাদর করিতে শিখিল না কেন? দুর্নীতি অশেষ অনর্থের কারণ হইলেও লোকে ইহার মোহ-জাল ভেদ করিতে পারিল না কেন? কাচ-কাঞ্চনের ভেদ আর কতকাল সমাজে অপরিজ্ঞাত থাকিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানী লোকেরা অনেকেই স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতের আলোচনা ও বিচার করা এক্ষণে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগের নিজের সামান্য জ্ঞানে ও দর্শনে আমরা উপস্থিত প্রশ্নের যেরূপ মীমাংসা করিয়াছি, কেবল তাহাই পাঠকগণের নিকট বিবৃত করিব।

সুনীতি মানবহিতের এতাদৃশ অনুকূল ও দুর্নীতি সম্পূর্ণ তদ্বিপরীত হইলেও যে মানবসাধারণ আজি পর্য্যন্ত দু-র্নীতিরই পক্ষপাতী, আমাদিগের বিবেচনায় তাহার কারণ এই যে, সুনীতি অপেক্ষা দুর্নীতির আপাততঃ মধুরত্ব অনেক অধিক। সাধারণ মানব প্রায়ই পরিণাম-চিন্তা-শূন্য, সুতরাং অবিমৃশ্যকারী, এবং তজ্জন্যই দুর্নীতি প্রবল। যদি ধর্ম্মের প্রথম সোপানে মধুরিমা থাকিত, তাহা হইলে মনুস্যগণকে ধর্ম্মপরায়ণ করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ পাইতে হইত না।

মদ্যপায়ী যদি মদ্যপানের সুখময় প্রথম অবস্থায় একবার পরিণাম-চিন্তা করিত, যদি মনে করিত, এই মদ্যপানে লক্ষ লক্ষ লোক শারীরিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক, ত্রিবিধ পীড়ায় বিষম পীড়িত, অবশ্য-প্রতিপাল্য পরিবারবর্গকে ঘোর দুঃখার্ণবে নিমজ্জিত করিয়া অকালে লোকযাত্রা সম্বরণ করিয়াছে, তাহা হইলে কি সে প্রথম পান-পাত্র স্পর্শ করিত? তস্কর যদি একবার স্বকার্য্যের চরমফল ভাবিয়া দেখিত যে, অগণ্য লোক তৎসদৃশ কার্য্য করিয়া কঠোরতম রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহা হইলে কি সে প্রথম লোভের উত্তেজনাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিত না? সর্ব্বপ্রকার সমাজদ্রোহী দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তি সম্বন্ধেই এই নিয়ম।

এক্ষণে সদুপায় কি? জনসাধারণকে ধর্ম্মরসে রসজ্ঞ করিবার ফলোপধায়ক অনুষ্ঠান কি? আমরা বহু চিন্তার পর স্থির করিয়াছি, যদি কোন উপায়ে পাপের দুষ্ট পরিণামের চিত্র পাপকর্ম্মোদ্যত ব্যক্তির সমক্ষে ধারণ করিতে পারা যায়, যদি সে পাপকার্য্যের আদ্যন্ত সমগ্র চিত্র স্থির-চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার অবশ্যই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রের ও কাব্য-ইতিহাসের অনেক স্থান এইরূপ চিত্রে পরিপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এই সকল চিত্র দেখিবার সুবিধা জনসাধারণের অতি অল্প, হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ সমস্তই সংস্কৃতভাষারূপ দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত। সংস্কৃতভাষাজ্ঞ বিদ্বজ্জন ভিন্ন শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া তাহা হইতে অমূল্য উপদেশ রত্ন সকল লাভ করা জনসাধারণের ক্ষমতার আয়ত্ত

নহে। সাধারণ লোক সমূহকে ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ দিতে গেলে, এমন ভাবে তাহা প্রদান করা আবশ্যক যে, যেন তাহাদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধির সীমা অতিক্রম না করে। যেন এতদর্থে তাহাদিগকে দুরূহ স্বদেশীয় বা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার আয়াস স্বীকার করিতে না হয়। আমাদিগের বিবেচনায় কোনও জাতির সাধারণ জনগণের নীতিশিক্ষার সঙ্কল্পে যে সকল পুস্তক করিতে হইবে, তৎসমস্ত সেই জাতির মাতৃভাষায় লিখিত হওয়া উচিত। কেবল মাতৃভাষা হইলেই হইবে না, পুস্তকগুলি প্রাঞ্জল প্রসাদগুণবিশিষ্ট ভাষায় রচিত হওয়া বিধেয়। ঐ সকল পুস্তকে চাণক্য পণ্ডিতের ন্যায় কেবল নীতির মূলসূত্র থাকিলে চলিবে না; কেননা সকল ভাষাতেই নীতির মূলসূত্রগুলি প্রায়ই নীরস হওয়ায় জন সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয় না। প্রত্যেক নীতি সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য তাহা জীবনে সমাবেশিত করিয়া জীবন্তভাবে প্রদর্শন করা চাই। এই জন্যই চাণক্য পণ্ডিত অপেক্ষা বিষ্ণুশর্ম্মা মহাশয়, এবং তাঁহার অপেক্ষাও কাব্যকারগণ এত অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

উপরি যেরূপ কথিত হইল, মৎপ্রণীত "বিজ্ঞান-নীতি-প্রসূন" বা অপর কয়খানি পুস্তক সেই ভাবে রচিত হইয়াছে কি না, বিবেচক পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমি সহজ ভাবে স্বদেশীয়গণকে নীতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার উপযোগিতা দেখাইলাম। যদি আমার প্রণীত পুস্তক কয়খানির কোন খানি পাঠ করিয়া একজনও স্বদেশবাসী ধর্ম্মের অনুরাগী ও নীতির পক্ষপাতী হন; তাহা

হইলেই সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব। সিদ্ধকাম হইব কি না যদিও নিশ্চয় নাই, কিন্তু ইহা অসঙ্কোচে ও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমি কেবল ধর্ম্ম ও নীতির আদেশ ভিন্ন অন্য উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া উপস্থিত ব্রতে ব্রতী হই নাই। যদি সঙ্কল্প বিফল হয়, তথাপি এই পরম সান্ত্বনা যে, সৎকার্য্যে সাধু চেষ্টা করিয়াছি। আমার চেষ্টা বৃথা হইল, কিন্তু আমার এক ক্ষেত্রে কার্য্যকারী অপর কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির যত্ন বিফল হইবে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাদৃশ জনকে উৎসাহিত করিবার জন্য মানব-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে,—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং॥"

শ্রীভগবদ্গীতাসু।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার পূজ্যপাদ শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই নীতি-প্রসূন প্রণয়ন সম্বন্ধেও বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছেন।

রাজবাটী।
কলিকাতা—দরমাহাটা
ষ্ট্রীট, নং ২৫।

শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়
গ্রন্থকারস্য।

বিজ্ঞান-নীতি-প্রসূন।

অর্থাৎ

রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিবিধ -নীতি সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রস্তাব।

"সর্ব্বলোকব্যবহারস্থিতির্নীত্যা বিনা নহি।
যথাশনৈর্বিনা দেহস্থিতির্নস্যাদ্ধি দেহিনাম্॥"

শুক্রনীতৌ।

শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক
প্রণীত:

ও তৎকর্ত্তৃক কলিকাতা--রাজবাটী ২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা :
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫ :
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সন—১২৯৬।